অলৌকিক রহস্য।

৫ম বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩২০। [১ম সংখ্যা।

আমাদের পঞ্চমবর্ষ।

ভগবানের কৃপায় অলৌকিক রহস্য পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিল। এই পঞ্চমবর্ষে আমরা অনেক অলৌকিক ঘটনার সংবাদ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। যে উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে অন্যান্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, অলৌকিক রহস্য প্রকাশের উদ্দেশ্য তাহাই; এ কথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। শুধু কতকগুলা ভূত প্রেতের গল্প করিয়া পাঠকের মনস্তুষ্টি করিব, চঞ্চল বালক বালিকাদিগকে শান্ত করিবার জন্য, তন্ময় করিয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য, বৃদ্ধ পিতামহীরা যেমন আষাঢ়ে গল্প করিয়া থাকেন, আমরাও সেইরূপ বাজে গল্পে পাঠকের অবকাশ সময়টা আমোদে কাটাইবার সাহায্য করিব, সে উদ্দেশ্য আমাদের নহে। সুখের কথা, পাঠকবর্গের অধিকাংশই এখন আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াছেন, একান্ত জড়বাদীদিগের মনে পরলোকের অস্তিত্বের বিশ্বাস আনয়নের জন্যই আমরা এতদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। সে চেষ্টা অনেকটা ফলবতী হইয়াছে। সকলেই না হউন, অনেকেই এখন পরজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়া তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের এ আলোচনা আমাদের মত স্বল্পবুদ্ধি অধিকারী লইয়া—সনাতন ধর্ম্মের এইটী বিশেষত্ব যে অধিকারিভেদে ইহাতে বিভিন্ন প্রকারের সাধন শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে।

যাহার যেমন পেটে সয়, এই ধর্ম্মেই কেবল সেইরূপ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবসায়ীর মত ইহা সর্ব্বরোগের এক ঔষধেরই ব্যবস্থা করে না। তাই মুক্তি-পথাবলম্বীর জন্য ইহাতে এত বিভিন্ন পন্থার নির্দ্দেশ। যিনি জ্ঞানপথে অগ্রসর হইবার যোগ্য, তাঁহার জন্য জ্ঞান লাভের প্রকৃত উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। যিনি ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহার জন্য ভক্তির কত প্রকৃষ্ট পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে। কর্ম্মযোগীর জন্য অনন্তকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট। তুমি তাহার যে কোনটী অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হও। তুমি নিরাকারবাদী, তোমার জন্যে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থা রহিয়াছে। তুমি সাকারবাদী, তোমার সমক্ষে তেত্রিশ কোটি দেবতার শোভন মূর্ত্তি সাজান রহিয়াছে। তুমি তাহার যে কোনটীকে আশ্রয় কর এবং তাহার সাহায্যে মুক্তি লাভ কর; কিন্তু কোনও পথে অগ্রসর হইবার আগে তোমাকে বিশ্বাস বলিয়া বস্তুটীকে পথের সম্বল করিতে হইবে। হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে এই বিশ্বাসটীকে সমস্ত ধারণ করিয়া পথ চলিতে হইবে। নহিলে যে পথ ধরিয়া চল না কেন, গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে না। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥"

অজ্ঞ, শ্রদ্ধা-বিরহিত ও সংশয়াত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ইহারা কোনও কালে মুক্তির অধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় আজি কালি আমাদের অধিকাংশই এখন পূর্ব্বোক্ত তিন দোষের কোনও না কোনও দোষে দুষ্ট। কেহ বা শাস্ত্রজ্ঞান রহিত বলিয়া

সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ। ইহাদিগকে কোনও পাশ্চাত্য বংশাবলীর কীর্ত্তন করিতে বল, ইহারা অনায়াসে তাহা করিতে পারিবে। কিন্তু নিজের তৃতীয় পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করিলে আকাশ পানে চাহিয়া থাকিবে। আর্থারের বীরত্বগাথা ইহাঁদিগের কণ্ঠস্থ, কিন্তু নহুষের নাম শুনিবা মাত্র ইহাঁরা নেশায় বেহুঁস হইয়া যান।

কাহারও বা শাস্ত্রচর্চ্চা থাকিলেও শাস্ত্রবাক্যে তাদৃশী শ্রদ্ধা নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ঋষিবাক্য আমাদের অনেকেরই বুদ্ধির কাছে গঞ্জিকাসেবীর উক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

শুধু ইংরাজি নবীশদিগকেই বা বলি কেন, আমাদের শাস্ত্রব্যবসায়ী-দিগের মধ্যেও অনেকে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অপারগ। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা লইয়াই—শাস্ত্রের বাক্যার্থ লইয়াই তাঁহারা আত্মপরিতৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন। ভিতরে প্রবেশ করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি বড় কমই দেখা যায়। অলৌকিক রহস্যের সংবাদাদি পাঠ করিয়া, জনৈক বিজ্ঞ অধ্যাপক আমাদের একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন "এ সব ঘটনা কি সত্য?" অথচ ইহাঁরা যজমানের গৃহে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। ইহাঁদের আপ্তবাক্যে একেবারে অনাস্থা দেখাইতে সাহস নাই, তবে মন ইহাঁদের সংশয়ে পরিপূর্ণ। শুধু যে একদিক্ হইতেই আমাদের সমাজে অবিশ্বাসের স্রোত প্রবেশ করিয়াছে, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। কালবশে এই স্রোত সমাজের প্রতি স্তরে অল্প বিস্তর প্রবেশ করিয়াছে। অথচ স্মৃতি-শাস্ত্রের অর্দ্ধেক অঙ্গ প্রেত-তত্ত্বাদির দ্বারাই সজ্জিত। কেমন করিয়া পরলোক-গত জীবের মঙ্গল সাধন হইবে, এই চিন্তাতেই করুণাময় আর্য্যমনীষিগণ অনেক সময় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তবে দেশে আবার সুবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা কিছু কালের জন্য আমাদের

দেশের তথা কথিত শিক্ষিতদিগকে মোহগ্রস্ত করিয়াছিল, কিন্তু একেবারে আত্মহারা করিতে পারে নাই। শুদ্ধ মাত্র জড়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এখন আর কেহ বড় একটা শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না। ইহ জগতের সীমান্তে অবস্থিত জীবগণের সহিত পরিচিত হইবার জন্য অনেকেই এখন লালায়িত। কিন্তু সুস্থির ও সংযতভাবে অধ্যাত্মচর্চ্চা করিবার অবকাশ এখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই নাই। অন্নচিন্তায় ও পুত্র-কলত্রা-

পরিণাম চিন্তায় তাঁহাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত হইয়া যায়। এদিকে নানাদিক্ হইতে নানা জাতীয় তর্কের প্রহারে তাঁহাদের চিত্ত এতই বিচলিত যে, প্রাচীন ঋষিমতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে তাঁহাদের সাহসে কুলায় না। এরূপ অবস্থায় ভক্তি কথা, জ্ঞান কথা লইয়া বড় বড় শাস্ত্রের উক্তি বোঝা মাথায় করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ডালি ধরিলে কি হইবে? আগে যে কোনও সহজ উপায় অবলম্বনে তাঁহাদের বিশ্বাসের বীজ বপন করাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। বীজ উপ্ত হইয়া একবার অঙ্কুরিত হইলে তাহার পর শাস্ত্রবাক্যের সার দিয়া তাহার মূল একবার দৃঢ় করিয়া চিত্ত-ক্ষেত্রে সংলগ্ন করিয়া দিতে পারিলে, কালে তাহাতে সোণা ফলিতে পারে, এই বিশ্বাসেই আমরা এই অলৌকিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছি। এ ব্যবস্থা নূতন নহে, আমাদিগের তন্ত্রশাস্ত্রে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে প্রেত-তত্ত্বাদি আলোচিত হইয়াছিল। যে উদ্দেশ্যে ইহা আলোচিত হইত, আমরা সেউদ্দেশ্য ভুলিয়াছিলাম বলিয়া এই তত্ত্ব সমাজের চক্ষে একদিন হেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু জগতের হিতার্থে সকল মঙ্গলময় ঋষিগণের দ্বারাই এই বিদ্যা আমাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন, বশীকরণ, সম্মোহন প্রভৃতি আভিচারিক ক্রিয়ারও জগতে প্রয়োজন আছে। নূতন নগর বসাইতে হইলে বন কাটিয়া, শ্বাপদ সরীসৃপাদি নিধন সাধন করিয়া স্থান

প্রস্তুত করিতে হয়। তিন দিনের পথ তিন দণ্ডের মধ্যে যাইবার প্রয়োজন হইলে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় পথমধ্যস্থ বিঘ্নদর্পিণী তারকার নিধনসাধন করিতে হয়। তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিলে খর দূষণাদি রাক্ষসগণকে সংহার করিতে হয়। প্রতি মাঙ্গলিক কার্য্যের প্রারম্ভে—

"ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ।

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভূতাপসারণ করাই বিধি।
মানুষে নির্ব্বিঘ্নে যাহাতে তপস্যা করিতে পারে, যাহাতে স্থূলদেহাত্মক জ্ঞানপরিত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্ম জগতের প্রবেশমুখে এই সমস্ত অনিষ্টকারী জীবের দ্বারা সাধক উৎপীড়িত না হয়, এই জন্যই যোগিগণ এই সকল অবিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। পরার্থে এই সকল শক্তি প্রযুক্ত হইলে ইহারা জীবের পরম মঙ্গলের কারণ। স্বার্থে প্রযুক্ত হইলে ইহাদের তুল্য অনিষ্টকারী শক্তি জগতে আর নাই। অনলোদ্‌গারী বড় বড় আগ্নেয়াস্ত্র ইহাদের তুলনায় কিছুই নয়। কালবশে স্বার্থান্ধ হইয়া মানব এই সকল শক্তির যখন অপব্যবহার করিতে লাগিল, তখনই সাধুগণ এই সকল রত্ন আবার তাঁহাদের গুপ্তভাণ্ডারে লুকাইয়া রাখিলেন।

এখনও পর্য্যন্ত ইহা সাধারণের চক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রহিয়াছে। সাধারণ্যে ইহা কখন প্রকাশিত হয় নাই, অথবা হইবে না। গুরু শিষ্যকে উপযুক্ত বুঝিলে, জীবের হিতসাধনজন্য কখন কখন এই সকল বিদ্যার পরিচয় দিয়া থাকেন।

যাঁহারা এই সকল বিদ্যায় অভ্যস্ত সূক্ষ্ম জগৎ লইয়াই কেবল তাঁহাদের কার্য্য। সাধারণ মানবের অলক্ষ্যে ইহাঁদের দ্বারা জগতের কত যে উপকার সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

তবে এই সকল বিদ্যায় পারদর্শী হওয়াই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে।

আমাদের সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য মুক্তি। জীব অষ্টপাশে বদ্ধ। এই অষ্ট পাশের পীড়নে আমরা নিরন্তর জর্জ্জরিত হইতেছি। যাহাতে সেই পীড়ন হইতে চির জীবনের জন্য মুক্তি লাভ করিতে পারি, আমরা সকলেই কেবল প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করিতেছি। একথা শুনিতে আপাতঃ বিস্ময়কর বটে, কিন্তু একটু গভীর চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় বাস্তবিক তাহাই। বন্ধনের পর মুহূর্ত্ত হইতেই জীবে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। নিতান্ত অজ্ঞ হইতে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ পর্য্যন্ত ঐ একমাত্র উদ্দেশ্যে ইহজগতে আপন আপন কার্য্য করিতেছে। তবে কেহ পথ না জানিয়া আপনাকে আরও বন্ধনরজ্জুর পাকে পাকে জড়াইতেছে, কেহ বা ধীর শান্তচিত্তে আপনার ভিতরে আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া ধীরে ধীরে বন্ধনরজ্জুর পাক খুলিতেছে। কার্য্য একই, ভাব স্বতন্ত্র। সংসারে সাধারণতঃ যাহাকে আমরা দুঃখ বলি, তাহার নিবৃত্তিই মুক্তির একমাত্র উপায় মনে করিয়া লোকে সুখান্বেষণে ব্যগ্র হইয়া থাকে। কামী ইন্দ্রিয়সেবায় নিরত হয়, লোভী পরধন অপহরণের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে এই সুখভোগ করিবার চেষ্টায় বহুকাল পরে জীবনের এক সময়ে যখন লোকে বুঝিতে পারে যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সুখ তাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহাতে চিত্ত চিরদিনের জন্য পরিতৃপ্ত হইতে পারে না; তখন সে সুখকে চির প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। জন্ম জন্মের ব্যাকুলতায় ভগবৎ-কৃপায় একদিন তাহার অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। তখন সে আপনার স্বরূপ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আত্মজ্ঞান লাভের ব্যাকুলতা আসে। তখন যে সমস্ত ক্রিয়ার দ্বারা সে আপনাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছিল, এখন হইতে প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টিত হয়। এই সময়েই সে সদ্গুরুর সাহায্য লাভ

করে; এবং কঠোর সাধনার ফলে অবশেষে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে।

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণাৎ স্বয়ম্ভূঃ, তেন পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কেচিদ্ধীরা প্রত্যগাত্মানমৈচ্ছৎ, ব্যাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; এই জন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিতে চেষ্টা করিলে জীব আপনার বাহিরের বস্তুই দেখিতে পায়, আপনাকে দেখিতে পায় না। কেবল ধীর ব্যক্তিগণই অমৃতত্ব লাভের ঐকান্তিকী ইচ্ছায় নিজের অভ্যন্তরে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। যাহাতে জীব অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে পারে, আমরা, অতি সহজ উপায় দ্বারা, এতদিন তাহারই চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। যদি জীব একবার বুঝিতে পারে, স্থূল দেহান্তে তাহার অস্তিত্বের বিলোপ হয় না; যদি বুঝিতে পারে, এখানে ভালমন্দ যে কাজই করুক না কেন মরণান্তে তাহার দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যায়, যে জ্ঞানে আমরা ইহজগতে সুখদুঃখ সম্ভোগ করি, সেই জ্ঞানেই অথচ সহস্রগুণ অনুভূতি লইয়া আমরা পরজগতে সুখদুঃখ সম্ভোগ করিব,—যদি আমরা কোনও রকমে ইহা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের মন আপনাআপনি অন্তর্মুখীন হইবার চেষ্টা করিবে। তখন হইতে ঐকান্তিক মনে আমরা জ্ঞানান্বেষী হইব। যেদিন যথার্থ পিপাসা জাগিবে, সেই দিনই গুরু আসিয়া হাত ধরিয়া জ্ঞানের পথে লইয়া যাইবেন। তাহার জন্য অন্য কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না। আমরা প্রত্যেক ভ্রাতার জন্য সেই শুভ মুহূর্ত্ত প্রার্থনা করি, এবং যে ভাগ্যবানের সে শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাকে অন্তরের সহিত প্রণাম করি।

———

আইরিশ কুঠিরে ভূতের উপদ্রব।

আয়রলণ্ডে ফাইফ্ মাইল সহরের নিকটবর্ত্তী কুনেস নগরে একটী ভূত একটী বিধবা স্ত্রীলোক এবং তাঁহার বালক বালিকাকে এরূপ ভাবে ভীত করিয়াছে যে পরিবারবর্গটী ভূতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাঁহাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করিবেন মনস্থ করিতেছেন।

কিছু দিন হইল বিধবা মিসেস্ মারফি এবং তাঁহার বালক বালিকারা নিজেদের ক্ষুদ্র কুঠিরে অলৌকিক শব্দ দ্বারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। প্রথমে তাঁহারা মনে করিতেন যে ইন্দুর শব্দ করিতেছে, কিন্তু অন্বেষণ করিয়া দেখেন যে ঐরূপ শব্দ ইন্দুরের দ্বারা হইতে পারে না। এবং আরো জানা যায় যে ভূতেরা বালক বালিকাদের উদ্দেশ্যেই ঐরূপ শব্দ করিয়া থাকে। বালক বালিকারা ঘরে না থাকিলে সমস্ত নিস্তব্ধ থাকে, আর উহারা ঘরে থাকিলে শব্দগুলিও তাহাদের একঘর হইতে অন্যঘরে পশ্চাৎ অনুধাবন করে।

শব্দগুলি কখন বা ইন্দুরে মাটী আঁচড়ান শব্দের মত, কখন বা দেওয়ালে আঘাতের শব্দের মত, কখন বা মাথার উপরে মানুষের পদ-শব্দের মত বোধ হইত। অবিশ্বাসী প্রতিবেশীরা যে ঘরে বালক বালিকারা শয়ন করে সেই ঘরে রাত্রি যাপন করিয়াছেন এবং ভূতের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিয়া এবং ভীত হইয়া প্রাতে উঠিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

এক দিবস দুইজন দৃঢ়কায় কৃষক একটী বালিকার বিছানার পার্শ্বে বসিয়া চৌকি দিতেছিল, কিন্তু বালিকার চীৎকারে তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া

যায়, এবং বালিকাটী বলিয়া উঠিল, "কোন জিনিষ আমাকে ধরিতেছে"। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "কোথায়?" বালিকাটী তাহাদের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ নিজের বক্ষ দেখাইয়া দিল, তৎক্ষণাৎ তাহারা তাহার বক্ষ হইতে পোষাক অপসারিত করিয়া দিল; কিন্তু বালিকার ভয়ের কারণ কিছু বুঝিতে পারিল না।

অন্য একদিবস যে বিছানায় দুইটী শিশু শয়ন করিয়াছিল. সেই বিছানার চাদর, দুইটী অবিশ্বাসী প্রতিবেশীর সাক্ষাতে, আকর্ষিত এবং কম্পিত হইয়াছিল।

কি দিবা, কি রাত্র সকল সময়ই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং ভূতের বিদ্যমান থাকায় পরিবারবর্গটী এরূপ ভাবে ভীত হইয়াছে যে তাহারা কুঠির বিক্রয় করিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য চিন্তা করিতেছেন।

পুনঃ পুনঃ বহু রোমিয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পাদ্রীগণের এন্‌স্কিলেন্ এবং মোনাঘান্ সহর হইতে আসিয়া এই কুঠির পরদির্শন করিয়াছেন। স্থানীয় পাদ্রীরা বহুবার উপাসনা করিয়াছেন এবং ভূতেদের তাড়াইবার জন্য বহু বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীমণীন্দ্র বসু।

গোপেশ্বরের চাকুরী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যে সময়ের কথা তখন চুঁচড়ার ব্যারাকে গোরাপল্টন থাকিত; পাশেই চন্দননগর, পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষুদ্র লীলাভূমি ও সুরধাম ফ্রেঞ্চ চন্দননগর।

"চন্দননগর ধাম ফ্রেঞ্চ অধিকার
কলেবর ক্ষুদ্র কিন্তু বড়ই বাহার"

কাজেই এই সুপেয় সুখাদ্য সমন্বিত, যুবতী সেবাদাসী পরিবেষ্টিত শ্রীধাম হোটেল পরিশোভিত চন্দননগর, ব্যারাকের গোরা পল্টনদের তীব্র আকর্ষণে সর্ব্বদাই টানিয়া আনিত।

তাহার উপর পাতা মার্কা এক বোতল অমৃত মদিরার মূল্য মোট ছয় আনা, সুতরাং ইহার প্রলোভনও বড় সামান্য ছিল না।

সুসভ্য সুরসিক ও আতিথেয় ফরাসী জাতিও এই পরদেশী বঁধুয়াগণের আতিথ্য সৎকারের কোনরূপ ত্রুটি করিত না এবং প্রায়ই বিশেষ অনুরোধ ও স্তুতি মিনতির দ্বারা উহাদের অনেকেই পরম সমাদরে সরকারী ধরমশালার রাত্রিবাসের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিত, অর্থাৎ বেএক্তেয়ার দেখিলে ফরাসী পুলিশ প্রায়ই রাত্রে তুড়ুম ঠুকিয়া দিত।

ফলে রাত্রে ব্যারাক হইতে সৈনিকের অনুপস্থিতি নিবন্ধন সামরিক শৃঙ্খলার বড়ই ব্যাঘাত ঘটিত। একদিকে বোতলনিবাসিনী সুরাদাসী পিস্পগণের চাটুবচন ও কর্সেটওয়ালী হোটেলসঞ্চারিণী বারবিলাসিনী সেবাদাসীর তীব্র মোহময়ী আকর্ষণ, অন্য দিকে ফরাসী পুলিশের অবিশ্রান্ত তুড়ুম ঠোকার সুব্যবস্থা; একদিকে কঠোর সামরিক আইনের বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা, অন্যদিকে আন্তর্জ্জাতিক আইনের কূট গোলযোগ। শুনা যায় অনেকটা এই সকল কারণেই গোরাপল্টন চুঁচড়া হইতে উঠাইয়া লওয়া হয়। বহুদিন যাবৎ ব্যারাক শূন্য পড়িয়াছিল। এখন ইহাতে কাছারী বসিতেছে।

ক্ষীরোদ বাবু এই পল্টনের গোমস্তা ছিলেন; নবীন যুবক ক্ষীরোদ বাবু যৌবনের পূর্ণ বিকাশে দেহ ও মনের স্ফূর্ত্তি—বাহির দিকে রূপের নৃত্য, ভিতর দিকে উল্লম্ফন। কমিসিয়রেটের বাবু, নবীন বয়স, কাঁচা পয়সা,

দোরস্ত সঙ্গী ও উড়ুক্ষু প্রাণ, সুতরাং ক্ষীরোদ ইহার কোনটীরই সম্যক্ সুব্যস্থার ক্রটী করে নাই।

সন্ধ্যার পর হইতেই চক্ষু ও মেজাজ গোলাপী, প্রাণখোলা উচ্চ কণ্ঠের আবেগময় স্ফূর্ত্তি ও আলাপ, নূপুরের নিক্কণ, বামাকণ্ঠের তান ও প্রভাতের খোঁয়াড়ীতে, দিনরাত্রিগুলা দিব্য স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে হু হু করিয়া কাটিয়া যাইত।

তখনকার কালে সুরাপান সভ্যতার একটী বিশেষ অঙ্গরূপে পরিচিত ছিল। মদ্যপ না হইলে শিক্ষিত সমাজ তাহাকে সভ্য বলিয়া পরিচিত করিত না; বাগান বাড়ী ও কামকুশলা কামিনীগণের সঙ্গ ও সঙ্গীত তখন তাদৃশ রুচিবিরুদ্ধ ছিল না। বরং মদিরা-রমণী-বিহীন কোন হতভাগ্যের ইহলীলা শেষ হইলে লোকে বলিত একটা গরু মরিয়াছে। লোকটা নিশ্চয়ই গরু ছিল, নহিলে নেশা করিত; কেন না গরুতেই নেশা করে না।

পানীয়ের মধ্যে বিনামূল্যে সংগৃহীত পল্টনের হুইস্কী ও শ্যাম্পেন এবং সঙ্গিনীগণের মধ্যে কাঁচা পয়সার প্রচুর সদ্ব্যয়ে প্রাপ্ত খড়োবাজরের প্রখ্যাতচরিত্রা কামিনী, ক্ষীরোদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বা প্রিয়তমা ছিল।

সেরাত্রে আহারাদি শেষ করিতে রাত্রি অনেকটা হইয়া গেল এবং আহারের পরও বারান্দায় ইজি চেয়ারে কিয়ৎক্ষণ শুইয়াছিল।

*　　*　　*　　*

যখন টলিতে টলিতে কামিনীর বাটীর দিকে চলিল তখন রাস্তা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ও রজনী গভীরা।

কামিনীর বাড়ীর নিকটে এক গলায়কণ্ঠী, মুণ্ডিত মস্তক, শুষ্কদেহ বৈরাগী দাঁড়াইয়া ছিল, সে ক্ষীরোদকে দেখিয়াই হাত নাড়িয়া বারণ করিল।

ক্ষীরোদ তাহার সঙ্কেতের অর্থ বুঝিতে না পারায় আস্তে আস্তে তার নিকটে মুখ লইয়া গিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া বলিল "কি বাবা কি বলছ বাবা" ? বৈরাগী বলিল "বাবু আজ ফিরে যান।"

ক্ষী। কেন বাবা তোমার কি পাকাধানে মই দিয়েছি, তোমার এত চক্ষুঃশূল কেন ?

বৈ। না বাবু ফিরে যান, ফিরে গেলে ভাল হবে, আমি বল্‌ছি আজ আপনি ফিরে যান।

ক্ষী। কে বাবা তুমি পেঁড়োর পীর, তোমার হুকুম তামিল করতেই হবে, না বখরা বসাবার মতলবে ফিরছ, সেটী হচ্ছে না বাবা।

বৈ। আজ আপনার বিষম বিপদ্‌ হতে পারে, তাই বলছি ফিরে যান।

ক্ষী। সত্যি নাকি ? ভারি বিপদ্‌! এসত বাবা তোমার কণ্ঠী ছিঁড়ি—

বৈরাগী সরিয়া পড়িল।

"সরে পড় বাবা নহিলে এখনি কামড়ে দিব"—তার পর অস্ফুট ভাষায় আরও কি বলিতে বলিতে টলিতে টলিতে কামিনীর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই জড়িতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল "কামিনী" !

সমস্ত বাটী নীরব, কোন উত্তর নাই।

পুনরায় ডাকিল "কামিনী !"—কোন উত্তর নাই ; আশ্চর্য্য হইয়া নিজেই বলিল "একি বাবা, কি মতলব, লুকোচুরী খেল্‌ছ না কি ?

তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল কামিনী একটা বস্ত্রাচ্ছাদনে চুপ করিয়া শুইয়া আছে। বলিল "একি বাবা একবারে মটকা মেরে আছ ;"

পরে ভাবিল বোধ হয় অসুখ করিয়াছে, গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, কোন সাড়া নাই।

যখন গায়ের কাপড়খানা খুলিল তখন তার চক্ষুস্থির—একেবারে খুন—গলদেশে গভীর ক্ষত, সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত, শয্যাবস্ত্র লোহিতরাগে রঞ্জিত।

পথিক যেমন বজ্রাঘাতে অকস্মাৎ আড়ষ্ট হইয়া যায়, ক্ষীরোদও তদ্রূপ এই অচিন্ত্য অভাবনীয় দৃশ্যে একেবারে নীলবর্ণ ও আড়ষ্ট হইয়া গেল। পরে বসন্তাগমে যেমন শুষ্কতরু ধীরে ধীরে মুঞ্জরিয়া উঠে, সেইরূপ ধীরে ধীরে আত্মস্থ হইল; কিন্তু তখনও নিজেকে এবং নিজের চক্ষুদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে পারিল না—একি? ইহা কি সত্য! তার সাধের কামিনী খুন, কে এরূপ করিল, কেন করিল—এইরূপ চিন্তায় কিছুক্ষণ কাটাইয়া পুনরায় ভাল করিয়া চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া দেখিল।

তখন আর একটা দুরাশা জাগিল—যদি এখনো একেবারে না মরিয়া থাকে, যদি এখনো চেষ্টা করিলে বাঁচে! নাড়াচাড়া করিয়া বুঝিল কোন আশাই নাই। অনেক ভাবিয়াও খুনের কারণ বা কর্ত্তা সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারিল না, প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল—হতভাগিনীর এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া নিজের প্রতিও ধিক্কার আসিল—মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল তুচ্ছ প্রলোভনে কামান্ধ ও মোহান্ধ হইয়া অনেক কুলকামিনীরই কুলত্যাগের ফলে শেষে এইরূপই পরিণাম হয়।

যদিও কামিনী বারাঙ্গনা এবং সেও নিজে মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত, তথাপি সে কামিনীকে বাস্তবিকই ভালবাসিত—প্রাণ ভরিয়াই ভালবাসিত।

তার ভালবাসায় এইরূপ নিদারুণ ব্যথা পাইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে যদি তার কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব বা কথার ঠিক থাকে, তাহা হইলে নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কখনো কোন রমণীর প্রেমে মজিবে না বা আর কখন বেশ্যাসক্ত হইবে না।

আত্ম চিন্তা জাগিল—নেশার ঘোর ছুটিয়া গেল; বুঝিল, এরূপ স্থানে আর অধিকক্ষণ থাকা নিরাপদ্ নহে। যদি অপর কেহ আসিয়া পড়ে বা

কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়ত মহা বিপদ, হয়ত তাহাকেই খুনী বলিয়া সন্দেহ করিবে।

এখন থানায় খবর দেওয়া উচিত কি না—কিন্তু যদি তাহাকেই চালান দেয়? ভাবিল, যা হয় তাই হবে খবর দেওয়াই উচিত।

তাড়াতাড়ি বাহির হইতে যাইয়া দেখে বাহির হইতে সদর দরজা বন্ধ; টানাটানি করিয়াও খুলিতে পারিল না—তখন মুখ শুকাইয়া ভয়ের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

সন্দেহ হইল হয়ত ইহার মধ্যে কোন চক্রান্ত আছে; তখন সেই বৈরাগীর উপর রাগ হইল; শালা যদি তখন এত ব্যাপার খুলে বলে তা হলে কোন শালা এ বাড়ীতে আসত—সে শালা হয় এর মধ্যে আছে, না হয় সব ব্যাপার জানিত। যদি সে এ যাত্রা কোনরূপে নিষ্কৃতি পায় ত নিশ্চয়ই সে শালার তিলক কাটিয়া ফেলিবে।

অবশেষে প্রাণের দায়ে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া প্রাচীর টপকাইয়া পলায়নই স্থির করিল।

বহুকষ্টে পাঁচীল ডিঙ্গাইয়া যখন নামিবে তখন দুর্ভাগ্যক্রমে এক কনেষ্টবল দূর হইতে দেখিয়া হাঁকিল "কোন্ হ্যায় ঠার্ যাও"—

প্রমাদ গণিয়া ক্ষীরোদ কোনরূপ প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশ লাফাইয়া পড়িয়া দৌড় দিল।

"পাকড়ো পাকড়ো চোট্টাভাগে" কনেষ্টবলও উর্দ্ধশ্বাসে পাছু লইল।

ক্ষীরোদের তখনো পায়ের স্থিরতা ছিল না—অল্পক্ষণ পরেই কনেষ্টবল নিকটস্থ হইয়া বজ্রকণ্ঠে হাঁকিল "কোন হ্যায়"—

পলায়নে অক্ষম ভয়বিহ্বল ক্ষীরোদ প্রাণ ভয়ে বলিল "হাম হ্যায় বাবা হাম হ্যায়।"

তোম হ্যায় ত কেয়া হ্যায়—

আরে পাকড়াতা হ্যায় কাহে, হাম কি চোট্টা না ডাকু. হ্যায় যে তুমি পাকড়াতা হ্যায় বাবা।

"নেহি জান্তা তুম কোন হ্যায়—তোম আলবৎ চোট্টা হ্যায়—হাম আও-য়াজ দিয়া তবভি ভাগতা হায়"—তখন আর উপায় নাই। বলিল, "আরে জানতা নেই বাবা হাম ক্ষীরোদ বাবু পল্টনকা বড় বাবু। জানতা নেই তোম কোন হ্যায়—আভি দেখে পহেলা তব দোসরা বাৎ" বলিয়া তাহাকে সবলে বাঁধিয়া ফেলিয়া কামিনীর বাড়ীর দিকে লইয়া চলিল।

ক্ষীরোদ দেখিল সমূহ বিপদ্—ধন প্রাণ মান লইয়া টানাটানি, একে-বারে খুনের দায়। বলিল ' আরে ভাই ও বাড়ীমে আউরৎ খুন হুয়া, হাম থানামে যাতা হ্যায় আর তোম পাকড়া কিয়া।"

খুনের নাম শুনিয়া কনষ্টেবল কাপড়ের দিকে চাহিতে উভয়ে বিস্ময়ে দেখিল কাপড়ময় রক্তের দাগ।

অসবধানতায় তার বস্ত্রও যে রক্তাক্ত হইয়া গেছে তাহা এতক্ষণ লক্ষ্যও করে নাই।

ক্ষী। কুছ্ কসুর নেই বাবা—কুছ জানতা নেই—ছোড় দেও বাবা পাঁচশ রূপেয়া—হাজার রূপেয়া ইলাম মিলেগা—আরে ছোড় দেও ভেইয়া।

ক। আরে হামারা বিট্‌মে খুন হুয়া আর তোমরা ছোড় দেগা, নেহি মাংতা তোমরা রূপেয়া।

যথারীতি পিছমোড়া বন্ধন, হাতকড়ি ও হাজত বাস। যে দারোগা বাবু এতদিন প্রাণের বন্ধু—এক গ্রামের ইয়ার ছিল, আজ সেও কড়া হইয়া হাজত দিল; কোন কথা, উপরোধ সুপারিস, অর্থে প্রলোভন কিছুতেই কিছু হইল না।

তদন্তের সময় যখন হাতকড়ি দিয়া পথে পথে ঘুরাইতে লাগিল, তখন

নতশিরে বার বার প্রার্থনা করিল—মা ধরণী দ্বিধা হও আর এ পোড়ামুখ দেখাতে পারি না।

বন্ধু শত্রু, পরিচিত লোক অনেকেই দেখিয়াও চিনিতে পারে না, কেহ কৌতুক, কেহ তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপের স্বরে বলিল—যেমন কর্ম্ম তেমনি ... এইবার ইয়ারকির মজাটা টের পাও।

... ন ও অন্তর্দ্দাহের উপর দুর্ভাবনা—দুর্ভাবনা নিজের ও স্ত্রী বিধুমুখীর জন্য। ... চ্ছা হইত শীঘ্র শীঘ্র ফাঁসি হয়ে যায় ত হউক, আর কাট গড়ায় দাঁড়াইয়া মুখ দেখান যায় না—আবার বিধুমুখীর মুখ ও কথা মনে পড়িত, আবার প্রাণের আশা ও বাঁচিবার ইচ্ছা জাগিত।

উকিল হাজতে দেখা করিয়া তদ্বিরের জন্য তার কৈফিয়ৎ ও জবানবন্দী শুনিয়া গেল।

কিন্তু সমস্ত ঘটনাচক্রই তার বিপক্ষে; স্বপক্ষে কোন সাক্ষ্যই নাই—এক সাক্ষী সেই বৈরাগী, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান মিলিল না।

মামলা যথারীতি দায়রায় গেল; প্রত্যহ হাতকড়ি বাঁধা অবস্থায় নগ্নপদে, মলিন বস্ত্রে, পুলিশ পাহারায় সরকারী ধরম শালা হইতে বেলা এগারটার সময় আদালতে উপস্থিত হইত ও পাঁচটার সময় ফিরিয়া যাইত। যখন সাক্ষীর জবানবন্দীতে তার অপরাধ প্রমাণিত হইত এবং পরিচিত অপরিচিত ব্যক্তিগণ তাহার প্রতি কৌতুক, করুণা ও বিরক্ত দৃষ্টিতে চাহিত তখন সে আর মুখ তুলিতে পারিত না, বোধ হইত যেন সমস্ত চক্ষুর বিদ্রূপ ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টি যেন তাহারই অন্তঃস্তল বিদ্ধ করিতেছে।

পুলিসের আসল ও নকল সাক্ষী এবং সরকারী উকিলের বক্তৃতায় বুঝা গেল যে যদিও খুনের সময়ের কোন চাক্ষুষ সাক্ষ্য নাই, তবে সে যে প্রকৃত অপরাধী সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। হয় কোনরূপ উত্তেজনা

বা ক্রোধের বশে কিম্বা অপর কোন পুরুষের অপ্রিয় আগমনে অসন্তুষ্ট হইয়া মতলব করিয়া এই অপকার্য্য সাধন করিয়াছে এবং ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া সুযোগ বুঝিয়া করিয়াছে। কোনরূপ আকস্মিক ঘটনায় হঠাৎ সম্পন্ন হয় নাই, তাহা হইলে কোনরূপ চীৎকার বা গোলযোগ হইত; পরে চুপে চুপে পলাইবার সময় পুলিশ কর্ত্তৃক ধরা পড়িয়াছে। তাহার রক্তাক্ত বস্ত্র ও খানাতল্লাসীর সময় প্রাপ্ত তাহারই রক্তমাখা ছোরা এ ঘটনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আসামীর উকিল যথেষ্ট জেরা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না। তিনি যথার্থ ঘটনা লইয়াই বক্তৃতা করিলেন,—দেখাইলেন যে আসামী রমণীকে আন্তরিক ভালবাসিত, সুতরাং তার হত্যা করিবার কোন প্রয়োজন বা ইচ্ছাই হইতে পারে না। সরকার পক্ষ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানের কোনরূপ যুক্তিযুক্ত হেতু বা কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। এক হইতে পারে হঠাৎ কোনরূপ উত্তেজনার কারণ হইয়াছিল, কিন্তু সরকার পক্ষ এ অনুমান গ্রহণ করেন নাই, এবং বাস্তবিকই আকস্মিক উত্তেজনা বশে হয় নাই, কেননা তাহা হইলে কোন না কোনরূপ চীৎকার গোলযোগ বা ধস্তাধস্তি হইত; তা ছাড়া বাহির হইতে সদর দরজা বন্ধ থাকার জন্য ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে আসল হত্যাকারী অত্যন্ত চতুর, হুঁসিয়ার, কার্য্যদক্ষ ও হত্যা-কাণ্ডে পরিপক্ব; সুকৌশলে সমস্ত কাজ শেষ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক ক্ষীরোদকে আবদ্ধ করিয়া তাহার স্কন্ধে সমস্ত অপরাধ চাপাইয়া আসল ব্যক্তির অনুসন্ধানের পথ চিররুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এরূপ তৎপরতা ও বুদ্ধির সহিত কার্য্য ক্ষীরোদ বাবু বা কোন ভদ্রলোকের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়; ইহা কোন পাকা বদ্‌মায়েস বা গুণ্ডার কার্য্য। সুতরাং আসামীর জবানবন্দী সর্ব্বতোভাবে সত্য। পুলিশ কার্য্যদক্ষ হইলে এতদিন এক নিরীহ ভদ্রলোককে অকারণে লাঞ্ছিত না করিয়া

নিশ্চয়ই প্রকৃত ব্যক্তিকে ধরিতে পারিত! কিন্তু পুলিশ পরিশ্রমের ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণে সে পথে না যাইয়া পারিপার্শ্বিক ঘটনার বলে সহজে মামলা মিটাইবার চেষ্টায় আছে।

পরে জজও জুরিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যখন হত্যার কোনরূপ কারণ ছিল না, এবং কোন চাক্ষুষ প্রমাণ নাই এবং ভদ্রলোক আসামী যখন শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়তার সহিত নিজেকে নির্দ্দোষ বলিতেছে, তখন একজন নিরপরাধ প্রজার যেন বিনা দোষে দণ্ড না হয়, অন্ততঃ সন্দেহের সুযোগে মুক্তি দেওয়া হউক।

ম্রিয়মাণ ক্ষীরোদ অনেক সময়েই জেলের ভিতর বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিত, সে ভাবনার কূল কিনারা ছিল না; কিন্তু ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিত না!

কখন হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিত বা মরিয়া হইয়া উঠিত, কখন বা আশার আলোকে ভবিষ্যৎ গগন আলোকিত দেখিত; ভাবিত, যখন সে নির্দ্দোষ তখন আর ভয় কি? যথার্থই সুবিচার হইবে, নিশ্চয়ই মুক্তি হইবে।

এই আশা নিরাশা, ভাবনা চিন্তায় ভিতরে ভিতরে অজ্ঞাতসারে একটা নূতন ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। জীবনে সে কখনো ভগবানকে ডাকে নাই, সে সময় বা প্রবৃত্তিও ছিল না, কখনো আবশ্যকও মনে করে নাই।

আজ হঠাৎ সেই অজ্ঞাত অচিন্ত্য ভগবানকে মনে পড়িল, কাতরে প্রাণ ভরে ডাকিত, মনে মনে শত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আকুল ভাবে জানাইত—ভগবান্, দয়াময় তুমি সত্য, আমার শত অপরাধ মার্জ্জনা কর; এ হতভাগ্যকে লাঞ্ছনা অপমান ও প্রাণের আশঙ্কা হইতে রক্ষা কর। ডাকিতে ডাকিতে কখন নিরাশ হইয়া পড়িত

কথনো বা প্রাণের ভিতরের মেঘলা আকাশ ফর্সা হইয়া উঠিত। প্রবল ভূকম্পে যেমন ভূস্তরের অনেক সময়ে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয়, উচ্চ স্থান হ্রদে পরিণত ও জলা ভূমিতে গিরিশৃঙ্গের উদয় হয়, সেইরূপ তাহারো মনোমধ্যে এই ঘটনার বিষম প্রতিঘাতে আন্দোলিত হইয়া বহু শূন্য স্থান পূর্ণ ও বহু আশা কল্পনা ও গর্ব্ব বিনির্ম্মিত উচ্চ চূড়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

বুঝিল এ জগতে সবই সম্ভব, সবই অসম্ভব;—আজ যে রাজা কাল সে পথের ভিখারী, আজ যে কাঙ্গাল কাল হয়ত সে মহা ঐশ্বর্য্যশালী। ধন জন যৌবন অর্থ সকলি বিদ্যুদ্বৎ চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী। যে লোক দুই দিন পূর্ব্বে পল্টনের বড় বাবু বলিয়া কাঁচা পয়সায় বাবুগিরি করিয়া গর্ব্বভরে চলিয়া যাইত, বিধাতার প্রকোপে সে এখন পরিত্যক্ত, বন্দী, হতভাগ্য ও মৃতবৎ।

ক্ষীরোদ প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিল। প্রাণের ভয়ে বন্দী অবস্থাতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিল, স্বপক্ষের উকিল যথেষ্ট পরিশ্রম করিল, সাধ্বী স্ত্রী বিধুমুখী সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া মামলা চালাইল, কিন্তু বিরুদ্ধ গ্রহ প্রবল, অদৃষ্ট বিপক্ষে ঘটনাচক্র প্রতিকূল ও সন্দেহজনক।

রক্তবর্ণ বস্ত্রাধারে বসিয়া জজ সাহেব যখন রুমালে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কোমলে কঠোরে প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিলেন, তখন হঠাৎ ক্ষীরোদের চক্ষের সম্মুখে প্রলয় ঘটিয়া গেল—আদালত গৃহের কড়ি বরগা স্রোতের ন্যায় সরিতে লাগিল; নিম্নে পদতলে গৃহতলও বিপরীত দিকে সরিয়া গেল—কাটগড়ার মধ্যে মাথা ঠুকিয়া পড়িয়া গেল।

ফাঁসি হইবে? হউক, কিন্তু বিলম্ব কেন? তবে কি কোন উপায় নাই, দৈববলে ত সবই সম্ভব হয়, চিতাকাষ্ঠ হইতে মৃত জীব ফিরিয়া আসে, জগতে কত অঘটন হইতেছে তবে কি কোনরূপে এ ফাঁসির হুকুম রদ হইবে না—নিস্তব্ধ কারাগারের নীরস কঠোর দেওয়াল

মৌন, কে উত্তর দিবে? এক উপায় এখনি আত্মহত্যা, কিন্তু সে পথও রুদ্ধ! যদি বাঁচে, কিন্তু সে কি সম্ভব? তবু ভাল যে কটা দিন বাঁচিতে পারে, বাঁচিয়া থাকিলেও সুখ আছে।

আশা কখনো কখনো মর্ম্মস্থলে জাগিয়া উঠিত; মনে হইত সে নিশ্চয় বাঁচিবে, কোন না কোনরূপ অলৌকিক ঘটনায় বা দৈববলে নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে;—দৈববলের ভরসায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। আবার মনে হইত অলৌকিক ঘটনা নাটক নভেলে বা গল্পেই মানায় ভাল, বাস্তব জীবনে বড় একটা ঘটে না।

মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল, কেন শাস্ত্রে সুরাপান ও বেশ্যাগমনের এত নিন্দা, কেন ইহাতে নিজে ও চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হয়! যদি আবার জীবন পায়ত এসব ব্যভিচার হইতে চিরজীবন দূরে থাকিবে!

তখনো আশা; আশায় প্রলুব্ধ, তখনো বিশ্বাস—বুঝি বা মুক্তি পাইবে। শাস্ত্র বলেন,—আশা ব্যভিচারী, কুহকিনী ও কল্পনাময়ী; কিন্তু আবার অনেক সময়ে এই আশাই মঙ্গলময়ী. আশাতেই মানুষ বাঁচে, আশার প্রলোভন না থাকিলে মানুষ মরিয়া হইত, সংসার মরুভূমি ও উন্মত্তের আবাস-গৃহ হইয়া উঠিত।

আশায় বুক বাঁধিয়া ছোটলাট বাহাদুরের নিকট প্রাণভিক্ষা করিয়া দরখাস্ত পাঠাইল—প্রত্যুত্তরে খাসমুন্সী জানাইলেন যে লাট সাহেব বিশেষ দুঃখিত যে তিনি দরখাস্তকারীর মুক্তির কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ বা উপায় দেখিতে পাইতেছেন না।

লাট সাহেব যতটা দুঃখিত হউন বা না হউন, উত্তর শুনিয়া হতভাগ্য ক্ষীরোদের দুঃখের ইয়ত্তা রহিল না। উত্তরের প্রতীক্ষায় ও উৎকণ্ঠায় কয়দিন নিজেকে ভুলিয়াছিল, কিন্তু আবার সমস্ত কল্পনা ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

শেষ আশা ও চেষ্টা—বড় লাট বাহাদুরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ; উত্তর পূর্ব্ববৎ নিরাশব্যঞ্জক।

আগামী কল্য ফাঁসির দিন ; অনেক্ষণ ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া স্থির হইল। রাত্রি নিদ্রাশূন্য, শুনিয়াছিল ফাঁসির দড়ি ছিঁড়িয়া গেলে মুক্তি হয় ; তাহার অদৃষ্টে যদি সেইরূপই হয়।

শুনিয়াছিল ফাঁসির পূর্ব্বে প্রাণের শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়, কিন্তু দেখিল সে সব কিছুই নহে ; নহিলে একবার শেষ একবার কেবল মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, একটা প্রাণের কথা কহিবার ও চক্ষের তৃপ্তির জন্য বিধুমুখীকে দেখিবার বড়ই আগ্রহ হইল।

কেবল জানান হইল তাহার কোন বক্তব্য আছে কি না ? ভাবিয়া বলিল যেন স্বজাতির দ্বারা তাহাকে দাহ করা হয় ও স্ত্রীকে জানান হয় যে সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

একবার কাঁপিয়াছিল—পদদ্বয় টলিয়া পড়িয়াছিল, তার পর যখন সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ও নিরাশ হইল, তখন সে ধীর ও স্থির ; কিন্তু বাহ্যিক জ্ঞান বড় একটা ছিল না, শূন্য দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর সব শেষ ; কাষ্ঠমঞ্চ কাঁপিয়া উঠিল, সমস্ত দেহে একটা প্রবল কম্পন ও স্কন্ধদেশে একটা চাপ অনুভব করিল।

তাহার পর যাহা দেখিল সে স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করে নাই ; দেখিল নয়ন-প্রাণ-তৃপ্তিকর কোমল শষ্পপূর্ণ ফল-ফুল-মুকুলিত দ্রুমলতা-পরিশোভিত, অপ্সরা-সেবিত সুন্দর সুন্দর উদ্যান ; অনিন্দ্য অতুলনীয় শোভা।

শ্রান্ত মলয় মারুৎ নেশার ঘোরের মত সুবাস বুকে লইয়া মৃদুকম্পনে তার সর্ব্ব শরীরে ঢলিয়া পড়িতেছে, মাথার শিয়রে মূর্ত্তিমতী অপ্সরা অলোকসামান্যা অতুলনীয়া রূপলাবণ্যবতী স্থিরযৌবনা স্বর্গের প্রফুল্ল

আননে, কমল নয়নে বুকভরা মধু ও প্রাণভরা আবেগ লইয়া তাহারি পানে অনিমেষে চাহিয়া আছে।

সুন্দর সে দৃশ্য নয়নমন তৃপ্তিকর অপার্থিব রমণীয় চারুচিত্র। পৃথিবীর লোকে সে দৃশ্য উপভোগ করে না—পার্থিব চক্ষু সে শোভা দেখে নাই—মধুর ও উজ্জ্বল—অমর-বাঞ্ছিত নন্দন কানন।

মার্ব্বেল-গঠিত রতন-খচিত, আলোক-প্লাবিত প্রাসাদে রাজেন্দ্র-ঈপ্সিত রাজসিংহাসনে সে অর্দ্ধশয়ান অর্দ্ধজাগ্রত অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র—নেশার ঘোরে স্বপ্নপুলকে ভাসমান—তৃপ্তি, সৌন্দর্য্য-আনন্দ; শান্তি, শোভা মাধুরী।

মাথার শিয়রে গল্পের, উপকথার, আকাঙ্ক্ষার, দেবরাজ্যের পরী—মধু-ভরা কুসুম—

"যেন ফুল্ল শতদল, বুকে করি পরিমল
চেয়ে আছে প্রিয় মুখ মধুমাখা সরমে।"

তবু সে দৃশ্য চলিতে লাগিল—চঞ্চল অস্থিরভাবে রঙ্গমঞ্চে দ্রুত পট-ক্ষেপের মত উদ্যান, বনপথ, নদীতীর, কুটীরসম্মুখ প্রভৃতি দৃশ্যাবলীর মত তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল—যখন স্থির হইল তখন—তাহারি নিজ উদ্যানে বারান্দায় ইজি চেয়ারে শয়ান, মাথার শিয়রে স্ত্রী বিধুমুখী দাঁড়াইয়া।

কোথায় অমরাপুরী, অপ্সরা, আবুহোসেনের রাজসিংহাসন আর কোথায় এই চিরপরিচিত নিজগৃহদৃশ্য! তবু ভাল—এরূপ মরণেও বিশেষ দুঃখ নাই। আজ কয়মাস হাজতবাস, কারাযন্ত্রণা ও বিচ্ছেদে যাহা একবার—একবার মাত্র শুধু নিমেষের তরেও দেখিবার জন্য কত তৃষ্ণা, লালসা ও আগ্রহ আবেগে চাহিয়াছিল, আজ মরণ তাহা নিমেষে আনিয়া দিল।

চিরবিচ্ছেদের চরম যাতনার সঙ্গে এ মিলন—হউক ক্ষণিক, মিলন

বড় সুখের—'এ যে বড় দুখে সুখ—বিধি চেয়ে ব্যাধ ভাল এ বড় কৌতুক।"

বিধুমুখী কি বলিতেছিল, কিন্তু ক্ষীরোদ তাহা ভালরূপ বুঝিতে বা শুনিতে পাইল না—জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; কবির ভাষায় মনে হইল—"এ পারের কাণ নাই ও পারের নাই বুঝি ভাষা।" নির্ব্বাক্ ক্ষীরোদ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিধুমুখী পুনরায় ঠেলিয়া বলিল, "ঘরে গিয়ে শোবে চল, কত রাত্রি হয়েছে, তার কি হুঁস আছে।"

মনে মনে হাসি আসিল—যেখানে সে আসিয়াছে কে জানে সেখানে দিন কি রাত্রি!—মানুষের সমস্ত ক্ষণই দিবার উজ্জ্বল আলোকে বা নিশার নিবিড় অন্ধকারে কাটিয়া যায় কে জানে?

লোকে বলে, মৃত্যুর পর জাগ্রত জগতের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ—আর দেখা হয় না;—জগতের, সংসারের সমস্ত মায়া-মোহ আকর্ষণ কাটাইয়া কোন্ এক অজানা রাজ্যে চলিয়া যায়—"না জানে নাম না জানে ঠিকানা ওহি দেশ মে জানা।"

তবে এ মিলন কিসের, এই নিজ গৃহ, স্ত্রী ও সম্ভাষণ এ সব কিসের—কল্পনা, স্বপ্ন না সত্য? এ পারেও কি সত্যের সম্ভাবনা, কল্পনার খেলা ও স্বপ্নের কুহক ফুটিয়া উঠে!

হউক স্বপ্ন, হউক কল্পনা, যেন এ কুহক যুগযুগান্তর স্থায়ী হয়, "এ পুলক যেন কভু নাহি টুটে গো।"

বিধুমুখীর বারম্বার ডাকাডাকি ও উত্তেজনায় বেশ করিয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল;—নির্ব্বাক্, তবু বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিল—এত দিব্য দৃষ্টি, স্পষ্ট জাগরণ!

তবে কি সে সত্যই তার বাড়ীতে, তবে কি এটা স্বপ্ন নয়? সত্যই কি বিধুমুখী তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে।

বুঝিতে পারিল না; একটা অজানা আশঙ্কা ও আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া সমস্ত শরীর ঘামে ভাসিয়া গেল।

কিছু বিলম্বে কঠোর সত্য স্পষ্টই জানাইয়া দিল যে, সে সত্যই জীবিত ও জাগ্রত—তার নিজের বাড়ীতে ও বিধুমুখীর পার্শ্বে। বুঝিতে পারিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল ও অধরের কোণে এক ঝলক্ হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

বিধুমুখী। আচ্ছা ঘুম যা হোক্, কত ডাকা ডাকাতে ঘুম ভাঙ্গিল, কিন্তু এখনো ঘুমের ঘোর, মুখে কথাটী পর্য্যন্ত নাই।

তবে কি এতক্ষণের ঘটনা সমস্তই স্বপ্ন—সেই কামিনীর বাটী গমন, রক্তাক্ত ও বীভৎস হত্যাদৃশ্য, পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার, হাজত বাস, মামলা, দুশ্চিন্তা, অপমান, বিপদ্ ও ফাঁসি এ সকলই স্বপ্ন? স্বপ্ন কি এত সত্য ও স্পষ্ট হয়?

এখনো যেন মনে হয় সত্য, স্বপ্ন নহে—জাগ্রত জীবন-নাটকের বিষাদের অঙ্ক! এ যেন অন্যান্য ঘটনাবলীর মত জীবনের সহিত একত্র গ্রথিত হইয়া গেছে।

যখন বুঝিতে পারিল তখন আবার হাসি আসিল—ভীষণ দুঃস্বপ্নের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যেন পুনরায় নবীন উদ্যমে বাঁচিয়া উঠিল।

বুঝিল স্বপ্নই বটে; বারান্দার ইজিচেয়ারে ঘুমাইয়া পড়িয়া এই পাপ স্বপ্নের আরম্ভ; পরে বিধুমুখী কর্ত্তৃক কাঁধে হাত ও চেয়ারের ঝাঁকানিতে কল্পিত ফাঁসির সহিত স্বপ্নের নিবৃত্তি; বুঝিল এই এতদিনের বা এতক্ষণের যাহা কিছু অভিনয়—সকলি কল্পনা, "নিশার স্বপন সম সে সব বারতা।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কর্ম্মানুসারে জীবের গতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যে যেমন কর্ম্ম করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে। জ্ঞানীরা বিচার-বুদ্ধিতে এই মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল বস্তুতেই ঈশ্বরের অংশ আছে ; কারণ, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে চৈতন্যরূপী আত্মা ঈশ্বরের অংশভাবে আছেন। মানুষ নিজ নিজ কার্য্যে বিবেকের পরামর্শে ভালমন্দ বিচার করিতে পারে ; সেই জন্য মানুষ আপন আপন কর্ম্মের জন্য দায়ী। জ্ঞানিগণের মত এই যে, প্রত্যেক মানবই নিজ নিজ ভালমন্দ কর্ম্মের জন্য দায়ী ; ইহাতে ঈশ্বরের কিছু হাত নাই বা হাত থাকিতেও পারে না, কারণ তাহা হইলে জগতের খেলা অকালে ভাঙ্গিয়া যায়। ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যে মানব স্বেচ্ছায় পাপের পথে যাইবে, তাহাকে তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। ভোগ না হইলে কর্ম্মক্ষয় হয় না, এবং কর্ম্মক্ষয় না হইলে আবার পরম শান্তিলাভ করা যায় না।

ভক্তেরা অন্যরূপ বিচার করেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বরের শরণাগত হইলে কর্ম্ম ক্ষয় হয়। ঈশ্বরই কর্ত্তা, কর্ম্ম কর্ত্তা নয়। কারণ, যিনি আইন করিয়াছেন, তিনিই উহা বদ্‌লাইতে পারেন।

ভক্তগণ আরও বলেন, ঈশ্বরের পক্ষপাতিতা নাই ; কারণ, তিনি নিজেই সব। জীব, জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সবই ঈশ্বরময় ; সুতরাং তিনি আর অপর কাহার উপর পক্ষপাত করিবেন ? ঈশ্বর লীলাময়। তাঁহার খেলা ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধির অগোচর। ভক্তের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ ;—

"সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।
কারে দাও মা! ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী॥
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী।
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি॥"

ঈশ্বরই কর্ত্তা। তিনি আমাদের যেমন চালান, আমরা তেমনি চলি। আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী।

তিনি আনন্দময়ী। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের লীলা তিনি করিতে-ছেন। অসংখ্য জীবসমূহের মধ্যে দুই একটী মুক্ত হইয়া যাইতেছে, তাহাতেও তাঁর আনন্দ—

শ্যামা মা উড়াচ্চেন ঘুড়ি—

* * * *

ঘুড়ি লক্ষের দুই একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।

সংসারী জীবের মধ্যে কেহ বা বদ্ধ হইতেছে, আবার কেহ বা মুক্ত হইতেছে।

ভক্তশ্রেষ্ঠ বলেন, যতক্ষণ না তাঁহাকে জানিতে পারিতেছ, ততক্ষণ সকলে 'আমি' 'আমি' করিতেছ। 'আমি কি' খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিবে 'তিনি' বই আর কিছুই নাই।

কিন্তু ভক্তগণের মূলসূত্র লইয়া অনেক পাপী পাপের পক্ষ সমর্থন করে। পাপী পাপ করে, আর মুখে বলে,—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

অর্থাৎ, হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া যাহা করিতে আদেশ

করিবে, আমি তাহাই করিব। এই সকল জ্ঞান-পাপী তাহাদের পাপের মধ্যে ঈশ্বরের আদেশ ও সাহায্য কল্পনা করিয়া উত্তরোত্তর পাপ কার্য্যে অগ্রসর হয়। তাহারা ভাবে না এবং জানে না যে ঈশ্বর পাপকার্য্যে কাহাকেও নিযুক্ত করেন না। পাপের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ হয় না; কিন্তু পাপের ধ্বংসের জন্য অবতার আবির্ভূত হন। যাহারা নিজেদের ভোগবাসনাতৃপ্তির জন্য পাপ করিয়া বলে, ঈশ্বর যাহা করান, আমরা তাহাই করি, তিনিই আমায় পাপ করালেন, আমি ত স্বয়ং কেউ না, সবই তিনি; তাহারা ঈশ্বরের দোহাই দিয়া পাপের হাত হইতে উদ্ধার হইবার চেষ্টা করে; কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। তাহাদের কর্ম্মই তাহাদের ভবিষ্যৎ অবস্থার ব্যবস্থা করে। তখন তাহারা স্বভাবতঃই বলে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি পাপ করিয়াছি, তবে আমি পাপের ফলভোগ করিব কেন?

এই সব যুক্তি অসার। ভক্তের মত ভাল মন্দ পাপ পুণ্য সর্ব্বস্ব ঈশ্বরের পদে সমর্পণ করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র পাপের বেলায় ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া শুধু বৃথা নহে, নূতন পাপের কারণ। আমি জানিয়া শুনিয়া নিজের আমোদের জন্য পাপ করিব, এবং তাহার ফলভোগ করিবার সময় বলিব 'আমার কোন কাজে হাত কি? তিনিই যা করাচ্চেন, তাই কচ্চি।' এইরূপ বিশ্বাস প্রচার করিলে কোনও ফল নাই। ইহাতে ঈশ্বরের দয়াও হইবে না এবং পাপের ফলভোগ করিতে সে ছাড়া অপর কেহই আসিবে না।

পাপী অনেক প্রকার আছে। যাহারা এইরূপ জ্ঞানপাপী, তাহারা আপনাকে আপনি প্রতারণা করে। তাহাদের মুখের কথায় পাপ উড়িয়া যায় না, কারণ তাহাদের পাপের কর্ত্তা তাহারা নিজেরাই। তাহারা ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করে, কারণ তাহারা অন্তরের অন্তরে জানে যে, কোন বিষয়ে তাহাদের ঈশ্বরে নির্ভরতা বা বিশ্বাস নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহাদের

কোন ধারণাই নাই। তাহারা ঈশ্বরের ধারও ধারে না। কেবল মাত্র লোকের নিকট এবং কতকটা আপনাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাহারা এই অদ্ভুত যুক্তির আবিষ্কার করে। কিন্তু এইরূপ দুষ্টামির কোন কৌশলই স্থায়ী হয় না। গীতার শ্লোকের দোহাই দিলেও ন্যায় বিচারে তাহার রক্ষা নাই। সে নিশ্চয়ই স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে।

গীতার ২য় অধ্যায়ে যে কর্ম্মযোগের কথা আছে, তাহাতে ঈশ্বরের পদে কর্ম্মফল সমর্পণ করিলে, পরম শান্তি পাওয়া যায়, ইহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; তাহার যুক্তি অতি সুন্দর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ-ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

অর্থাৎ কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই। যে কর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না, তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম কহে। নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগে বিমল শান্তি পাওয়া যায়। সেইজন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

যদি আমরা কর্ত্তব্যবোধে সকল কর্ম্ম করিতে পারি, এবং কর্ম্মফলের আশা পরিত্যাগ করিতে পারি, অর্থাৎ ফলাফল ভগবানে অর্পণ করিতে পারি, তবে ফলাফলের দুশ্চিন্তার ও উদ্বেগের হস্ত হইতে আমরা হাতাহাতি রক্ষা পাই। আমরা এমনই দুর্ব্বল যে একটী কার্য্য করিয়া হয় তাহার প্রশংসা শুনিবার জন্য, না হয় তাহার নিন্দা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কার্য্য শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠায় জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করি। আমরা সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাই যে প্রকৃত বিপদ্ আসিবার বহু পূর্ব্বেই আমরা বিপদ্ কল্পনায় আনিয়া নিদারুণ যাতনা সহ্য করি। ইংরাজীতেও একটী এই প্রকারের প্রবাদ আছে, "Don't meet dangers half-way, অর্থাৎ বিপদ্ আসিবার পূর্ব্বেই

বিপদ্ আলিঙ্গন করা উচিত নয়; কারণ তাহাতে অকারণ কষ্টভোগ মাত্র সার হয়। ভবিষৎ ফলাফলের দিকে না চাহিয়া কর্ত্তব্য বুঝিয়া সকল কর্ম্ম করিলে, এই সব অকারণ দুঃখভোগ নিবারণ করা যাইতে পারে। ইহাই গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগ।

আরও ভালরূপে এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বুঝিতে হইলে এইগুলি চিন্তা করা দরকার। কোন কিছু কামনা করিয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম কামনা পূরণের দিকে যাইবে, এবং যতদিন না কামনা পূরণ হয়, ততদিন কর্ম্মের শক্তি কমিবে না। স্বর্গাদি কামনায় যজ্ঞ করিলে, স্বর্গ-ভোগ হইতে পারে, কিন্তু জীবহত্যায় যজ্ঞ করা হইয়াছে বলিয়া সেই স্বর্গ ক্ষণিক, স্থায়ী হয় না।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যে সকল কাম্য কর্ম্মের উপদেশ আছে, তাহা কেবলমাত্র অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য। সুখের কামনায় কর্ম্ম করিলে তাহার ফল সুখভোগ, ঐশ্বর্য্যভোগ। সুতরাং কামনা করিয়া কর্ম্ম করিলে যে কর্ম্ম হয়, তাহাকে কাম্য কর্ম্ম বা সকাম কর্ম্ম কহে। আবার, কোন কামনা না করিয়া, সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধি হইয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুলা জ্ঞান করিয়া, কর্ম্ম করিতে পারিলে, নিষ্কাম কর্ম্ম করা হয়।

সকাম কর্ম্মের ফল জন্মগ্রহণ, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল মুক্তি। সকাম কর্ম্মের ফল আসক্তির বৃদ্ধি ও ভোগ, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল, নিবৃত্তির উদয় ও বৃদ্ধি। সকামে ইন্দ্রিয় সেবা, নিষ্কামে ইন্দ্রিয় জয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মণীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥"

২য়। ৫১।

অর্থাৎ—(সেইরূপ) মার্জ্জিত বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিত সকল কর্ম্মের জন্য ফল-সমূহ ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দুঃখশূন্য বৈকুণ্ঠে গমন করে। কামনা বা আসক্তি হইতে দুঃখের উদয় হয়। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, মানুষ মায়ায় পড়িয়া কতই না ক্লেশ পাইতেছে। যে যত বেশী মায়া বিস্তার করিয়া সকলকে ভালবাসে, সে তত বেশী বিরহে কাতর হয়। মাতা পুত্রের মৃত্যুতে যে শোক পায়, পিতা বা ভ্রাতা অপর কেহই সেইরূপ মর্ম্মান্তিক যাতনা পায় না; তাহার কারণ, মাতার পুত্রের প্রতি ভালবাসা অত্যন্ত অধিক।

মায়া দুর্ব্বলতা, দয়া পরম ধর্ম্ম। অনেকে ভুল করিয়া বলেন "আহা লোকটা কত ভাল, কত উন্নত; কারণ ওর শরীরে মায়া দয়া আছে।" মায়ায় লোককে বদ্ধ করে, কাপুরুষ করিয়া তোলে এবং দুর্ব্বল হৃদয় করে। দয়ার ধর্ম্ম ঠিক্ ইহার বিপরীত। দয়ায় মনুষ্যত্বের প্রসার হয়, জীবের দুঃখে প্রাণ কাঁদে, দুঃখ দূর করিবার প্রবৃত্তি হয়, হৃদয় উন্নত ও উদার হয়। মায়ার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ঘোরে। দয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও আনন্দ ঘোরে। সুতরাং মায়া ও দয়া এক জিনিষ নহে।

সুতরাং গীতার উক্তি মহাসত্য। সেই উক্তিটী—এই যাঁহারা ফল-কামনায় কর্ম্ম করেন, তাঁহারা কৃপণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিতে তাঁহারা বাধ্য; তাঁহাদের মুক্তি নাই, ভোগ নিবৃত্তি হয় না।

কামনা হইতে আসক্তি এবং আসক্তি হইতে জন্মান্তর গ্রহণ কিরূপে হয়, আগামী বারে আমরা বুঝাইব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এ, বি, এল্।

প্রেতিনী-দর্শন।

অলৌকিক রহস্যের পাঠকগণকে অর্থাৎ ভূত ও পরকালবিশ্বাসী-দিগকে সময় সময় বড় বিপদে পড়িতে হয়। অনেকে ভূত মানেন না, উহা লইয়া নানারূপ বিতর্ক করেন; মনে হয়ত, বিশ্বাসীদিগকে নির্ব্বোধ ঠাওরাইয়া রাখেন। নির্ব্বোধ হইতে আপত্তি নাই, কিন্তু সুবোধ হইতে যাইয়া সত্যের প্রতি অনাদর দেখাই কেমন করিয়া? নিজের চক্ষুকেই বা কি বলিয়া বুঝাইব? এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, আমিও তাঁহাদের মত একদিন সুবোধ বালক ছিলাম, কিন্তু নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে মতিভ্রম হইতে সূত্রপাত হইল।

বেশ মনে আছে, আমার বাসার ঠিক্ পার্শ্বে এক খণ্ড নূতন কর্ষিত ভূমি, তার মাঝে একটী পত্রশূন্য বিল্ববৃক্ষ অগণ্য ফলহস্তে দণ্ডায়মান। রাত্রি শুক্লপক্ষের। সন্ধ্যা হইতেই চন্দ্রদেব তাঁহার স্নিগ্ধ করে ধরণীকে হাসাইতেছেন। ঐ ভূমি-খণ্ড বাসা-সংলগ্ন হইলেও মাঝখানে একটী বেড়া উভয়কে পৃথক্ রাখিয়াছে। সেই বেড়া, বা সীমানায় একটী আম্র-বৃক্ষের ছায়ায় সন্ধ্যার কিছু পরে আমি শৌচে বসিয়াছি। ক্ষেত্রখানি নূতন কর্ষিত বলিয়া একটী তৃণও তাহাতে ছিল না। মুহূর্ত্তেক পরে বাজারের রামলাল দত্ত নামক জনৈক গন্ধবণিক্ আমার সম্মুখ দিয়া বিল্ব গাছটীর ৮।১০ হস্ত দূরে বসিল। আমি গাছটীর প্রায় ২৫ হাত উত্তর পশ্চিমে, রামলাল দক্ষিণ দিকে। সে আমাকে সম্যক্ দেখিতে না পাইলেও, আমি তাহার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী স্পষ্টই দেখিতেছিলাম। তাহার অনুমান বিংশতি হস্ত দূরে একটী বৃহৎ শাঁড়া গাছ অন্য সীমানার উপর দণ্ডায়মান। তাহার পার্শ্বে বাজারে যাইবার প্রকাশ্য পথ। হঠাৎ দেখিলাম একটী স্ত্রীলোক আপাদ-মস্তক শুভ্র-বসনাবৃত হইয়া অতি

সন্তর্পণে ঐ বৃক্ষের দিক্ হইতে রামলালের দিকে আসিতেছে। রামলাল মধ্য-বয়স্ক, বিপত্নিক, খুব সচ্চরিত্র বলিয়া নিজেকে সর্ব্বদা প্রতিপন্ন করে। আজ বুঝি তাহার ঝোলার বিড়াল বাহির হয়।

দৃষ্টি মাত্রেই স্থির করিলাম—নিশ্চয়ই কোন বারাঙ্গনা রামলালের সঙ্কেত মতেই আসিয়াছে। কিন্তু যখন দেখিলাম—রমণী তাহাকে অতিক্রমণ করিয়া বিল্ববৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিল, তখন দ্বিধা হইতে লাগিল। ভাবিলাম, রামলাল আমাকে বুঝি দেখিয়াছে। শিকার বুঝি সরিয়া গেল। বলা বাহুল্য, আমি এ পর্য্যন্ত একরূপ নির্নিমেষ নেত্রেই চাহিয়া রহিলাম। স্ত্রীলোকটীর গতি পূর্ব্ববৎ অতি ধীর, অতি মন্দ, বরাবর সমান, যেন একটী পুতুলকে অদৃশ্য সূত্র দিয়া কেহ টানিতেছে। কারণ একটী বারও পা তুলিয়া ফেলিতে দেখিলাম না, মুখখানিও দেখিবার যো নাই। ইহা যে প্রেতিনীর অপচ্ছায়া, তখন তাহাই মনে হইল ;কারণ অনেকের মুখেই শুনিয়াছি, তাঁহারা ইহার নিকট মাঝে মাঝে এইরূপ দেখিয়াছেন। আমিই বড় গ্রাহ্য করিতাম না। কারণ—ঐ স্থানে শৌচে বসা নূতন নহে। আর কোন দিনই পূর্ব্বে দেখি নাই। তাই দিব্যচক্ষুঃ হইয়া তাহার হাবভাব গতিবিধি দেখিতে থাকিলাম। বোধ হয় পুরন্দর তাঁহার সহস্রলোচনে ইহা অপেক্ষা অধিক দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য ? বেল গাছটীর ৫।৬ হাত দূরে থাকিতে ছায়াটী কি হইয়া গেল ! চক্ষের উপর কেমন মিলাইয়া গেল ! আর কিছুই দেখি না।

ইহার একটু পরেই রামলাল শৌচ সারিয়া সেই স্থানের নিকট দিয়াই চলিয়া গেল, আমিও বেড়া পার হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম মেজেয় বসিয়া তখনও আমার দিদি, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পূর্ব্ববৎ দশপঁচিশ খেলিতেছে। প্রেতিনী-দর্শন ব্যাপার বলিয়া তাহাদের মনে

ভীতি সঞ্চার করিলাম না। পরদিন রামলালকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম, সে কিছুই দেখে নাই।

এখানে আর একটু বলিতে হয়। বৎসরৈক পূর্ব্বে পার্শ্বস্থ পথে বাজারের একটী বেশ্যা আরও কয়েকটীর সঙ্গে সন্ধ্যাকালে শৌচ হইতে প্রত্যাগমন কালে হঠাৎ বসিয়া পড়ে ও তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা যায়। আমরা যাইয়া দেখি—শেষ হইয়া গিয়াছে! ইহার পূর্ব্বেও নাকি দুই একজন ঐ মাঠে ভয় পাইয়াছে এবং মারাও গিয়াছে! মাঠের মাঝে একটী বটগাছ আছে। সেখানে কতজনে কতরূপ দেখিয়াছে বলিয়া অনেক গল্প প্রচারিত আছে। অন্ধকার দৃষ্ট মূর্ত্তিটা সেই পথে মৃতা বেশ্যাটীর অনুরূপ লম্বা বটে। মুখ ত দেখা যায় নাই।

সন্দেহ রহিল—রামলাল না দেখিল কেন? ইহাও কি সেই ভূতের ইচ্ছায়?

আর একটী কথা বলা আবশ্যক। আমার বাসায় একটী ব্রাহ্মণ-যুবক একখানি ঘর বাঁধিয়া সপরিবারে কিছুদিন থাকেন। ইনি স্থানীয় রেলের কর্ম্মচারী। স্ত্রীটী ৮ মাস গর্ভবতী। ভদ্রলোকটীর ঘরখানি যে পার্শ্বে, তাহারই অদূরে পূর্ব্ব কথিত শাঁড়া গাছটী অবস্থিত। এমন কি, তাঁহার ব্রাহ্মণী ঐ গাছের নিকটেই শৌচাদি সম্পন্ন করিতেন। তিনি বারান্দার যে পার্শ্বে বসিয়া বেশবিন্যাস করিতেন, তাহা ঐ গাছ হইতে সম্পূর্ণ দেখা যায়। একদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপত্নী বেশ-বিন্যাস করিতে করিতে বিকট মুখভঙ্গিমা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন ও গৃহমধ্যে যাইয়া শুইয়া পড়েন। জ্ঞান নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে অস্ফুট চীৎকার! সেকি ভীষণ চীৎকার! এখনও মনে হইলে দেহ রোমাঞ্চিত হয়! এইরূপ কয়েক ঘণ্টা করিয়া রাত্রি দুইটার সময় সব শেষ হইল! আমার স্ত্রী প্রথমাবধি নিজেদের বাস ঘরের বারান্দায় বসিয়া দেখিয়াছিল।

জনৈক ভদ্রলোক ঐ গাছটী অমঙ্গলজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে আমরা অবিলম্বে স্থানান্তরে বাসা উঠাইলাম। পূর্ব্বে প্রেতিনীদর্শন হইলেও, ঐ গাছটা সম্বন্ধে কোন অমঙ্গল চিন্তা মনে উঠে নাই। তাহা হইলে, হয় ত ব্রাহ্মণটীর তাদৃশ সর্ব্বনাশ হইত না। আমার স্ত্রী ঐ বাসা হইতে হঠাৎ গাত্রকম্পন ও বুকের মধ্যে ধড়ফড় করা রোগ লইয়া আসিয়াছে. তাহা কোনরূপ চিকিৎসাতেই সারিল না ! *

অচিরাৎ ব্রাহ্মণীও ভূত হইয়াছে বলিয়া রটিত হইল! কিন্তু বাসার কেহ দেখে নাই।

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ হেড্ মাষ্টার
বসুন্ধিয়া।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

স্বপ্ন ও রূপক-আদর্শ বা Symbolism.

মানবের চিন্তা বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে,—একথা পূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। † এই সমস্ত চিন্তামূর্ত্তির এক একটী নির্দ্দিষ্ট বর্ণ ও আকৃতি আছে। মানবের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সেই সমস্ত মূর্ত্তি দেখিয়া অপরের মনের ভাব বুঝিতে সক্ষম হয়। আমরা যেমন স্থূল-জগতে মনের ভাব

* সম্পাদক মহাশয় সংশয়টী দূর করিলে বাধিত হই। স্ত্রীর কোন কবচাদি ধারণে ফল পাই কি না? কেহ জানেন কি না?

† অলৌকিক রহস্য—৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। ১০২—১০৫ পৃষ্ঠা।

স্থূল ভাষায় বা স্থূল লিখনে ব্যক্ত করি; সূক্ষ্ম জগতে সেইরূপ চিন্তার বা ভাবের স্থূল ভাষা বা লিখনদ্বারা অনুবাদের আবশ্যক হয় না। সূক্ষ্ম-দেহস্থিত মানব সেই ভাবরাজি সাক্ষাদ্ভাবে,—ভাষাদিরূপ পরোক্ষ সাহায্য-ব্যতিরেকে,—জানিতে পারে।

স্থূল জগতের ভাব-জ্ঞাপনের সাধক যেমন ভাষাদি, সূক্ষ্মজগতের সেইরূপ এই ভাব-মূর্ত্তিগুলি। ভাব-জ্ঞাপন-সাধকের সাধারণ নাম হইয়েছে বাক্। স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে বিভিন্ন চৈতন্যে যেই যেই ভিন্নরূপে ভাব জ্ঞাপিত হয়, তদনুরূপ "বাক্"ও ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে; যথা,—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখারী। যেমন প্রণব চতুষ্পাৎ, যেমন মহা চৈতন্য চারিরূপে স্থিত, যেমন মানব-চৈতন্যের চারিভাব, তদ্রূপ "বাক্"ও চারি প্রকারের। আমি এই তত্ত্ব অতি বিশদভাবে "প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রে" আলোচনা করিয়াছি, বিশেষ অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন (পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৯)। জাগ্রৎ-চৈতন্যের "বাক্"কে সাধারণতঃ বৈখারী বলা যাইতে পারে; সেইরূপ স্বপ্ন-চৈতন্যের "বাক্"কে মধ্যমা, সুষুপ্তি-চৈতন্যের "বাক্"কে পশ্যন্তী ও তুরীয় চৈতন্যের "বাক্"কে "পরাবাক্" বলা হয়।

আমরা এখানে সুষুপ্তি-চৈতন্যের বিষয় আলোচন করিতেছি। এই চৈতন্যে অপরের ভাবরাশিকে মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পাওয়া যায় এবং শাস্ত্রও এই চৈতন্যের বাক্‌কে পশ্যন্তী বাক্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃত গুরু-শিষ্যের উপদেশ, প্রশ্নাদি এই ভাষায় হইয়া থাকে। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত দক্ষিণামূর্ত্তি-স্তোত্রে তাই আছে,—

চিত্রং বটতরোর্ম্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু চ্ছিন্নসংশয়াঃ॥

[ইহ অতীব বিচিত্র,—বটতরুর মূল-দেশে গুরু ও শিষ্যবর্গ সকলেই

মৌনভাবে উপবিষ্ট আছেন; শিষ্যেরা সকলেই বৃদ্ধ, কিন্তু মহা গুরু যিনি, তিনি চির যৌবনযুক্ত। গুরুদেব স্থূল বাক্য প্রয়োগ না করিয়া বুঝাইতেছেন এবং শিষ্যেরাও তাহাতে ছিন্নসংশয় হইতেছেন।]

আমাদিগের এই স্থলে এইটুকু দ্রষ্টব্য,—গুরুর মৌন ব্যাখ্যা এবং তাহাতে শিষ্যের অন্তরের সন্দেহের অপসরণ। অতএব আমরা দেখিলাম যে, চিন্তামূর্ত্তিগুলি চৈতন্য-বিশেষে দৃষ্ট হয়। যিনি বিচার-বুদ্ধি সংযত করিয়া মনকে একাগ্র করিয়া সম্যক্‌রূপে "নিদিধ্যাসন"-সাধনায় পারদর্শী হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলেই চিন্তামূর্ত্তি দেখিতে পান;—তাঁহাকে ইহা দেখিবার জন্য প্রাকৃতিক সুষুপ্তি অবস্থার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না। শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত গুরুস্তোত্রে যে শিষ্যবর্গের কথা উল্লেখ করিলাম, তাঁহারা প্রকৃত নিদিধ্যাসন-পারদর্শী; তাই তাঁহারা গুরু-দেবের মৌন ব্যাখ্যায় ছিন্ন-সংশয় হইতেছেন। পুরাণের অনেক রূপক, চিন্তামূর্ত্তি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। ঐ সমস্ত চিন্তামূর্ত্তি স্থূলভাষায় বর্ণনা করিতে হইলেই রূপক বলিয়া মনে হয়। পূজার মুদ্রা ও পুরাণের Symbolism র সৃষ্টি ইহা হইতেই;—সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ সূক্ষ্মদর্শনে অনভ্যস্ত মানবের নিমিত্ত তাহাদিগকে এইরূপে জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিরূপ চিন্তা কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহার বর্ণই বা কি, যদ্যপি এই তত্ত্ব জানিবার কাহারও প্রয়াস থাকে এবং সেই সমস্ত মূর্ত্তির চিত্র দেখিতে কাহারও সাধ হয়, তিনি থিওসফিকেলসোসাইটীর কর্ণধার শ্রীমতি এনিবেসেণ্ট ও শ্রীযুক্ত লেডবিটার-কৃত সচিত্র Thought Forms নামক পুস্তক পাঠ করিতে পারেন।

মানব সুষুপ্ত হইলেই, মানব-চৈতন্য শুদ্ধ ভাব-রাজ্যে অবস্থিত থাকে। সে চৈতন্য প্রজ্ঞা-চৈতন্য। তদবস্থায় ভাবদর্শন হয়। যে ভাষায় তখন চৈতন্য ভাব প্রকাশ করে, তাহা পশ্যন্তী-বাক্। যে ভাবটি প্রকাশ করিতে

জাগ্রৎ অবস্থার বহু বাক্যের আবশ্যক হইত, তাহা সুষুপ্তি-চৈতন্যে একটি চিত্রের দ্বারা সম্যক্ ভাবে ব্যক্ত হইতে পারে। ইহাই আমাদিগের পূর্ব্বালোচিত Symbol, রূপক-আদর্শ বা ভাব-চিত্র। এখন মনে করুন, কোন ব্যক্তি সুষুপ্ত অবস্থায় নিজের বা অপরের একটি ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া, তাহা তাহার স্থূল-মস্তিষ্কে সঞ্চরণ করিয়া দিতে যাইল। সূক্ষ্মচৈতন্যে সে যাহা দেখিয়াছে, তাহার বর্ণনা স্থূল মস্তিষ্কে অঙ্কিত করিয়া দিল। কিন্তু আমরা যেমন শব্দের পর শব্দ সংযোজনা করিয়া, নানা প্রকারে, নানা-বাক্যে, জাগ্রৎ অবস্থায় কোনও বিষয়ের বর্ণনা করি, সে তাহা না করিয়া একটি সামান্য চিত্রে, একটি রূপক-আদর্শে তাহা করিল। তাহার পর মানব যখন প্রবুদ্ধ হয়, আবার যখন তাহার স্থূলচৈতন্য ফিরিয়া আসে, সে সেই অঙ্কিত চিত্রটিকে স্থূল-চৈতন্যের ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া লয়। কিন্তু, যদ্যপি কেবল সেই চিত্রটি স্মৃতিতে থাকে, যে সঙ্কেত সাহায্যে সেই চিত্রটি স্থূল ভাষায় অনুবাদিত হইতে পারে, তাহা যদ্যপি জাগ্রৎ চৈতন্যে স্মরণে না আসে, তাহা হইলেই মহাগোল। তখন কেবল সেই রূপক-আদর্শ-চিত্রেরই পরিচয় দিতে পারে; কিন্তু, সেই চিত্রটি যে কিসের রূপক, বা কি ঘটনার বা বিষয়ের সূচক তাহা বলিতে পারে না।

আবার কেহ কেহ নিজের এক প্রকার পরিভাষা, এক প্রকার সঙ্কেত প্রস্তুত করে এবং তৎসাহায্যে স্থূল-মস্তিষ্কে অঙ্কিত রূপক-আদর্শকে ব্যঞ্জনা করে। শ্রীমতী ক্রো, (Mrs Crowe) নাইট্ সাইড্ অব নেচার (Night side of Nature) নামক পুস্তকে ইহার একটী সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। একজন ভদ্রমহিলা কোনও একটি দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে মৎস্য সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিতেন। একদিন তিনি নিদ্রিত অবস্থায় দেখিলেন যে, একটি বৃহৎ মৎস্য তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের দুইটী হস্তাঙ্গুলিতে দংশন করিয়াছে। তাহার পরক্ষণেই তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার সেই

পুত্রের সহাধ্যায়ী পরশু আঘাতে তাহার ঠিক সেই অঙ্গুলিদ্বয় ক্ষত করিয়াছে। শ্রীমতী ক্রো আরও বলিয়াছেন যে তিনি এইরূপ অনেক অশুভ-সূচক দুঃস্বপ্নের কথা জানেন। কোনও বিপদের প্রাক্‌কালে এক একজন লোকে এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট জীব বা দ্রব্যের স্বপ্ন দর্শন করে। *

রূপক-আদর্শের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার কখনও কখন বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন সঙ্কেত থাকিলেও, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে,—চিত্রবর্ণের মত (Hieroglyphics) ইহাদিগের একটা নির্দ্দিষ্ট প্রয়োগ আছে ; যথা,—গভীর জলরাশির স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা, মুক্তার স্বপ্নে চক্ষুর্জ্জল সূচনা করে। শাস্ত্র এইরূপ অনেক সাধারণ স্বপ্ন-ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠককে আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ৭৭ অধ্যায়, ৭০ অঃ, ৬৩ অঃ, ৮২ অঃ, ৩৩ অঃ, ৩৪ অঃ, দেবীপুরাণ ২২ অঃ, কালিকাপুরাণ ৮৭ অঃ, মৎস্যপুরাণ ২১৬ অঃ ইত্যাদি দর্শন করিতে অনুরোধ করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

* A lady who whenever a misfortune was impending, dreamt that she saw a large fish. One night she dreamt that the fish had bitten two of her little boy's fingers. Immediately afterwards a school fellow of the child's injured those two very fingers by striking him with a hatchet. I have met with several persons who have learnt by experience to consider one particular dream as the certain prognostic of misfortune.]

Night *Side* of Nature, page 54.]

জাতিস্মর।

পূর্ব্বজন্মের ঘটনা যাহার স্মরণে আসে, তাহাকে জাতিস্মর বলা হয়। পূর্ব্বজন্ম থাকা সম্বন্ধে হিন্দু আমরা, আমাদের বিশ্বাস অস্থি-মজ্জাগত বলিতে হইবে। কিন্তু আজ ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের বিচারশক্তি গঠিত হওয়ায়, অনেকেই আমরা এক্ষণে পূর্ব্বজন্ম থাকা সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছি। এই জন্মের পূর্ব্বে আমাদের আর কখনও মনুষ্যজন্ম হইয়াছিল ও ভবিষ্যতে আবার আমাদের নরদেহে এই পৃথিবীতে আসিতে হইবে, একথা আমরা আর স্বীকার করিতে সম্মত হই না। ইহার সম্বন্ধে প্রমাণাভাব ও ঋষিবাক্যে অনাস্থাই আমাদের এই অবস্থার মূল বলিতে হইবে।

এক্ষণে পুনর্জ্জন্মের কথা উঠিলেই আমরা বলিয়া থাকি, যদি আমাদের পূর্ব্বজন্মই ছিল, তবে সেই জন্মের কথা আমাদের স্মরণ হয় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার পূর্ব্বে ধীরভাবে বিচার করিলে আমরা বলিতে পারি যে, পূর্ব্বজন্মের ঘটনা স্মরণ থাকাই আশ্চর্য্যের বিষয়, স্মরণ না থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। গত জীবনের কথা দূরে থাকুক, এই জীবনের সকল ঘটনাই কি আমরা স্মরণে আনিতে পারি? বাল্যকালের সকল ঘটনাই ত এখন আমাদের স্মরণাতীত হইয়া পড়িয়াছে। তবে যে সকল ঘটনা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা যে আর কখনও মনে আসিবে না এরূপ বলা যায় না। কোন বিশেষ ঘটনাতে হয়ত অনেক দিনের পূর্ব্বেকার অপর একটি ঘটনার কথা আমাদের স্মরণপথে আসিয়া পড়ে। আবার কাহাকেও মোহনিদ্রায় অভিভূত করিলেও তাহার পূর্ব্বেকার

ঘটনা সকল যাহা তাহার আদৌ মনে ছিল না, এই অবস্থায় সে স্পষ্ট সেই সকল ঘটনা বলিতে পারে। বিকারাদি অবস্থায় অনেক হারাণ কথা অনেকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

এই ব্যাপার হইতে বুঝা যায় যে আমাদের স্মৃতি দুই প্রকার, এক প্রকার স্মৃতি আমরা নিয়ত লইয়া রহিয়াছি। আর এক প্রকার স্মৃতি আছে, তাহাকে প্রচ্ছন্ন স্মৃতি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। আমরা যে সকল কথা ভুলিয়া যাই, তাহা এই প্রচ্ছন্ন স্মৃতিতে যাইয়া চাপা অবস্থায় থাকে। এই প্রচ্ছন্ন স্মৃতিতে যে সকল ঘটনা জাগরূক থাকে, তাহা আমরা সহজে প্রকাশ্য স্মৃতি-পথে আনিতে পারি না। কোনরূপে আমাদের এই নিয়ত জাগরূক স্মৃতিকে চাপিয়া ফেলিয়া, এই আমাদের বাহ্যজ্ঞানকে লোপ করিয়া ফেলিতে পারিলেই আমাদের যে অবস্থা হয়, যাহাকে আমরা চলিত কথায় বাহ্যসংজ্ঞাহীন অবস্থা বলি, এই অবস্থায় আমাদের সেই চাপাপড়া প্রচ্ছন্ন স্মৃতি অনেকটা মুক্ত অবস্থা হইয়া পড়ে ও আমরা এই অবস্থায় অনেক নূতন কথা শুনিতে পারি। আমরা যাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাহা আমরা অনেক বলিতে পারি। আমাদের স্থূল দেহে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া কোনরূপে বন্ধ হইলে, অথবা একেবারে আমরা ধ্যান ধারণাদি দ্বারা মনস্থির করিতে পারিলে, আমাদের ঐ প্রচ্ছন্ন স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে যাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া মনে করি, তাহা কিছুই ভুলি নাই, ঐ প্রচ্ছন্ন স্মৃতি-পথে সবই আছে; বাহ্য স্মৃতির অন্তরালে গিয়া পড়িয়াছে মাত্র। বর্ত্তমান জন্মের ঘটনাদি সম্বন্ধে এইরূপ হইলে, বহুকাল পূর্ব্বে স্বতন্ত্র দেহে যে সকল ঘটনা হইয়াছে, তাহা স্মরণ না হওয়া তত আশ্চর্য্য নহে, বরং স্মরণ হওয়াই আশ্চর্য্য বলিতে হইবে।

পূর্ব্বজন্মে আমাদের যে স্থূল দেহ ছিল, তাহা কতকাল পূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই দেহনাশের পর মানবকে ভুবর্লোকে কামদেহ ধারণ করিতে হইয়াছে। তথায় সুদীর্ঘকাল বাস দ্বারা বাসনা-ক্ষয়ে মানবকে উক্ত কামদেহ ত্যাগ করিয়া মনোময় দেহ লইয়া স্বর্গলোকে যাইতে হইয়াছে। স্বর্গবাস অন্তে মানবের উক্ত মনোময় দেহও নাশ হইয়াছে। শেষে তাহাকে কারণ-দেহে যাইয়া পুনরায় মহর্লোকের প্রান্ত দেশ হইতে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। এই সময়ে সেই মানব নূতন মনোময় কোষ, প্রাণময় কোষ গ্রহণ করিয়া নূতন পিণ্ডদেহ সংগ্রহ করিয়া গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পিণ্ড ও ভাণ্ডদেহ পুষ্টি করিয়া পুনরায় এই জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, আমার এই জন্মে যে স্থূল শরীর, যে পিণ্ডদেহ আছে, তাহা পূর্ব্বজন্মে ছিল না। এমন কি, এই দেহের ভিতর যে বাসনাময় কামদেহ ও চিন্তাময় মনোময় দেহ আছে, তাহাও আমার পূর্ব্বজন্মের সেই কামদেহ ও মনোময় দেহ হইতে ভিন্ন। একের মধ্যে সেই কারণ-দেহ, যাহাকে অনেক স্থানে জীবাত্মা বলা হইয়াছে, সেই জীবাত্মা, সেই কারণ-দেহ আমার পূর্ব্বজন্মেও যাহা ছিল, এজন্মেও সেই আছে, ইহার পরিবর্ত্তন হয় না।

পূর্ব্বজন্মের মনোময় কোষ-গঠন জন্য যে সকল অণু পরমাণুর সংগ্রহ ছিল, এ জন্মের মনোময় কোষ সেই সকল অণু পরমাণুতে গঠিত হয় না। পূর্ব্বজন্মের প্রাণময় কোষ যে সকল কোষাণুদ্বারা গঠিত হইয়াছিল, এ জন্মের প্রাণময় কোষ নির্ম্মাণে সেই সকল কোষাণু গৃহীত হয় নাই। পূর্ব্বজন্মের পিণ্ডদেহের ও ভাণ্ডদেহের মাল-মসলা এই দেহের মাল-মসলা নহে। কেবল সেই জীবাত্মা পূর্ব্বজন্মে যিনি যে অবস্থায়, এই জন্মেও তিনি সেই অবস্থায়ই আছেন। পূর্ব্বেকার দেহের স্থূল মস্তিষ্ক যে সকল কোষাণুদ্বারা গঠিত হইয়াছিল, এ জন্মের মস্তিষ্ক গঠনে সেই সকল কোষাণু

আদৌ একটুও নাই। এ জন্মে আমাদের মনোময় দেহ, কামনাময় দেহ ও স্থূলদেহ সকল নূতন হইয়াছে। কেবলমাত্র দুই জন্মে, দুই জন্ম কেন সকল জন্মেই এক জীবাত্মা আছেন। এই জীবাত্মা প্রতি জন্মে জীব যাহা করেন, তাহাই সাক্ষী স্বরূপে দেখিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বজন্মে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় জীব যাহা করিয়াছে, তাহা ইনি দেখিয়াছেন ও জীবের স্থূলদেহ নাশ হইবার পর কামনাময় দেহে ভুবর্লোকে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন ও পরে মনোময় দেহ ধরিয়া স্বর্গে বসিয়া জীবের যে সকল কর্ম্ম হইয়াছে, তৎ সমুদয় জীবাত্মার অগোচর নাই। স্বর্গবাস-অন্তে পুনরায় যখন নূতন মনোময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও অন্নময় কোষ গ্রহণ করিয়া জীব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন সেই নবজাত মানবের জড় স্মৃতিতে মাত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্ম সকল দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহাই সংস্কাররূপে জাগরূক থাকে। জীব এই হেতু আপনা হইতেই বুঝিয়া থাকে ;—এই কর্ম্ম করিলে এইরূপ ভাল ফল হয়, এই কর্ম্ম করা ভাল, এই কর্ম্ম করা মন্দ, অতএব এইরূপ কর্ম্ম করিতে নাই।

পূর্ব্বজন্মে মানব যে সকল কার্য্য করিয়াছিল, তাহা সমুদয় জীবাত্মার স্মরণ থাকিলেও, সেই সকল কর্ম্ম হইতে মানব যে সকল জ্ঞান ও শিক্ষা-লাভ করিয়াছে, তাহাই এই বারের স্থূল দেহের স্থূল মস্তিষ্কের বোধগম্য আছে ; ইহাকেই প্রাক্তন সংস্কার বলে। এই হেতু আমরা পূর্ব্বজন্মের প্রত্যেক ঘটনা মনে আনিতে পারি না, কেবল সেই ঘটনা দ্বারা পূর্ব্ব-জন্মে যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, এজন্মে সেই জ্ঞান মাত্র আমাদের থাকে। জীবাত্মা প্রতি জন্মে এক থাকায় এই পর্য্যন্ত আমাদের হইয়া থাকে।

কোন দোকানে ক্রেতা যাহা কেনেন, তাহার দৈনিক হিসাব জাবেদা খাতায় লেখা হয়, সেই জাবেদা হইতে খতিয়ান প্রস্তুত হয়, খতিয়ানে ঐ

ব্যক্তির নামীয় হিসাবে যে দিন যাহা ইনি কিনিয়াছেন তাহার মূল্য মাত্র দৈনিক লিখিত থাকে, কোন্ জিনিষ তিনি কত কিনিয়াছেন তাহা লেখা থাকে না। পরে বৎসর-অন্তে নূতন বৎসর হইলে পূর্ব্ব বৎসরের বিক্রীত জিনিষের মূল্যের বাবত প্রতি ক্রেতার নিকট আদায় বাদে যাহা বাকী থাকে, তাহা মোট একত্র করিয়া জের বলিয়া এক দফায় ঐ ব্যক্তির নামের হিসাবে নূতন খাতায় লেখা হয়। এই জের-দৃষ্টে পূর্ব্ব বৎসর কোন্ লোক কি কি জিনিষ কিনিয়াছেন, তাহা জানা যায় না। সেইরূপ আমরা পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় ঘটনার জের মাত্র সংস্কাররূপে এই জন্মের নিয়ত স্মৃতিতে আনিতে পারি। এই জ্ঞান-সাহায্যে আমরা কোন কর্ম্ম করিতে যাইলে তাহা করা উচিত কি না, মনে বিচার করিতে পারি। পূর্ব্বজন্মে অনুরূপ কার্য্য করিয়া তাহার ফল ভাল বা মন্দ যাহা দেখিয়াছি, সেই মত এই জন্মে প্রথমেই আমরা সঙ্কল্পিত কর্ম্মের ফল ভাল না মন্দ মনে বুঝিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে চেষ্টা করি। এই জ্ঞানকে আমরা এ জন্মের হিতাহিত জ্ঞান বা conscience বলি। এ জন্মে যে সকল বিদ্যা সহজে শিখিতে পারিতেছি, তাহা পূর্ব্বজন্মের শিক্ষা করা বলিয়া মনে করি।

কোন কোন সাধক যোগবলে বহু পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে ব্যক্তি বিশেষ জগতে জন্মলাভ করিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছেন। এই শক্তি বলে দুই এক জনের বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বেকার ২৮।৩০ জন্মের বিবরণ তাঁহারা পত্রিকাদিতে প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপ বিবরণী পাঠে আমরা দেখিলাম, কোন এক জন্মে এক জনকে হস্তপদ বন্ধন করিয়া একটি পিপীলিকার স্তূপের মধ্যে ফেলিয়া রাখা হয়। সেই বুভুক্ষু পিপীলিকা সকল তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় দুই তিন দিবসের মধ্যে রক্ত-মাংসাদি খাইয়া কঙ্কালসার

করিয়া দিল, ও এই অসহ্য যাতনার সহিত তাঁহার জীবন শেষ হইল। এই ব্যক্তিটি পরবর্ত্তী দুইটি তিনটি জন্মে পিপীলিকা দেখিলেই ভয়ে সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেন। অথচ তাঁহার এই পিপীলিকা-ভীতির কারণ স্মরণে আসিত না। জীবাত্মার সেই নৃশংস হত্যা-ব্যাপার স্মরণ থাকিলেও জড় দেহের স্থূল মস্তিষ্কে এই ভয়টুকুমাত্র জেরস্বরূপে আসিয়াছিল।

ইতস্ততঃ অনুসন্ধানে পূর্ব্বজন্মের ঘটনা স্মরণ হইয়াছে এরূপ লোক দেখা যায়। বালকদের মধ্যে অনেকে পূর্ব্বজন্মের কতক কতক ঘটনা স্মরণ করিতে পারে। এ জন্মের কোন ঘটনায় পূর্ব্বজন্মের কোন ঘটনা কাহারও সহসা স্মরণ হইয়া পড়ে। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সাধুদর্শনে যাইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আসিয়া পড়ার বিষয় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাদের এক জন্মের পর অপর জন্ম অতি অল্প সময় মধ্যেই হইয়া থাকে, প্রায়ই সেইরূপ লোকের বাল্যে পূর্ব্বজন্মের কতক কতক ঘটনা স্মরণ হইয়া থাকে। অনুসন্ধানে এরূপ পূর্ব্বজন্ম স্মরণ যতগুলি স্থলে দেখা গিয়াছে, সকলেরই মৃত্যুর পর এই জন্ম অতি অল্পকাল মধ্যে হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী সাধুগণ অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছেন যে দুই হইতে পাঁচ বর্ষকাল পর্যান্ত ন্যূনপক্ষে মানবকে কামলোকে ও স্বর্গে থাকিতে হয়। মৃত্যুর পর দুই হইতে পাঁচ বৎসরকাল পরে অনেককে তাঁহারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন। তবে মৃত্যুমাত্রই পুনর্জ্জন্মও স্থল বিশেষে হইতে দেখা যায়।

আমাদের নিম্নলিখিত ঘটনা কয়েকটি হইতেও আমরা মৃত্যুর অতি অল্প সময় পরে পুনর্জ্জন্ম হওয়ার বিষয় জানিতে পারি। আমরা জগতে থাকা কালে যত বেশী বাসনাসক্ত হইয়া থাকি, আমাদের কামলোক বাস ততই অধিক কাল হইয়া থাকে। পৃথিবীতে আমরা শত চিন্তায় যত অধিককাল কাটাইব, আমাদের স্বর্গবাসের সময় ততই বাড়িয়া

যাইবে। আহারের পর যেমন হজম করিতে সময় লাগে, সেইরূপ পৃথিবীতে কৃত কর্ম্মাদিজনিত জীবের উদ্রিক্ত বাসনা ও চিন্তাদি বৃত্তি সকলকে জীবের সহিত এরূপভাবে মিলিত করিয়া দিতে হইবে যে, সেই বাসনা ও চিন্তাজনিত সংস্কার তাহাদের ভবিষ্যৎ যে সকল জন্ম হইবে সকল জন্মেই প্রকাশ পাইবে। এইরূপে জীবের সহিত তাহার বাসনাদি ও চিন্তা আদির মিশ্রণ করার কার্য্য ভুবলোকে ও স্বর্গলোকে হইয়া থাকে।

চেষ্টা করিয়াও পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আনিতে পারা যায়। ইহাতে বহুকালের দৃঢ় অধ্যবসায় চাই ও ধ্যাননিরত হওয়া চাই। ধ্যানযোগে চিত্তের চাঞ্চল্যদূর হইলে চিত্ত যখন একেবারে স্থির হয়, তখন চিত্তের সহিত জীবাত্মার বেশ যোগ বুঝা যায়, এবং এই জীবাত্মা তখন পূর্ব্বজন্মের ঘটনা মানবকে বিবৃত করে, মানব তাহা ছবির মত দেখিয়া থাকে। প্রকৃত 'আমি কে' যখন আমরা বুঝিব, যখন আমরা আমাদের স্থূলদেহ, কামদেহ ও মনোময় দেহকে 'আমি নয়' বলিয়া জানিয়া, এই দেহ সকলকে আপন বশে আনিতে শিখিব, তখনই আমরা পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে সকল ঘটনাই স্মৃতিপথে আনিতে পারিব। সকল জন্মেই যে জীবাত্মা এক, কেবল তিনিই সকল জন্মের ঘটনা দেখিয়াছেন, যে কোন জন্মে জীবের পূর্ব্বজন্মের ব্যাপার শুনাইতে তিনিই পারেন। এই জীবাত্মার সহিত যোগ করিতে পারিলে আমরা জাতিস্মর হইতে পারি।

আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম, ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন অথবা ম্যাণ্ডেলে নগরে একটি বালককে পথিমধ্যে তাহার অভিভাবক বড়ই চঞ্চল দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসায় বালক বলিল, এই সম্মুখের বাটীতে আমি পূর্ব্বজন্মে ছিলাম, এই বাটীর ভিতর আমার খেলেনা আছে, আমাকে ভিতরে লইয়া চলুন, আমি আমার খেলেনাগুলি চাই। বালককে বাটীর ভিতর লইয়া যাইলে সে আলমারির

মধ্যস্থিত কতকগুলি খেলেনা তাহার বলিয়া দাবী করিল; ও জানা গেল এইগুলি সেই বাটীর একটি শিশুর ছিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীমতী বেশান্ত লিখিয়াছেন, একটি বালক কোন নদীতে যাইলে সেই নদীতে কোন ঘাট দেখাইয়া ঐ ঘাটে সে পূর্ব্বজন্মে ডুবিয়া মরার কথা বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছিল। কে কে তাহার সঙ্গে স্নান করিতে গিয়াছিল ও কিরূপে সে ডুবিয়াছিল, এ সকল কথা বালকটি স্পষ্ট বলিতে পারিয়াছিল।

শিশিলি দ্বীপ হইতে কোন বিশ্বস্ত লোক এই সংবাদ থিয়জফিষ্ট পত্রে প্রকাশ করেন। আমরা এই সংগ্রহ মধ্যে তাহার অবিকল অনুবাদ দিলাম।

একজন টিনের কর্ম্মচারী গত কল্য আমার কেরাণীর নিকট আসিয়াছিল। লোকটি পালার্মো (Palarmo) হইতে কয়েক মাইল দূরে বাস করে। সে আসিয়া বলে, আমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে একটু বিশ্রামের স্থান দিন। তাহাকে বসিতে দেওয়া হইল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর আমার কেরাণীর মাতার সহিত বাক্যালাপ করিতে থাকে। সে বলিল, দেখুন আমার নিজের কর্ম্মের দোষে আমার কিরূপ অবস্থা হইয়াছে, আমার গত জন্মে আমি একজন বাদসা ছিলাম, ৪০ বৎসর আমি রাজত্ব করি, পরে আমার কর্ম্মের দোষে আমাকে হত্যা করে, এবং শেষে এই অবস্থায় আমি জন্ম পাইয়াছি। আপনি মনে করিবেন আমি পাগল, কিন্তু আমি পাগল নহি; আমি গত জন্মের পূর্ব্বেকার জন্মও বেশ মনে করিয়া বলিতে পারি। আমি পূর্ব্বেকার আর চারি জন্ম সম্বন্ধে বলিতে পারি। এই জন্ম আমার পঞ্চম জন্ম, যাহার সংবাদ আমার বেশ মনে রহিয়াছে। আমার দেহকে আমি পুরাতন কাপড়ের মত মনে করি, ছিঁড়িয়া গেলে যেমন

পুরাতন কাপড় লোকে ফেলিয়া দেয়, আমিও এই দেহ সেই রূপে ফেলিয়া দিব। ধর্ম্মযাজকেরা আত্মার অমরত্ব শিক্ষাদেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে আত্মা উপরে যায় ও নামিয়া আসে। তাঁহারা জানেন না যে আত্মা পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে আসিয়া থাকে। সেদিন আমি তিনটি দুষ্ট বালকের চক্রান্তে পড়িয়া পথ ভুলিয়া যাই। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাদের ২৫ লাইয়ার মুদ্রা দিলাম। এই টাকা আমি বাটীতে আনিতে ছিলাম, পক্ষাঘাতগ্রস্ত আমার সন্তানকে খাওয়াইবার জন্য। কিন্তু মজা দেখুন, একজন প্রতিবেশী একটি মুরগী মারিয়াছিল, সে কতকটা মাংস ও খানিক ঝোল আমার ছেলেকে দিয়া গেল। এই রূপে আমার ঐ টাকা যাওয়াতে অভাব হইল না, কিন্তু দুষ্ট ছেলে-গুলিকে ঈশ্বরের নিকট হিসাব বুঝিয়া দিতে হইবে, তাহাদের মন্দ কর্ম্ম জমা রহিয়া গেল।

যে কেরাণীটির নিকট এই টিনমিস্ত্রি আসিয়াছিল, তিনি একজন থিয়জফিষ্ট, তিনি সেই লোকটিকে ডাকিয়া এক দিন সভ্যগণের নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টায় আছেন।*

আদিয়ার হইতে প্রকাশিত Young Citizen নামক পত্রে একটি বালকের কথা প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম। বালকটির বয়স ছয় বর্ষ মাত্র। তাহার সমুদয় নাম প্রকাশ নাই, তাহাকে "হ" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

হ বলিতেছে "মায়ি, তুমি কি কথনও জলে ডুবিয়া গিয়া ছিলে? আমি একবার ডুবিয়াছিলাম।

মাতা। হ! সত্য বলিতেছ? তুমি কবে ডুবিয়াছিলে?

---

* Theosophist, October 1910.

হ। মাম্মি, তোমার নিকট আসিবার পূর্ব্বে। ও ইহা কি ভয়ানক ব্যাপার!

মাতা। তুমি কি নদীতে ডুবিয়াছিলে?

হ। না, আমি সে সময়ে একটি শিশু মাত্র ছিলাম। সমুদ্রে জাহাজের উপর ছিলাম। আমি জাহাজ হইতে সমুদ্রে পড়িয়া যাই।

মাতা। হ! তুমি বোধ হয় জান, যে ডুবিয়া যাইলে মানুষ মরিয়া যায়।

হ। হাঁ, আমি বেশ জানি। আমি ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছিলাম, এবং মরিয়া আমি স্বর্গে গিয়াছিলাম। পরে আবার আমি তোমার নিকট আসিয়াছি।

(এই কথা বলিয়াই ছেলেটি মাতার নিকট হইতে বাহিরে খেলিতে ছুটিয়া গেল) ফিরিয়া আসিয়া—

হ। মাম্মি, শত বৎসর পূর্ব্বে যখন তুমি ও আমি দুই জনেই স্বর্গে ছিলাম, তখন কে বড় ছিল, তুমি না আমি?

চা খাইতে খাইতে ;—

হ। মা, গ্রানির পুনরায় স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিবার কি সময় হয় না? বোধ হয় হইয়াছে?

(গ্রানি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মৃত হইয়াছে।)

মাতা। না বাছা। তাহার এখনও যথেষ্ট বিশ্রাম করা হয় নাই।

হ। যখন আমরা স্বর্গে যাই, তাহার কিছু পরেই আমরা ক্ষুদ্র শিশু হইয়া পড়ি, এবং পুনরায় নামিয়া আসিয়া জন্ম গ্রহণ করি।

পঞ্চম ভাগ। ভাদ্র ১৩২০। দ্বিতীয় সংখ্যা।

অলৌকিক রহস্য

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদিত।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বিএ, বিএল্,

সহকারি-সম্পাদক।

বার্ষিক মূল্য ১।০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

সূচী।

অলৌকিক রহস্যের নিয়মাবলী

১। "অলৌকিক রহস্য" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলাদি সমেত সহর, মফঃস্বল সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র; ভিঃ পিঃতে পাঠাইতে ⁄০ এক আনা অধিক লাগে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ তিন আনা।

৩। কেবল ৶১০ সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা একখণ্ড প্রেরিত হইবে।

৪। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পর-সংখ্যা-প্রকাশের পূর্ব্বে না জানাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনরায় পাঠাইতে দায়ী থাকিব না।

৫। কেহ যদ্যপি পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া রিপ্লাই পোষ্টকার্ড লিখিবেন।

৬। "অলৌকিক রহস্য"-সম্বন্ধীয় চিঠি-পত্র, টাকা-পয়সা আমার নামে এবং প্রবন্ধাদি বিনিময়ার্থ পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ইউনিভার্শেল লাইব্রেরী,
৫৬।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্,

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—পুনরাগমন সামাজিক উপন্যাস যাহা ধারাবাহিক 'অলৌকিক রহস্যে' বাহির হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

অলৌকিক রহস্য।

৫ম বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩২০। [২য় সংখ্যা।

নরকোৎসব।

অষ্টম উল্লাস।

উষা।

কর্পূর-কুন্দ-ধবল-জ্যোৎস্না-পুলকিতা যামিনীতে আমি ও উষা ছাদের উপর বেড়াইতেছিলাম। কথায় কথায় উষা বলিল,—"তুমি দিন দিন এত ম্লান হইয়া যাইতেছ কেন?"

আমি সহসা সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন উত্তর পাইল না, তখন উষা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কোন অসুখ হয় নাই ত?"

আমি। না, না,—কোন অসুখ হয় নাই।

উষা। তবে দিন দিন শরীর অমন কালী হইয়া যাইতেছে কেন? আয়না ধরিয়া দেখিয়ো—শরীরে আর কিছু নাই। এমন কেন হ'লে?

আমি। এমন কেন হইলাম, তাহা বলিতে পারি না উষা;—বোধ হয় আমাকে ভূতে পাইয়াছে।

উষার রক্তাধারে হাসি ফুটিল। সে হাসি বৃষ্টির পরে মন্দ বিদ্যুতের সহিত উপমেয়। বলিল,—"ভূতেই পাইয়াছে বটে, নতুবা মানুষের যাহা করিতে নাই, তুমি তাহা করিবে কেন?"

আমি। আমি কি করিতেছি?

উষার হাসির ধারে অশ্রু আসিল। বর্ষণলঘু মেঘ বিদ্যুতের পরে আবার কয়েকবিন্দু জল ঢালিয়া দিল। আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিল,—"তুমি ভদ্র সন্তান,—সুশিক্ষিত,—হায়, তুমি মদ্যপ।"

আমি। অনেক উচ্চ শিক্ষিতে মদ খায়।

উষা। যারা খায়, তারা বুঝি তোমারই মত অনুতাপ-তপ্ত। তুমি পারদারিক।

আমার বড় রাগ হইল। ছোট মুখে বড় কথা! ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলাম,—"উষা, একটা কথা বলিব।"

উষা। বল।

আমি। তুমি স্ত্রী, আমি স্বামী—

উষা। হিন্দুর মেয়ে সে সম্বন্ধ উত্তমরূপেই বুঝিয়া রাখে।

আমি। আমার উপরে তোমার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই।

উষা। আছে না আছে, জানি না। তুমি আমায় শিখাও নাই। শিখাইবার অবকাশ পাও নাই বলিয়া হয়ত শিখাও নাই। বিবাহ হইতেই দিদিকে ভাল বাসিয়াছ,—দিদিকে লইয়া পাগল হইয়াছ,—অভাগী উষার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহ নাই,—উপদেশ দিবে কবে? কিন্তু হিন্দুর মেয়ে আপনি বুঝিয়া লইতে পারে, স্বামি-দেবতা সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। হিন্দুর মেয়ে জানে, সে দেবতার সেবা করিতে হয়—নিত্য ধুইয়া মুছিয়া ভোগ-রাগ দিতে হয়—আঁচলে বাতাস করিতে হয়। দেবতাকে সিংহাসনে তুলিয়া রাখিতে হয়। গায়ে ময়লা জন্মিলে ঘসিয়া মাজিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। আমি হতভাগী—আমারই জন্ম-জন্মের কৃত মহাপাতকের ফলে আমার দেবতার প্রাণে ময়লা জন্মিয়াছে, বড় ইচ্ছা করে, প্রাণের বিনিময়ে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিই। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র—আমার শক্তি ক্ষুদ্র—সাধনা ক্ষুদ্র। পারি না,—শক্তিতে কুলায় না, তাই কাঁদিয়া মরি।

আমি অধিকতর বিরক্ত হইলাম। উষার মুখে অত কথা শুনিতে আমার ভাল লাগে না। আমার ইচ্ছা, সে নীরবে আমার সেবা করিবে,—নীরবে আমার আজ্ঞা পালন করিবে। আমার কথায় বা কার্য্যে সে বাদ-প্রতিবাদ করিতে পাইবে না। তাহাতে তাহার অধিকার কি?

উষা কিন্তু ছাড়িল না। সে হঠাৎ আমার পায়ের তলে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে আমার দুই পা জড়াইয়া ধরিল। দুই চক্ষুর জলে আমার দুই পা ভাসাইয়া তুলিল। আমি অধিকতর বিরক্ত হইলাম। বলিলাম, "জ্বালিয়ে মার্‌লে, বল না ছাই—তোমার কথা কি!"

কাঁদিতে কাঁদিতে—ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে উষা বলিল—"আমার কথা আর কিছু নয়, একটি প্রার্থনা—তুমি কেমন হইয়া যাইতেছ। মদে তোমার চিত্ত-বিকৃতি উপস্থিত হইয়াছে, তোমার গায়ের রঙে কালী ঢালিয়া দিয়াছে, কপালের শিরা বাহির হইয়া পড়িয়াছে—আহার কমিয়া গিয়াছে—তুমি ও সকল কাজ আর করিয়ো না। লোকেও বড় নিন্দা করিতেছে।"

আমি গম্ভীর ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলাম—"তোমার কাছে আমি উপদেশ চাহি না। সন্ধ্যাকে পরিত্যাগ করিলে, আমার গুষ্টিশুদ্ধ অন্নাভাবে শুকাইয়া মরিবে।"

ধাঁ করিয়া পা ছাড়িয়া দিয়া উষা উঠিয়া দাঁড়াইল। ম্লান অথচ রক্ত-রাগ-রঞ্জিত মুখখানা ঈষদুত্তোলন করিয়া স্থির নয়নের স্থির অচঞ্চল উদাস দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে মুখখানা তখন যেন কেমন উদাস-উত্তেজনা, বোধন-বিসর্জ্জনের অপূর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ দেখাইতেছিল;—যেন অস্তগামী সূর্য্যের একটু ক্ষীণ হেম-কিরণ নবগতা সন্ধ্যার আবিল অন্ধকারে মিশিয়া নদীর স্বচ্ছনীল জলে একত্রে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উষা গলা ঝাড়িল।

তথাপি কিন্তু তাহার গলার স্বর সাফ হইল না। রুদ্ধ স্বরে বলিল,—"কেন? শুকাইয়া মরিবে কেন? আমার স্বামী কি মূর্খ? কত মূর্খ-স্বামীর স্ত্রী আত্মীয় পরিজন লইয়া সুখে দিন কাটাইতেছে, আর আমরা ভাত পাইব না! সন্ধ্যার টাকায় আমাদের প্রয়োজন কি?"

আমি। লেখাপড়া জানিলেই আজকাল চাকুরী হয় না। বিশেষতঃ অত টাকা কোথা হইতে আসিবে?

উষা। অত টাকায় আমাদের প্রয়োজন নাই। না হয়, এক বেলা খাইব। শান্তির একমুঠা ভাতও ভাল। পুণ্যের উপবাসেও গায়ের রক্ত বৃদ্ধি পায়। পাপের অতুল ঐশ্বর্য্যও রৌরবের বিপুল বাঁধন!

রৌরব! নরক!—আমার প্রাণের মধ্যে কেমন যেন একটা রক্ত-বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। আমি উষার সহিত আর কথা কহিলাম না। সেস্থান হইতে দ্রুতপদে নীচে নামিলাম এবং একেবারে রাস্তায় বাহির হইয়া সন্ধ্যার বাড়ী অভিমুখে চলিয়া গেলাম।

নবম উল্লাস।

নিশ্বাস।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। অনেক কথা ভুল হইয়া যাইতেছে,—ঠিক্ গুছাইয়া বলিতে পারিতেছি না। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, সেই সকল অতীত কথা—সেই সকল লজ্জার কথা—পাপের কথা—আত্মকৃত দুষ্কৃতির কথা বলিতে আমার লজ্জা হইতেছে—তাই কষ্ট হইতেছে, তাহা নহে। এমন শত জন্মের কথা—শত জন্মের আত্ম-কৃতকর্ম্মের কথা—আত্মীয়-স্বজনের কথা, আমার এখন মনে পড়িতেছে। এখন কিছুতেই মায়া নাই, লজ্জা নাই,—আছে কর্ম্মের

সংস্কার, আর সংস্কারের জ্বালা। আমার কষ্ট হইতেছে অন্য কারণে—সে কারণ তোমরা বুঝিবে না।

আমি যে কথা বলিতে ভুলিয়াছি, তাহার মধ্যে একটা কথা না বলিলে, আমার আর সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে তোমাদের একটু গোল হইতে পারে।

সন্ধ্যার সহিত মিলনও কার্ত্তিক ঠাকুরদার পরলোক প্রাপ্তির পর প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে,—ইহার মধ্যে সন্ধ্যাকে তাহার পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন অনেক বুঝাইয়াছিল, অনেক শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু সে নিবৃত্ত হয় নাই। তারপর তাহার আত্মীয়-স্বজন—তাহার পিতামাতা তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের বাড়ী যাইবার অধিকারও তাহার ছিল না।

আমি যখন সন্ধ্যার বাড়ী উপস্থিত হইলাম, তখন সে কুসুম-ভূষণে ভূষিতা হইয়া, তাহার আনিতম্ববিলম্বিত সুগন্ধিম্রক্ষিত চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া একখানা শোফার উপরে শুইয়াছিল। উপরে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল—নিম্নে রূপের আলোক উথলিয়া উঠিতেছিল। তোমরা বলিবে—বিধবার এত বাসন কেন? কিন্তু বুঝিলে না,—সে যে পাপের পথে পা দিয়াছে। যে একপ্রকার পাপ করে, শতপ্রকার মহাপাতক আসিয়া তাহার সমস্ত আত্মিক অঙ্গে চাপিয়া বসে। দেহের এক স্থানে খোস হইলে, সর্ব্বাঙ্গে না হইয়া যায় না। এক কলসী দুগ্ধের এক স্থানে বিন্দুপরিমাণে অম্লরস প্রদান করিলে সবখানি দুধ জমিয়া অম্ল হইয়া যায়।

আমি উপস্থিত হইলে সন্ধ্যা কথা কহিল না। বুঝিলাম সে কোন বিষয়ে চিন্তা করিতেছে! আমারও মনটা তখন ভাল ছিল না। তেমন বুঝি আদরে সোহাগে কথা কহিতে পারিলাম না। আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তারপরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সন্ধ্যা, চুপ করিয়া রহিলে কেন? কথা কহিতেছ না কেন?"

সন্ধ্যা সোফার উপরে একটু উঁচু হইয়া উঠিয়া বলিল,—"কাহার সহিত কথা কহিব ? তোমার সহিত ? তুমি আমার কে ? ভগিনী-পতি। কিন্তু ভুল করিয়াছিলাম,—তোমাকে জীবন-সর্ব্বস্ব ভাবিয়াছিলাম ! ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জীবন-যৌবন সব দিয়াছিলাম। আর—আর ; মহা-পাপ করিয়াছি,—তোমার প্ররোচনায়—দুর্দ্দমনীয় রিপুর প্ররোচনায় যাহা করিতে নাই, তাহাও করিয়াছি। স্বামিহত্যার সাহায্য করিয়াছি। তারপর সমস্ত বিষয়-আশয় তোমাকে লিখিয়া দিয়া এখন তোমার করুণাভিখারিণী হইয়াছি। কাজেই এখন তুমি আমাকে পায়ে ঠেলিবে বৈ কি !"

আমি। কেন ও সকল কথা সন্ধ্যা ? আমি কি কোন দিন তোমাকে অযত্ন করিয়াছি ?

সন্ধ্যা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—"তোমার আদর আমি চাহি না। মনে তোমার ঊষা—শুধু মুখের কথায় আমাকে ভুলাইয়া রাখা।"

আমি বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলাম। বলিলাম,—"তবে কি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বল ?"

সন্ধ্যা। কেন বলিব ? আমি কিন্তু তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি—তোমাকে সব দিয়াছি।

আমি। যদি বল—তাহাতেও প্রস্তুত আছি।

সন্ধ্যা। মিছে কথা।

আমি। না সন্ধ্যা,—সত্য বলিতেছি।

সন্ধ্যা। যদি সত্য বলিয়া থাক,—তবে আর তাহার নিকটে যাইতে পারিবে না।

আমি। তাহাদের গতি ?

সন্ধ্যা। টাকা পাঠাইয়া দিয়ো।

আমি। ঊষা তোমার ছোট ভগিনী।

সন্ধ্যা। যে রিপুর পদতলে স্বামীর কণ্ঠ-রক্ত নিবেদন করিতে পারে, কুবেরের ভাণ্ডার উৎসর্গ করিতে পারে, জাতি-কুল ইহ-পরকাল বলি দিতে পারে—তার কাছে ছোট ভগিনী! যাও তুমি তার কাছে—আর আসিয়ো না। আমার সর্ব্বস্ব লইয়া যাও—আর আসিয়ো না। আমি পথের ভিখারিণী হইয়াছি—সমাজে ঘৃণিতা কলঙ্কিনী হইয়াছি,—নিজের মনের নিকটেও বুঝি অবিশ্বাসিনী হইয়াছি আমি আমার কাজের প্রতি-ফল ভোগ করিতে থাকি।

আমি কি উত্তর করিব, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার অদূরে একখানা চৌকী ছিল, তাহাতে বসিয়া পড়িলাম। একটা ভৃত্যকে ডাকিয়া মদের বোতল আনিতে বলিলাম। সন্ধ্যা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্তি-ভাবে নিষেধ করিল,—ভৃত্যটা ভয় পাইয়া বোতল না আনিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। তখন আমি নিজে গিয়া বোতল আনিলাম এবং গ্লাসে মদ ঢালিয়া সন্ধ্যাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সন্ধ্যা খুব মদ খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু সেদিন কিছুতেই খাইল না। তখন বিরক্ত হইয়া আমি অনেকখানি মদ্য উদরস্থ করিলাম। মাথা টলিতে লাগিল। হঠাৎ বমন হইল। দেখিলাম—সেই বমনের পদার্থ আর কিছুই নহে—রক্ত! রক্ত বমন কেন হইল? ভীত-চকিত নেত্রে সন্ধ্যার দিকে চাহিলাম।

উঃ! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সে দৃশ্যের কথা মনে হইলে এখনও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। সন্ধ্যার ঠিক্ পশ্চাদ্ভাগে কার্ত্তিক ঠাকুরদা রক্তাক্ত ছোরা হাতে করিয়া, তাহার প্রেত-কঙ্কাল বাহু বিস্তৃত ও আন্দোলিত করত যেন আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার কোটরগত চক্ষুর চাহনি কি ভীষণ! মৃত্যুগন্ধী নিশ্বাস আসিয়া আমার বক্ষস্থলে অগ্নিবাণ বর্ষণ করিল—আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সত্য ঘটনা।

আমার সহকারী কর্ম্মচারী 'য' বাবুর স্ত্রী একটী আকস্মিক ঘটনায় মারা যান। ঘরের মধ্যেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। আমার ও তাঁহার বাসাবাটী খুব কাছাকাছি। এই ঘটনার পর হইতে 'য' বাবু বাসাটী পরিত্যাগ করিয়া আপিস ঘরেই বাস করিতেন। কয়েকদিন তাঁহার স্ত্রীকে তিনি স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন শুনিয়াছিলাম। তিনি তদবধি প্রায়ই একা শয়ন করিতেন না। তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর কয়েকদিবস পরে কেহ কেহ তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া কাণাকাণি হইতে লাগিল, কিন্তু এ বিষয়ে অকাট্য কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ কিছু পাওয়া গেল না। মোণ্ডা নামে একটী স্ত্রীলোক প্রত্যহ আমাদের দুধ যোগান দিত। একদিন ঠিক্ দুপুর বেলা মোণ্ডা দুধওয়ালী দুধ রাখিয়া তাহার কি কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্ব কথিত ছাড়া বাসাটীর ভিতরে ঢুকিয়াছিল। বাসাটী প্রাচীর ঘেরা ছিল। আমার স্ত্রী তখন আমাদের বাসাবাটীতে রান্না ঘরের বারান্দায় বসিয়াছিল।

হঠাৎ মোণ্ডা "ও আল্লা আমার কি হবে' 'ও আল্লা আমার কি হবে" বলিতে বলিতে আমাদের বাড়ীর ভিতরে দৌড়ে আসিল, আর তাহার পরিধানের কাপড় চোপড়ে ঝর্ ঝর্ করিয়া প্রস্রাব করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। ক্ষণকাল মোণ্ডা নীরব। আমার স্ত্রী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মোণ্ডা বলিতে লাগিল—"মা, ছোটলোকের কথায় তোমরা বিশ্বেস করবা না, দোহাই আল্লার, আমি এইমাত্র "—" বাবুর স্ত্রীকে তাহাকে ঘরের মেজাতে দেখে এলাম—পা ছড়ায়ে দিয়ে ব'সে চুল ঝাড়ছে।"

মোণ্ডার তাৎকালিক আচরণে ও কথাবর্ত্তায় তাহাকে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ ছিল না। তাহার ন্যায় নীচ স্ত্রীলোকে বড় ঘরের একটী গুপ্ত কথা, রচনা করিয়া বলিবে ইহাও সম্ভব বলিয়া কেহ মনে করিতে পারে নাই।

শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত।

কর্ম্মানুসারে জীবের গতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এ জীবনে আমরা যেমন কর্ম্ম ও চিন্তা করিব, মৃত্যুর পর আমরা ঠিক্ তেমন দশা পাইব। যখনই আমরা ভালমন্দ যাহা কিছু কর্ম্ম করি, তখনই আমাদের ভাবা উচিত যে,—

"ইহ যৎক্রিয়তে কর্ম্ম তৎপরত্রোপভুজ্যতে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং ব্রহ্মন্ ফলভূমিরসৌ মতা॥" মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২৬১।৩৫

অর্থাৎ—এই পৃথিবী কর্ম্মভূমি মাত্র, ইহলোকে যে কর্ম্মকরা যায় পরলোকে তাহার ফল-ভোগ হয়।

ইহলোকের সঙ্গে পরলোকের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। যে সকল মহাত্মগণের দিব্যদৃষ্টি ছিল, তাঁহারা পরলোকের বিষয় এই পৃথিবীতে থাকিয়াও জানিতে পারিয়াছিলেন। শাস্ত্রে পরলোকের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কাহারও কল্পনার ফল নহে; অন্তর্দ্দর্শী যোগিগণের দিব্যদৃষ্টির অভ্রান্ত ফল। এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জ্ঞানের উচ্চশিখরে উঠিয়া হিন্দুশাস্ত্রের পরলোকতত্ত্ব কিছু কিছু যাহা বুঝিতে পারিতেছেন, তাহাতেই তাঁহারা বিস্মিত হইতেছেন। বিদুষী আনিবেশান্ত হিন্দুশাস্ত্রেরই তত্ত্ব লইয়া ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ লিখিতেছেন, এবং হিন্দুগণ তাহাই আদর করিয়া পড়িতেছে ও বিশ্বাস করিয়া বলিতেছে—"আমাদের শাস্ত্রে এইটুকু সত্য আছে বটে।" আনিবেশান্ত যেটুকু ধরিতে পারিয়াছেন, যেটুকু সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, শিক্ষিত হিন্দুগণ তাহাতেই কৃতার্থ। আমরা এই জ্ঞানচক্ষুদাত্রী বিদুষী বেশান্তকে এই মহৎ

উপকারের জন্ম অন্তরের সহিত শত শত ধন্যবাদ দিই। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব না দেখাইয়া দিলে নাস্তিক শিক্ষিতগণের কবে চৈতন্য হইত, জানি না।

মানুষের বাল্য ও যৌবনকালের কর্ম্মের উপর যেমন তাহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, ইহকালের কর্ম্মের উপরও সেইরূপ পরকালের অবস্থা নির্ভর করে বাল্যে ও যৌবনে বিধি ও নিষেধ শুনিয়া ভাল কাজ করিয়া যাইলে পরে ভাল হয়। জ্ঞানী, মানী ও বিদ্যাদ্বারা ধনী হইতে হইলে, বাল্যকাল হইতে নিয়মমত বিদ্যার সাধনা ও চরিত্রের গঠন করিতে হয়। সেইরূপ, মানুষের ইহকালের কার্য্যের মত পরকালের কার্য্য হইবে। এই জীবনে নিয়ম জানিয়া ভাল কাজ করিলে এবং কর্ত্তব্য করিয়া যাইলে পরজন্মে নিশ্চয়ই সুখী হইতে পারা যায়।

আসক্তি যখন প্রবলা হয়, তখন মৃত্যু হইলে, মৃত্যুর পরের অবস্থা আসক্তি অনুযায়ী হয়। যে বাসনা পূর্ণ হয় নাই, সে বাসনা পূর্ণ হইবার উপায় দেখে। আসক্তিই জন্মান্তর-গ্রহণের কারণ।

আবার এই আসক্তির আশ্চর্য্য এক ফল আছে। পুরাণে আছে, মৃত্যুকালে যাহার বিষয় চিন্তা করা যায়, মৃত্যুর পর সেই চিন্তার মত গতি হয়। "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, মানুষ মৃত্যুকালে যাহা স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সেইমত দেহ-লাভ করে।

এখানে আমরা পুরাণের ভরতরাজার উপাখ্যানটী বলিয়া পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করিব।

সংসারবিরাগী রাজা ভরত বৃদ্ধবয়সে বনে বাস করিয়া ভগবানের নাম জপ করিয়া মায়াপাশ কাটাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি নিয়মমত ধ্যান, ধারণা, পূজা, জপ তপ করিতেন। সংসারে স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া আসিয়াছেন বলিয়া মনকে তাহাদের কথা ভাবিতে অবসর দিতেন না।

তিনি আর মায়ার বেড়ী পায়ে দিবেন না। এখন তিনি বানপ্রস্থ আশ্রমের লোক। সংসারের ভোগ শেষ হইয়াছে। প্রবৃত্তির খেলা হইয়া গিয়াছে। এখন নিবৃত্তির উদয় হইতেছে। তিনি সর্ব্বদাই ঈশ্বর চিন্তা করেন। মনে আর কোন মূর্ত্তি নাই, ক্ষণিকের জন্য সংসারের দুই একখানা প্রিয়মুখ মনে আসিলেই, বিষ্ণু স্মরণ করিয়া তিনি শুদ্ধ হয়েন ও ইষ্টদেবের শান্তিপ্রদ মূর্ত্তি হৃদয়ে ভাসাইয়া তুলেন।

একদিন রাজা নদীতে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্নান করিতেছিলেন এমন সময়ে দেখিলেন একটি পূর্ণগর্ভা হরিণী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া প্রাণভয়ে একলম্ফে ক্ষুদ্র নদীর একপার হইতে অপর পারে পড়িল, এবং অত্যন্ত ভয়হেতু গর্ভস্রাব হইয়া পথিমধ্যে রাজার সম্মুখে জলের মধ্যে হরিণ-শিশু পড়িয়াই জলে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় হতবুদ্ধি হইয়া রাজা তাড়াতাড়ি নবজাত হরিণ-শাবককে জল হইতে উদ্ধার করিলেন এবং তাহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া, জীবনরক্ষা করিবার জন্য তাহাকে আহার দিতে কুটীরে লইয়া গেলেন। অত্যন্ত শিশু বলিয়া রাজা ভাবিলেন, এ অবস্থায় ইহাকে ত্যাগ করা আর হত্যা করা সমান; একটু বড় হইলে ও আপনি চলিতে শিখিলে, হরিণ-শাবককে আর প্রতিপালন করিব না এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাজা সযতনে হরিণশিশুর প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। রাজা এখন আর পূর্ব্বের মত স্নানে আসিয়া ধ্যান ধারণা, একমনে করিতে পারেন না। সব কাজের মধ্যে হরিণশিশুর কথা ভাবেন। স্নান করিতে যাইবার সময় হরিণশিশুকে সাবধানে গৃহমধ্যে রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া যান ভয়,—পাছে বন্যজন্তুরা তাহাকে মারিয়া ফেলে; এবং পূর্ব্বে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিতে যে সময় অতিবাহিত করিতেন এখন আর তাহা চলে না, হরিণশাবকের জন্য একটু শীঘ্র শীঘ্র স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

এদিকে ঋষিকল্প রাজার যত্নে হরিণশিশু দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

ক্রমে সে এত বড় হইল যে আর তাহার জন্য রাজার বিশেষ ভাবনা রহিল না। এখন সে স্নান করিবার সময় রাজার সঙ্গে সঙ্গে নদীতে যায়, পূজার সময় কুটীরের চারিধারে ছুটিয়া খেলা করিয়া বেড়ায় এবং কখন বা ধ্যান-মগ্ন রাজার গাত্রে আসিয়া মুখ ঘর্ষণ করে ও তাহাতে রাজার ধ্যান ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু রাজার ইহাতে রাগ হইত না। কারণ তাহার প্রতি রাজার তখন এত মায়া পড়িয়াছিল যে সন্তান হইতে সে বড় একটা বেশী পৃথক্ ছিল না। হরিণশিশু রাজার মনটা বেশ দখল করিয়া বসিয়াছিল। যে রাজা সংসার হইতে স্ত্রী পুত্রের মায়া কাটাইয়া বনে আসিয়া নিশ্চিন্তে আপনার মনুষ্যত্বের উন্নতি করিতেছিলেন, সে রাজা আবার মায়ার পাশে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। হরিণশিশুকে না দেখিলে রাজার মন স্থির হয় না। যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য হরিণটি অন্যত্র যাইত, রাজা না দেখিতে পাইয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেন। রাজা হরিণকে বড়ই ভাল বাসিতেন।

এইরূপে রাজার বনে আসিয়াও সংসারীর মত মায়ার খেলা চলিতে লাগিল। হঠাৎ এক দিবস হরিণটী দূর বনে গিয়া বনের হরিণদলের সহিত মিশিয়া রাজার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল, আর সে ফিরিয়া আসিল না। রাজা হরিণের শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। হরিণের চিন্তায় তিনি আর কিছু চিন্তা করিতে অবসর পাইতেন না। ক্রমে রাজার দেহ ও মন খারাপ হওয়াতে তাঁহার মৃত্যুর দিন সন্নিকট হইতে লাগিল। রাজা মৃত্যুকালে "হরিণ, হরিণ" করিয়া হরিণের চিন্তায় দেহ-ত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুর সময় যে চিন্তাটী প্রবল হয়, মানবের গতি সেই অনুযায়ী হয় বলিয়া রাজা হরিণযোনি প্রাপ্ত হইলেন। হরিণ হইয়া রাজা আবার পৃথিবীতে জন্মিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন ধরিয়া তিনি যে হরিণ হইয়াছেন, বুঝিতে পারিলেন না। রাজার তপস্যা ও সাধনা ছিল বলিয়া শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে পূর্ব্বজন্মে যখন তিনি রাজা ভরত ছিলেন,

তখন এক হরিণশাবকের প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত হন, তাহার প্রতি স্নেহে তাহার মায়ায় বদ্ধ হন, সেইজন্য এই জন্মে হরিণের দেহ লইয়া বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ও হরিণের মত ঘাস লতাদি খাইতে স্বভাবতঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

তখন রাজার চৈতন্য হইল। তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন। তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন "হায়! মনুষ্য জন্ম পাইয়া কত সাধনা করিয়াছিলাম, শেষে তুচ্ছ একটা হরিণশাবকের মায়ায় সব হারাইলাম। কেন মায়ার গণ্ডীতে আবার পড়িলাম?" রাজা হরিণ হইয়া সর্ব্বদাই চক্ষের জলে পৃথিবী ভাসাইয়া বলেন, "আজ আমার এ কি দশা? হরিণের শোকে আমি জগৎ হরিণময় দেখিয়াছিলাম বলিয়া আমার এই অদ্ভুত জন্মান্তর। ধিক্ আমায়, মানুষ হইতে হরিণ হইলাম, ইহা অপেক্ষা অধঃপতনের ও দুঃখের বিষয় আর কি আছে?" রাজা এইরূপ অনুতাপ করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান। তিনি কেবলই ভাবেন "কে আমায় হরিণের গর্ভে জন্ম লইতে বাধ্য করিল? কই, আমিত কখন বলি নাই যে আমি হরিণ হইতে চাহি! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইরূপ কষ্ট কে আমায় দিল?"

হরিণের দেহ রাজার আর ভাল লাগে না। তিনি জ্ঞানীর মত ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে স্বেচ্ছায় এক শিকারীর হস্তে নিজ হরিণের দেহ বিসর্জ্জন দিয়া হরিণজন্ম হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন এবং আপন কার্য্যগুণে উৎকৃষ্ট মনুষ্যজন্ম পাইলেন। তাঁহার সাধনায় তাঁহার এই জন্মের পূর্ব্ব দুই জন্মের কথা বেশ মনে ছিল। সুতরাং তিনি শিশু অবস্থা হইতেই আর মায়ার বন্ধনে পড়িবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত যখন সকল বালক কথা কহিতে শিখে, রাজা ভরত ইচ্ছা করিয়া কথা কহিলেন না। তাঁহার মা কত চেষ্টা করিল, অপর সকলে কত প্রলোভন দেখাইল, ভরত কিছুতেই কথা

কহিলেন না। শেষে তাঁহার জননী একদিন কাতরভাবে ভরতকে একবার "মা" বলিতে বলিল। ভরত স্থির; এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল "এ জনমে ভগবান্ ছাড়া আর কিছু চাই না, 'মা' বলিয়া আর মায়ার গণ্ডীতে পড়িব না।"

ক্রমে ৮।১০ বৎসর বয়স হইলেও যখন ভরত নির্ব্বাক্ থাকিলেন, তখন সকলে দুঃখ করিয়া বলিল "সন্তানটী জড়—হাবা, কথা কহিতে কখনও পারিবে না।" জড়ভরত কিন্তু ভক্তশ্রেষ্ঠ, মায়ার হাত ছাড়াইয়া গিয়াছেন। ক্রমে এই জন্মেই জড়ভরত আন্তরিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

জড়ভরতের এই উপাখ্যানটী বড় সুন্দর এবং ইহাতে শিখিবার ও ভাবিবার অনেক জিনিষ আছে। রাজার হরিণচিন্তায় হরিণজন্ম লইতে হইয়াছিল। কিন্তু কিরূপে রাজা হরিণ হইলেন এবং কেনই বা হইলেন? এই প্রশ্নটীর উত্তরে, আমাদের হিন্দুশাস্ত্র বলিতেছেন, মানুষের আসক্তিই তাহাকে টানিয়া মৃত্যুর পর লইয়া যায়; পরে কিছুকাল অজানা অচেনা দেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাসনার অনুযায়ী ও চিন্তার মত একটী দেহ লইতে মানুষকে বাধ্য করে। মানুষ জানে না, তাহার বাসনাই, আসক্তিই, তাহার জন্মান্তরের দেহ বাছিয়া দেয়। মানুষ যাহা সর্ব্বদা ভাবে, মনে সেই ভাবনার ছায়া থাকিয়া যায়। পরে, দেহত্যাগকালে যাহা ভাবিতে ভাবিতে এ পৃথিবী ছাড়িয়া যায়, তাহাই তাহার মনে তখন গাঁথিয়া যায় ও মৃত্যুর পর সেইটীই প্রবল হইয়া সূক্ষ্ম শরীরধারী আত্মার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায় ও মৃত্যুকালীন সেই চিন্তা পূরণের জন্য অস্থির হইয়া পড়ে।

প্রেতলোকেও আসক্তির পূরণ চেষ্টা দেখা যায়। শাস্ত্রে ইহার বিচার আছে। আমরা ভূতপ্রেতাদির গল্পেও এই সত্যটা বেশ বুঝিতে পারি। আত্মহত্যাকারী মৃত্যুর সময় যেরূপ উৎকণ্ঠা ও অশান্তি

ভোগ করিয়াছিল, তাহার প্রেতশরীর নরলোকের নিকট দেখা দিয়া কখন কখন সেই উৎকণ্ঠা ও অশান্তি প্রকাশ করে। হত্যাকারীর আত্মা যদি প্রেতশরীরে কখন কোন লোককে দেখা দিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রেতটি রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ মরিবার সময় যে চিন্তায় দেহত্যাগ করিবে, সেই চিন্তামত তাহার গতি হইবে। তাহার চিন্তা যদি ভাল হয়, তাহার গতিও ভাল হইবে। তাহার চিন্তা যদি মন্দ হয়, তাহার পরজন্মের গতিও মন্দ হইবে।

সেইজন্য, আমাদের শাস্ত্রাদেশ যে, অন্তিম সময়ে নারায়ণের নাম ও ধ্যান করিয়া দেহত্যাগ করিলে পরমগতি হইবে, মানুষ বিষ্ণুলোকে যাইবে। "অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" এই নাম হিন্দুর বড়ই শান্তির জিনিষ।

কিন্তু আপত্তি হইতে পারে যে, সারাজীবন পাপ করিয়া মরিবার সময় "হরিনাম" করিলে যদি সে বৈকুণ্ঠে যায়, তবে ত তাহার পাপ ভোগ হইল না; এ কি রকম অবিচার? মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা করিয়া তাহা হইলেত সকল পাপীই বিচিত্র উপায়ে কর্ম্মফলের ভোগ এড়াইয়া সুখে শান্তিধামে যাইতে পারে?

এ আকাঙ্ক্ষা বৃথা। যে সকল পাপী সারাজীবন পাপ করিয়া আসিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহাদের ঈশ্বরের চিন্তা মনেও আসিবেও না। আসিতে পারেও না। তাহাদের অভ্যাসমত পাপের চিন্তা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। আবার যাহারা পুণ্যবান্, সারাজীবন পুণ্যকার্য্য করিয়া আসিয়াছে মৃত্যুকালে অভ্যাসমত তাহারাই কেবল ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিতে পারে। অভ্যাস যদি ভাল হয়, মৃত্যুকালে চিন্তাও ভাল হইবে, অভ্যাস মন্দ হইলে, তখন চিন্তাও মন্দ হইবে।

একটি শুকপক্ষীকে বাল্যকাল হইতে পড়াইতে অভ্যাস না

করিলে, শেষে কেবল 'কোঁ্যা কাঁ্যা' করিবে না ত আর কি করিবে? অভ্যাসই বলবান্। ঈশ্বর চিন্তার অভ্যাস থাকিলে মৃত্যুকালে অভ্যাস মত সহজে দয়াময়ের চিন্তা ও নাম স্মরণ হইবে, নচেৎ, ফাঁকি দিয়া কর্ম্মফল এড়াইবার জায়গা এ বিশ্বরাজ্য নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, বি-এ, বি-এল্।

শিবুদাদার অদ্ভুত দর্শন।

আমাদের গ্রামে শ্রীশিবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজগুণে সকলেরই প্রিয়পাত্র। তাঁহার মত পরার্থপর, ধর্ম্মপরায়ণ, পক্ষপাতশূন্য, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যুবক আজকাল বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্মশানে গিয়া দেখ, রোদননিরত শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অটলহৃদয় শিবকৃষ্ণ ধীরভাবে চিতাসজ্জায় ব্যাপৃত, আবার উৎসবক্ষেত্রে গিয়া দেখ বদ্ধপরিকর শিবকৃষ্ণ সাধারণের সন্তোষ বিধানার্থ অক্লান্ত পরিশ্রমে নিরত। এইরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকারিতায় শিবকৃষ্ণবাবু গ্রামমধ্যে সকলেরই ধন্যবাদভাজন, সকলেরই মিত্র। আমি তাঁহাকে অগ্রজের মত ভক্তি করি, তাই 'শিবুদাদা' বলিয়া ডাকি।

সেই শিবুদাদার মুখে আমি তাঁহার প্রত্যক্ষ একটী অদ্ভুত ঘটনা শুনিয়াছিলাম। যদি অন্য কাহারও মুখে শুনিতাম, বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু সত্যপ্রিয় শিবুদাদার কথা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত হইবার নহে। তাই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া পাঠকদিগের কৌতূহল নিবারণার্থ তাহা নিম্নে প্রদান করিলাম—

"আমার বয়স তখন পনর কি ষোল বৎসর। আমার এক ভগিনী পুরাতন পীড়ায় ভুগিতেছিল বলিয়া আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী তাহার চিকিৎসার জন্য তাহাকে লইয়া কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন। আমি, আমার অন্যান্য ভাইগুলির সহিত বাড়ীতে থাকি। তবে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় গিয়া ভগিনীকে দেখিয়া আসি।

এইরূপ আমি একবার ভগিনীকে দেখিবার জন্য কলিকাতার বাসায় গিয়াছিলাম। সেখানে ব্যবহারোপযোগী অনেকগুলি দ্রব্য কিনিয়া দিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পিতা মাতার ইচ্ছা ছিল আমি সে রাত্রে সেখানে থাকি। কিন্তু কি করিব? পরদিন প্রাতঃকালে বাটীতে একটী আবশ্যকীয় কার্য্য থাকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে সেই রাত্রে বাটী ফিরিতে হইল। আমি রাত্রি দশ ঘটিকার এক্স্প্রেসে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

যখন গাড়ী নৈহাটীষ্টেসনে * পৌঁছিল, তখন রাত্রি ১১টা। ক্ষীণ জ্যোৎস্না উদিত হইয়া তখন পূর্ব্ববর্ত্তী প্রগাঢ় অন্ধকারকে কিয়ৎপরিমাণে শিথিল করিয়া তুলিতেছিল বটে, কিন্তু সে শিথিলতা প্রকৃতির প্রতি অঙ্গে এক ভীষণ নীরবতার ছবি প্রকটিত করিয়াছিল। পথে জনমানবের সমাগম ছিল না, কি কোনরূপ কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। আমি একাকী গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিলাম।

---

* ভাটপাড়া গ্রামের একদিকে কাঁকিনাড়া, অপরদিকে নৈহাটী ষ্টেসন। কাঁকিনাড়া দক্ষিণে, নৈহাটী উত্তরে অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত। রাত্রি ১০টার এক্স্প্রেস কাঁকিনাড়া ষ্টেসনে থামে না। একেবারে নৈহাটীতে গিয়া ধরে। কাজেই শিবুদাদাকে নৈহাটীতে নামিতে হইয়াছিল।

ক্রমে রথখোলা* ও খালধার + নির্ভয়ে অতিক্রম করিয়া মাইনর স্কুলের নিকট আসিলাম। কাছেই ঘাট। মনে করিলাম ঘাটে যাইয়া একবার মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া আসিব। তাই ঘাটপানে চলিতে লাগিলাম।

ঘাটের পথে একটী বৃহৎ নোনা গাছ। আমি তাহার সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র গাছটী প্রবলবেগে নড়িতে লাগিল। শরৎকালের নির্ম্মল রাত্রি। বায়ুর লেশমাত্র ছিল না। পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষসকল একেবারে নিশ্চল। সহসা এই বৃক্ষের এইরূপ সঞ্চালন দেখিয়া আমি ক্ষণকালের জন্য ভয়াভিভূত হইলাম। সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। কিন্তু তখন আমার যৌবনের প্রারম্ভ, দেহে বিলক্ষণ শক্তি। আমি দৃঢ় সাহস অবলম্বন করিয়া "কে ? কে ?" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম। বলিতে বলিতে দেখিলাম একটী মাংসপিণ্ডের মত মনুষ্যমূর্ত্তি বৃক্ষ হইতে ধুপ করিয়া পড়িয়া গড়াইতে লাগিল। আমি তখন অদম্য সাহসের সহিত দৌড়িয়া গিয়া তাহার হাত ধরিলাম। হাত ধরিবামাত্র আমি সর্ব্বাঙ্গে যেন এক অনির্ব্বচনীয় শৈত্য অনুভব করিলাম; এবং দেখিলাম যাহাকে দূর হইতে একটী মাংসপিণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছিল, তাহা একটী সূক্ষ্ম চর্ম্মাবৃত অস্থিময় জরাগ্রস্ত মূর্ত্তি। তাহাকে ধরিয়া আমার হাতে যেন হাড় ফুটিতে লাগিল।

আমি সাহসভরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে তুই, বল্। নতুবা এই দণ্ডে তোকে বিলক্ষণ শাস্তি দিব।" মূর্ত্তিটী নির্ব্বাক্ থাকিয়া কেবল পিট্ পিট্ করিয়া চাহিতে লাগিল।

---

* কাঁটালপাড়ার সাহিত্য সম্রাট্ ৺বঙ্কিমবাবুর বাটীর সন্নিহিত ভূখণ্ড রথখোলা নামে পরিচিত। তাঁহার বাটীতে বহুদিন ধরিয়া রথযাত্রা হইয়া আসিতেছে। এইজন্য ঐ বাটীর সন্নিহিত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডকে এখানকার লোকে রথখোলা বলিয়া থাকে।

+ খালধার অর্থাৎ মুক্তপুরের খাল স্বনামে প্রসিদ্ধ, সে খাল ভাটপাড়া ও কাঁটালপাড়ার মধ্যস্থলে থাকিয়া দুইটী গ্রামের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহারই সন্নিহিত ভূমি।

তখন আমি তাহার হাত ধরিয়া সবলে নাড়া দিতে লাগিলাম। প্রতি সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে যেন হাড় বিঁধিয়া যাইতে লাগিল। সেই যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও আমি বারংবার তাহাকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলাম।

তখন সে অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—

"আমি রা—র * বাড়ী যাইব।"

"রা—র বাড়ী যাইব?"—এ কথা শুনিয়া আমার মনে দারুণ দুশ্চিন্তা আসিল। এই নিশীথে এই বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত ব্যক্তি রা—র বাড়ী যাইতে চায় কেন? এ ব্যক্তি রা—র কি কোন আত্মীয়? যদি তাহাই হয়, এই রাত্রে বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিল কেন? আর এইরূপ জরাগ্রস্ত বিক্লব দেহ বৃক্ষের উপরে উঠিলই বা কি প্রকারে?

এইরূপ প্রশ্নপরম্পরা উদিত হইয়া আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল। আমি অতি সূক্ষ্মভাবে সে মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সহসা আমার মনে এক অতীতস্মৃতি উদিত হইয়া আমাকে অত্যন্ত ভয়াভিভূত করিয়া ফেলিল। আমি দেখিলাম—এ যে রা—র পিতা! সে যে অনেক দিন পূর্ব্বে মারা গিয়াছে!

সেই গভীর নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে একটী মৃত ব্যক্তির মূর্ত্তি দর্শনে মনে কিরূপ আতঙ্কের সঞ্চার হয়, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে। ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া গেল। আমি আর তাহার হাত ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমার শিথিল হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সে গড়াইতে গড়াইতে ঘাটের দিকে নামিয়া গেল।

সাধারণের মত আমি যদি দুর্ব্বল হইতাম, হয়ত সে মুহূর্ত্তে ভয়ে আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হইত। কিন্তু অভিনব যৌবন ও পূর্ণস্বাস্থ্য আমাকে

---

* রা— আমাদের গ্রামের একজন কৈবর্ত্ত অধিবাসী। এখনও জীবিত।

প্রভূত বলের অধিকারী করিয়াছিল। আমি দৃঢ় সাহস সহকারে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম সে মূর্ত্তি কোথায় চলিয়া যায়।

দেখিলাম মূর্ত্তিটী গড়াইতে গড়াইতে এক স্থানে গিয়া ঠেকিল, আর নড়িল না। আমি প্রায় পাঁচ মিনিট কাল ধরিয়া এক দৃষ্টে সে দিকে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, সে মূর্ত্তি যেন এক স্থানে স্থির হইয়া রহিল।

তখন আমার মনে হইল, উহাকে আর একবার দেখিয়া আসি, কিন্তু আর একাকী যাইতে সাহস হইল না। নিকটে একটী কাঠের গোলা ছিল। সেই গোলায় সীতারাম নামক এক হিন্দুস্থানী রাত্রিকালে শুইয়া থাকিত। আমি উচ্চৈঃস্বরে "সীতারাম" সীতারাম" বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম।

আমার ডাক শুনিয়া সীতারাম ছুটিয়া আসিল।

আমি সীতারামকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া, যে স্থানে সে মূর্ত্তি স্থিরভাব ধারণ করিয়াছিল, সেই স্থান দেখাইয়া বলিলাম—' চল দুজনে মিলিয়া ওখানে গিয়া দেখিয়া আসি।"

দুজনে সাহসভরে সেখানে যাইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, সেখানে গিয়া দেখিলাম, কিছুই নাই! একটী ভাঙ্গা পাড়ে চাঁদের কিরণ পড়িয়া সে স্থানটীকে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান অপেক্ষা কিছু উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, তাই দূর হইতে মনুষ্যমূর্ত্তির মত প্রতিভাত হইতেছে!

কিন্তু সে মূর্ত্তি আমার চক্ষুর সম্মুখে গড়াইতে গড়াইতে কোথায় চলিয়া গেল? আমরা অনেকদূর পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু সে মূর্ত্তি কোথায়ও দৃষ্ট হইল না। তখন ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কম্পমান হৃদয়ে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম। সমস্ত রাত্রিই মনে ঐ বিষয় লইয়া আন্দোলন হইল। ঘুম হইল না।"

শিবুদাদার মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই সহৃদয় পাঠকদিগের নিকট উল্লেখ করিলাম। এখন তাঁহারা আলোচনা করুন, সে মূর্ত্তি ভৌতিক কি না।

ভাটপাড়া
৩১।৭।১৩। } শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

জাতিস্মর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

গোয়ালিয়র রাজষ্টেটের দেওয়ান শ্রীযুক্ত শ্যাম সুন্দর লাল সি, আই, ই, মহাশয় পুনর্জন্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নিম্নলিখিত ঘটনা কয়েকটি প্রকাশ করেন। তিনি ঘটনা স্থলে অন্বেষণ করিয়া সত্যতা নির্দ্ধারণ করিয়া তবে পাঠকগণের গোচরে আনিয়াছেন।

আগ্রা ও গোয়ালিয়রের মধ্য স্থিত ধোলপুর গ্রামে একটি ভদ্র লোকের কন্যার পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ হয় সংবাদ পাইয়া তিনি অনুসন্ধানে এইরূপ জানিতে পারেন ;—

কন্যাটি মুক্তপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী। মুক্তপ্রসাদ ধোলপুরে আইগ্রাশ খাস আফিসে কর্ম্ম করেন। কন্যাটির বয়স তখন দশ বৎসর দশ মাস, ১৯৫৬ সম্বতে তাহার জন্ম হয়। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কাল হইতে সে পূর্ব্ব জন্মের কথা বলিতে আরম্ভ করে। ধোলপুরের নিকট ভামতীপুর গ্রামে তাহার পূর্ব্ব জন্মের বাস স্থান ছিল, ঢোলপুর তহশীল-কাছারির অতি নিকটেই এই গ্রাম। কন্যাটিকে সেই গ্রামে লইয়া যাওয়া হইল। তাহার পূর্ব্ব জন্মের বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়াই সে সকল লোককে

চিনিতে পারিল। প্রত্যেকের বাটী ও ঘাট পথ চিনিতে পারিল ও নাম ধরিয়া অনেককে ডাকিতে লাগিল। পূর্ব্বজন্মে তাহার দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল, তাহাদের চিনিতে পারিয়া নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। সে বলিল, ঘরের দেওয়ালের এক স্থানে কতক টাকা আমি পুঁতিয়া রাখিয়াছিলাম। ছেলেরা ঐ টাকা ইতি পূর্ব্বে বাহির করিয়া লইয়াছে বলিয়া তাহারা একথা স্বীকার করিল না। পূর্ব্বজন্মের আরও অন্য অন্য ঘটনা যাহা তাহার স্মরণ হইয়াছিল, তাহার সকল প্রমাণ লওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে ক্রমশঃ তাহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লোপ হইয়া আসিতেছে, এখনও সামান্য সামান্য স্মরণ আছে। পূর্ব্ব জন্মে মৃত্যুর পর হইতে এ জন্মে জন্মের তারিখ পর্য্যন্ত প্রায় ৫ বৎসর অতীত হইয়াছিল। এই পাঁচ বৎসর কাল সে কাম-লোকে ও স্বর্গ লোকে ছিল।

ঢোলপুরের অন্তর্বর্ত্তী চৌধুরিপুর গ্রামের হরনারায়ণ নামক এক ব্রাহ্মণ মরিয়া ঐ ঢোলপুরের অন্তর্গত দামিপুর নামক স্থানে ছুতার হইয়া ১৯৪০ সম্বতে জন্ম লয়। দুইটি গ্রাম পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। লোকটির বয়স এখন প্রায় ২৬ বৎসর হইবে। ইহার ৫।৬ বৎসর বয়সের সময় সে পূর্ব্ব জন্মের বাটীতে যাইয়া সকলকে চিনিতে পারিয়াছিল। ইহার কথা মত ঘোড়া বাঁধিবার খোঁটার নীচে কয়েকটি টাকা ও একটি কোদাল গর্ত্তের ভিতর হইতে তুলিয়া বাহির করা হয়, এই কোদাল ও টাকা সে নিজে পুঁতিয়া রাখিয়া ছিল। বাল্যকালে তাহার পূর্ব্বজন্মের ঘটনা বেশ স্মরণ হইত। সে তাহার মাতার হস্তের ব্যতীত বাটীর অন্য কাহারও হাতের জিনিষ খাইত না। বলিত, আমি ব্রাহ্মণ, শূদ্রের স্পর্শ করা জিনিষ খাইব না। পূর্ব্বজন্মে তাহার সম্বত ১৯৩৮ সনে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর হইতে পুনর্জ্জন্ম মধ্যে দুই বৎসর মাত্র সময় ব্যবধান ছিল।

গোয়ালিয়র ষ্টেটের অন্তর্গত তোরঘর জেলায় বীরপুর গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ বন্দুকের গুলিতে বিবাদক্ষেত্রে মারা পড়ে। এই লোকটি ঐ গ্রামেই ঠাকুর গোলাব সিং নামে নূতন জন্ম প্রাপ্ত হয়। বাল্যকালে তাহার পূর্ব্বজন্মের কথা ও তাহার অপঘাত মৃত্যুর কথা বলিতে পারিয়াছিল। প্রতিশোধ ইচ্ছায় সে জেলার ফৌজদারি আদালতে তাহার হত্যাকারীদের নামে মকদ্দমা আনিয়াছিল। ঐ মকদ্দমায় যথারীতি তদন্তও হইয়াছিল। কিন্তু ফরিয়াদির পূর্ব্বজন্মে এই হত্যা ঘটিয়াছিল, আদালতে এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান জীবনের উক্তি ব্যতীত পূর্ব্ব জন্মসংক্রান্ত প্রমাণের অভাব হয় এবং আদালতও পুনর্জন্ম স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, কাজেই মকদ্দমায় কোন ফল হইল না। শুনা যায়, ঐ পরগণার আদালতে এই মকদ্দমার নথি এখনও আছে।

ঢোলপুরের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর অফ্‌ পুলিস বলিলেন, তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের স্ত্রীর মৃত্যুর পর উহার এক পুত্রের একটি কন্যা হয়, কন্যাটি দেখিতে মৃতা স্ত্রীর মত। বাল্যাবস্থায় সে পূর্ব্বজন্মের অনেক কথা বলিত ও সকলকে চিনিতে পারিত। তাহার এ জন্মের পিতামহকে দেখিলেই সে অতিশয় লজ্জা করিত ও বলিত উনি আমার পূর্ব্বজন্মের স্বামী। পূর্ব্বজন্মে সে যাহা যাহা খাইতে ভালবাসিত এ জন্মেও সেই সকল খাইতে তাহার ঝোঁক হইয়াছিল। দোক্তা খাইতে পূর্ব্বজন্মে বড়ই ভালবাসিত, এ জন্মে সে বড়ই দোক্তার ভক্ত হইয়াছে। বালিকাটির বয়স এক্ষণে সতের বৎসর এবং সে আগ্রায় থাকিত। ইহারও দুই জীবনের মধ্যবর্ত্তী কাল অতি অল্প ছিল।

দেওয়ান বাহাদুরের কোন বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন যে একটি বেণিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া মংন্দী-হিংকী হইতে আগ্রার কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকালে পূর্ব্বজন্মের অনেক কথাই সে বলিত। আগ্রা হইতে লোক তাহাকে দেখিতে আসিয়া অনেক ঘটনার সহিত

বালকের কথার মিল থাকা স্বীকার করিত। পূর্ব্বজন্মের অনেককে সে চিনিতে পারিত।

দেওয়ান বাহাদুর আরও বলেন যে ই, আই, রেলওয়ের ঝেনঝাঁক ষ্টেশনের নিকট একটি গাছে একটি ব্রহ্মরাক্ষস বাস করেন। ইনি শাস্ত্রে বড়ই পণ্ডিত ও নানাপ্রকার ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিতে পারেন। অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে; তিনি তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কথা বলিয়া থাকেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি তদন্ত করিতেছেন, এখনও তিনি সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বিশেষ বিবরণ সময়ান্তরে প্রকাশ করিতে তাঁহার ইচ্ছা আছে।

পরস্য যোষিতং হৃত্বা ব্রহ্মস্বমপহৃত্য বৈ।
অরণ্যে নির্জ্জনে দেশে ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥

শাস্ত্রে কথিত আছে পরের স্ত্রী হরণ করিলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব অপহরণের ফলে নির্জন অরণ্যপ্রদেশে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া থাকিতে হয়।

আমার কোন উকিল বন্ধু বলেন, তাঁহাদের বাটীর নিকটে কোন নব বধূ বিবাহের পর শ্বশুর বাটীতে আসিয়াই শ্বশুরের বাটীটি তাহার বহুকালের পরিচিত বোধ করিতে লাগিলেন। বাটীর উঠানে একস্থানে একটি ধান্যের গোলা ছিল, তাহা এখন নাই বলিল। বাটীর বৃদ্ধেরা বলিল যে যথার্থই এক সময়ে সেই স্থানে একটি গোলা ছিল। এ জন্মে বালিকাটির এ বাটীতে আসিবার কোন কারণ থাকে নাই ও কখনও আসে নাই। কাজেই পূর্ব্বজন্মে তাহার এই বাটী দেখা ছিল বলিয়া অনুমান করিতে হয়। পূর্ব্বজন্মের কেবলমাত্র এই বাটী দেখাই তাহার মনে হইতেছে, কোথায় কাহার বাটীতে তাহার পূর্ব্বজন্ম ছিল তাহা তাহার কিছুই মনে পড়ে না। বোধ হয় আরও শৈশবে তাঁহাকে এই বাটীতে কোনরূপে আনিতে পারিলে তাহার পূর্ব্বজন্মের আরও অনেক কথা মনে হইতে পারিত। কারণ এইরূপে যাহাদের পূর্ব্ব জন্মের ঘটনা স্মরণ হয়, তাহা

তাহাদের বাল্যাবস্থাতেই হইয়া থাকে, বয়োবৃদ্ধির সহিত মায়াপ্রভাবে তাহারা এই সকল ভুলিয়া যাইতে থাকে। এরূপ বিস্মৃতি না ঘটিলে সংসারে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারিত।

আর একটি উকিল বাবুর পুত্র আছেন, ইহাঁর বয়স এক্ষণে ১২ বর্ষ হইয়াছে। ইনি বাল্যকালের কথা সমুদয় ভুলিয়া যাইতেছেন। ইনি বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে ইহাঁর পিতামহের সহোদর ছিলেন। একদিন ইহাঁর পিতামহের নিকট শয়ন করিয়া আছেন, নানা কথার মধ্যে অকস্মাৎ বলিলেন, দেখ দাদা! তুমি আমার নদাদা ছিলে, এখন দাদা মশায় হইয়াছ। ইনি পূর্ব্বজন্মে একটি যষ্টি ব্যবহার করিতেন, মৃত্যুর পর সেই যষ্টিটি বাটীতে দেওয়ালে ঝুলান ছিল। শিশুটি এক সময়ে বলিলেন, আমার সে লাঠিটা কোথায় গেল, বলিয়া এঘর ওঘর খুঁজিয়া দেওয়ালের সেই লাঠিটি তাহার লাঠি বলিয়া চিনিতে পারিয়া উহা পাড়িয়া দিতে বলিলেন। পরে ঐ লাঠিটি বরাবর সে লইয়া থাকিতেন। তিনি পূর্ব্বজন্মে তাঁহার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে যাইতে দিতেন না। এ জন্মেও বালক তাহাকে, অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মের পিতামহের ভ্রাতৃবধূকে পিত্রালয়ে যাইতে দেখিয়া বলিতেন তোমাকে কখনও বাপের বাটী যাইতে দিতাম না, তুমি যাইতে পারিবে না। ইনি পূর্ব্ব জন্মে কিছু টাকা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। ইহাঁর সেই মৃত দেহ যখন সকলে শ্মশানে লইয়া গিয়াছে এবং বাটীতে তাহার স্ত্রী ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন, এমত সময় স্ত্রীর নিকট ইনি উপস্থিত হইয়া বলেন, কেবল কাঁদিলে কি হইবে, আয়রন-চেষ্টের মধ্যে যা টাকা আছে তাহা যাইয়া সরাইয়া রাখ, শ্মশান হইতে ইহাঁরা ফিরিয়া আসিলে আর টাকা তোমার পাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই কথা শুনিয়া তিনি উঠিয়া সেই টাকা সরাইয়া রাখেন। বালকটি মধ্যে মধ্যে বলিত আমি যে কতকগুলি টাকা রাখিয়া গেলাম তাহা কোথায় গেল। প্রেত অবস্থায় স্ত্রীকে যে টাকা সরাইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা

তাহার স্মরণ হয় না। পূর্ব্বজন্মের কথা এখন তাঁহার আর স্মরণ হয় না।

এবারের ঘটনাটি আমাদের বাটীর সম্বন্ধীয় হইতেছে। আমাদের জ্ঞাতি, যাঁহারা বহুকাল হইতে পৃথক্ আছেন, যাঁহাদের বাটীকে আমরা সেজদের বাটী বলি, সেই বাটীর গিন্নীকে আমরা সেজ জ্যেঠাই বলিতাম। ইনি অতি প্রাচীনা হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে স্বামী, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতির শোক পাইয়া অনেক দিন জীবিতা ছিলেন। শেষে গ্লকোমা পীড়াগ্রস্ত হইয়া অন্ধ হইয়া বৎসর ৪।৫ জীবিত ছিলেন। বহুকাল হইতে ইহাঁকে হবিষ্যান্নভোজন করিতে দেখিয়া আসিতেছি। জ্যেষ্ঠ পৌত্র ও পৌত্রবধূকে বিশেষ ভালবাসিতেন। অপর পৌত্র ও তাহাদের বধূদের বড় একটা স্নেহ করিতেন না। নিজের পুত্রবধূর প্রতিও তাদৃশ আস্থা ছিল না। অন্ধ হইয়া পড়ায় তাহাকে পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূদের উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইল। আজকালকার বধূদের যেরূপ হইয়া থাকে, ইহাঁরা কিছু দিন সেবা করিয়া শেষে অযত্ন করিতে লাগিলেন। হবিষ্যান্ন করিয়া দেওয়া বন্ধ হইল। নিরামিষ ভোজন হইতে লাগিল। পৌত্রবধূদের সহিত প্রায় প্রত্যহই কলহ চলিতে লাগিল। শৌচার্থ সাহায্য ও আহার দেওয়া সম্বন্ধে পরস্পর নানারূপ বিবাদ হইতে থাকে। ক্রমে বৃদ্ধার মৃত্যুকাল আসন্ন হইল ও গঙ্গাতীরে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল। আজ প্রায় দ্বাদশ বর্ষের কথা।

ইহার বৎসর দুই পরে সেজ জ্যেঠাইয়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্রের একটি কন্যা হইল। কন্যাটির অঙ্গবিশেষ উক্ত মৃতা বৃদ্ধার অনুরূপ হইয়াছিল। একারণ জ্ঞাতিবর্গ সকলেই অনুমান করিত বৃদ্ধা কন্যার পিতাকে যেরূপ ভালবাসিতেন, তাহাতে তিনিই আসিয়াছেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কন্যাটি ক্রমে ৪ ৫ বৎসরের হইলে, দেখা গেল সে সদর বাটীর পরে যে গোয়ালবাটী আছে তাহার সম্মুখের রাস্তায় চক্ষু বুজিয়া হাত তুলিয়া ঠিক

অন্ধ সেজ জ্যেঠাই যেরূপে আসিতেন সেইরূপেই আসিতেছে। জিজ্ঞাসায় হাসিয়া বলিত, আমি যে কাণা। আমি কি দেখিতে পাই? মধ্যমা পৌত্র-বধূকে বলিত তোমার হাতের ভাত আমি খাইব না, তুমি আমাকে অম্বলের মাছ তুলিয়া রাখিয়া তাহা নিরামিষ অম্বল বলিয়া খাওইয়াছ। তোমার বরাতে অনেক কষ্ট আছে, তুমি যেরূপ কটু কথা আমাকে বলিয়াছ তাহাতে তোমার জিহ্বা খসিয়া তুমি মরিবে। বস্তুতঃ বধূটি গল-ক্ষত হইয়া মারা পড়ে। উক্ত রূপ অম্বল দেওয়ার কথা বৃদ্ধার জীবদ্দশায় আমরাও শুনিয়াছিলাম।

আমার ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ একদিন বৈকালে বাটীর রোয়াকে বসিয়া আছেন এমন সময়ে কন্যাটি সম্মুখ দিয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি তামাসা করিয়া বলিলেন, "কিলো সেজগিন্নি কোথায় গিয়াছিলি?" তাহাতে বালিকাটী বলিল, "তুই আবার আমার সহিত কি তামাসা করিস? তোর বিবাহ ত আমিই দেওয়াইলাম। তোর বাপের বাটী ত সেই কাসুন্দে, তোদের বাটীর সম্মুখে সেই এক কলুদের দোকান আছে ও সেই গলির রাস্তার উপর তোর বাপের দুতালা বাটী। বিবাহের পূর্ব্বে আমি গঙ্গাস্নান উপলক্ষে তোকে দেখিতে যাই, মনে পড়ে?" বালিকা কখনও গঙ্গাস্নান করিতে যায় না, বধূমাতার পিত্রালয়ে কাসুন্দে সে কখনও যায় না। সে এ খবর কোথায় পাইল। সেজগিন্নী যথার্থ গিয়াছিল ও দেখিয়াছিল বটে তবে সে কথা বালিকা কি করিয়া জানিল? এরূপ কথা বার্ত্তাতে তাহাকে সেজগিন্নী বলিয়া আমরা সকলে বিশ্বাস করিয়া থাকি। বালিকাটীর বয়স এক্ষণে ১০।১১ বৎসর হইবে, তাহার এখন আর বেশী কথা মনে পড়ে না।

অলৌকিক রহস্যে পূর্ব্বজন্ম স্মরণ বৃত্তান্ত অতি অল্প সংখ্যকই প্রকাশ হইয়াছে। অথচ বঙ্গের প্রতি গ্রামে, না হউক প্রতি জেলাতেই এরূপ পুত্র কন্যা আছে. যাহাদের পূর্ব্বজন্ম স্মরণ হয়, অনুসন্ধানে মিলিতে

পারে। বিশেষ হিন্দুদের মধ্যে আজ কাল ভগবান্ মনুর ইচ্ছা অনুসারে লোকে মৃত হইবার অতি অল্প কাল পরেই পুনরায় জন্ম লইতেছে, কাজেই ইহাদের অনেকরই পূর্ব্বজন্ম স্মরণ হইতেছে। এবিষয়ে পাঠক-গণ আপন আপন গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া সত্য ঘটনা এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন ইহাই আমাদের ইচ্ছা। আমরা উপরে যে তিনটী ঘটনা প্রকাশ করিলাম, তাহা সমস্তই সত্য বলিয়া জানিবেন; ইহাতে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি নাই।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

যে যে উপাধিসাহায্যে মানব বিষয় উপভোগ করে,—তাহার স্থূল বা সূক্ষ্ম-দেহ,—আমরা তৎসমস্ত বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। তাহার পর, আমাদিগের চৈতন্য,—যিনি শরীরী বা এই সমস্ত শরীরের যিনি অধিপতি,—তিনি নানা অবস্থায়, স্থূল সূক্ষ্মভেদে ভিন্ন ভিন্ন শরীরকে কিরূপে কার্য্যে নিয়োজিত করেন, তাহাও বিচার করিয়া আসিয়াছি। তৎপরে নিদ্রাকালে দেহ ও মানব-চৈতন্য কিরূপ অবস্থায় থাকে, তাহা-দিগের কোনও কার্য্য থাকে কি না, কার্য্য থাকিলে তাহা কিরূপ, এই সমস্ত বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আমরা তৎসঙ্গে স্বপ্নের প্রকৃত হেতু কি, তাহারও অনুসন্ধান করিয়াছি। স্বপ্নের কারণ নিরাকরণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত যেকয়টি বিষয়ের স্মরণ থাকা চাই, তাহা আমরা বিচার করিয়াছি।

১। যিনি উন্নত, নিদ্রাকালে হতচেতন স্থূল-দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া তিনি সূক্ষ্ম-দেহ অবলম্বনে সূক্ষ্ম-লোকে সজাগ থাকিয়া বিহার করেন ; তখন তাঁহার অনেক অসাধারণ শক্তি অধিকারে আসে। আবার যে এখনও সম্পূর্ণ অনভিব্যক্ত, তাহার স্থূলদেহ নিদ্রাকালে যেমন প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার সূক্ষ্ম-দেহও তদ্রূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকে ; তাহার সূক্ষ্মদেহ অনভিব্যক্ত এবং কেহ যে, তাহার অধিষ্ঠাতা আছে, তাহা বোধ হয় না ; চৈতন্যের চিহ্ন মাত্রও যেন সূক্ষ্ম-দেহে পরিলক্ষিত হয় না। কেহ আবার স্থূল মস্তিষ্কে নিদ্রাকালের অনুভূতি সঞ্চালিত করিয়া দেয় ; কেহ তাহা করিবার রহস্য এখনও পরিজ্ঞাত নহে। *

২। মানবের সূক্ষ্ম-দেহ, তাহার বাসনা ও চিন্তার ক্রিয়াক্ষেত্র। তাহা তাহার নিজের বাসনা ও চিন্তায় বা অপরের বাসনা ও চিন্তায় উত্তেজিত ও বিক্ষোভিত হয়। †

৩। অপর পরিকল্পিত বা নিজেরই অতীত কালের চিন্তাতরঙ্গ মানবের পিণ্ডদেহস্থিত মস্তিষ্কে আঘাত করে এবং কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত সেই মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া থাকিয়া, তাহা চলিয়া যায়। অপর আর এক তরঙ্গ আসিয়া তাহা অধিকার করে। এই সমস্ত অসংলগ্ন সম্বন্ধহীন চিন্তারাজির বিরাম নাই, অবসাদ নাই। ‡

৪। নিদ্রাকালে মানব চৈতন্য স্থূল-দেহ ত্যাগ করিয়া যাইলেও, এই পরিত্যক্ত দেহে একপ্রকার অতিক্ষীণ চৈতন্যাভাস থাকে। এই অতি মৃদুভাবে প্রবাহমান চৈতন্য-ছায়ার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে ;— ইহাতে কোনও বাহ্য উত্তেজনা উপস্থিত হইলেই, ইহা তাহাকে অতি-

---

* অলৌকিক রহস্য ৪র্থভাগ, ২৭৫—২৮১

† অলৌকিক রহস্য ৩য় ভাগ, ৩২৪—৩৩০ ; ৪র্থ ভাগ ৯৭—১০৫

‡ অলৌকিক রহস্য ৪র্থ ভাগ, ২২২—২২৬

রঞ্জিত করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে বিবিধ ঘটনাপূর্ণ অভিনব এক উপন্যাস রচনা করে। প্রকৃত ঘটনাটি, যাহা তাহাতে উত্তেজনা আনিয়া দিয়াছিল, তাহা কোথায় ডুবিয়া যায়; এখন স্থূল-মস্তিষ্কস্থিত অতিক্ষীণ সেই চৈতন্য কল্পিত অতিরঞ্জনটি একটি সত্যমূলক ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। *

তাহার পর আমরা যেমন গভীর হইতে গভীরতর নিদ্রায় অভিভূত হই, আমাদিগের সম্বিৎ আমাদিগের আমি-প্রত্যয় একটির পর একটি দেহ ত্যাগ করিয়া অবশেষে সুষুপ্তি বা তুরীয় অবস্থায় আত্ম-চৈতন্যে মিলিয়া যায়। সেই সময় পরিত্যক্ত দেহগুলি আপন আপন চৈতন্যে সঞ্জীবিত থাকিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে থাকে; কারণ যিনি দেহগুলিকে আয়ত্তে রাখিয়া অভীষ্ট কার্য্যে নিয়োজিত করেন, সেই মানব-সম্বিৎ এখন দেহগুলির সহিত প্রায় কোনও সম্বন্ধ রাখেন না। † কিন্তু, যে চৈতন্য তাহাদিগের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে, তাহা অতি ক্ষীণ, তাহা একপ্রকার জড়-চৈতন্য; তাহাতে কোনও স্বাধীন বৃত্তি থাকে না; তাহা যন্ত্রের মত অভ্যস্ত চিন্তা, ভাব বা ঘটনাবলীর কাল্পনিক পুনরভিনয় করে।

তাহার পর আর একটি কথা এখানে স্মরণে রাখিতে হইবে। যখন মানব-চৈতন্য নিদ্রাকালে স্থূল-সূক্ষ্মাদি শরীর হইতে উদ্গত হয়, যখন দেহাবশিষ্ট ক্ষীণ চৈতন্য তত্তৎ দেহকে স্ববশে রাখিতে পারে না, তখন সেই শরীরগুলি বাহ্য কারণে সহজে অভিপন্ন হয়। ‡

এই সমস্ত জটিলতা, এই বিশেষ বিশেষ সংঘাত আছে বলিয়াই প্রকৃত অলীক অবভাষ বিশ্লেষ করা এত দুরূহ। সুষুপ্তির বিজ্ঞান বা স্বপ্ন-বিজ্ঞান তাই যত সহজ বলিয়া মনে হয়, ঠিক ইহা তত সহজ নয়। তাই স্বপ্নমাত্রই অলীক বলিয়া বর্ণিত হয়। মানব যেই প্রবুদ্ধ হয়, সেই স্থূল-দেহে

---

* অলৌকিক রহস্য—৪র্থ বর্ষ ৩০—৩৪, ৯৮—১০০ পৃষ্ঠা।

† অলৌকিক রহস্য ৪র্থ বর্ষ ৩১ পৃষ্ঠা।

‡ অলৌকিক রহস্য ৪র্থ ভাগ, ১০১—১০৫

মানব-সম্বিৎ ফিরিয়া আসে, অমনি সে তাহাই বিভিন্ন দেহের স্বাধীন চৈতন্যের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলিকে ব্যঞ্জনা করে। তখন সকলগুলিই এক সময়ে তাঁহার নিজের অনুভব বলিয়া মনে হয়। এই অনুভবকে যদ্যপি স্বপ্ন নামে অভিহিত করা হয়, তাহা হইলে স্বপ্নকে অলীক না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে ?

আমরা আগামী সংখ্যায় স্বপ্ন সম্বন্ধীয় আলোচনা সন্নিবেশিত করিব। অন্তর্দ্দর্শন বা স্বয়ং আত্মার সাক্ষাৎকার, প্রাক্‌দর্শন ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান, রূপক স্বপ্ন ইত্যাদি বিষয় এক একটি করিয়া সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায়।

অতীতের এক পৃষ্ঠা।

সে আমার অতীত জীবনের একটি মহা স্মরণীয় ঘটনা।—ভীতিপ্রদ, আশ্চর্য্য!

তখন বাঁকীপুরে একখানি ছোটখাটো বাগান বাড়ীতে একলা বাস করি। আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন জীবনটা, ভগ্নস্বাস্থ্য ও শারীরিক অস্বচ্ছন্দতাহেতু, বাংলার বাহিরে এই সুদূর প্রবাসে অতিবাহিত করিতেছিলাম। যে বাড়ীতে আমি থাকিতাম, সেখানির ভিতর বাহির একটু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য—বিভূষিত ছিল। সুমুখে একটি ছোটো বাগান, ভেতরে একটা বাগান—মাঝখানে আমার বাড়ী। বাড়ীর ফটকে একখানি প্রস্তরফলকে আমার নাম লেখা ছিল। আমি সেখানে

পরিচিত বন্ধুবান্ধবদিগের অবৈতনিক ফোটোগ্রাফার ছিলাম। তাতে সকাল সন্ধ্যায় আমার কুটিরে দু'চার জন ভদ্রলোকের আগমন হইত। তাঁহাদের সঙ্গে হাস্যকৌতুকে প্রবাসে একক জীবন সুখে কাটিত।

একদিন সন্ধ্যাকালে আপনার ঘরটিতে চুপ করিয়া বসিয়া আছি। হাতে বিশেষ কোনো কায কর্ম্ম না থাকায় মনটা বেশ ভালো ছিল না। বন্ধুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; এমন সময় চাকরটা ঘরে আসিয়া বলিল--একটি স্ত্রীলোক আমার সাক্ষাতাভিলাষী। মনটা কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসিলাম—কোন্ দেশীয়? শুনিলাম—এইদেশবাসিনী। চাকরকে বলিলাম—তাহাকে এই খানে লইয়া আসুক।

কয়েকমুহূর্ত্ত পরেই মনিয়ার সঙ্গে একটি আপাদমস্তক বিলাতী শালাবৃত রমণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিষ্কার বিলাতী ধরণে অভিবাদন করিল। প্রত্যভিবাদন করিয়া আমি তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলাম। রমণী বসিল। অতি ধীরস্বরে বলিল—আপনি কি amateur ফোটোগ্রাফার?"

"হাঁ"

"তবে কি আমি আপনাকে একবার আমাদের কুটিরে আশা কর্ত্তে পারি না। আমার জননীর একখানা ফোটো লইতে হইবে।"

আমি কাহারো বাড়ী যাইয়া ফোটো লইতাম না। বোধ হয়, amateur Photographer এর উপর এতখানা আব্দার কেহ করে নাই। আমি আভাসে তাহা জানাইলাম। রমণী অতি স্নিগ্ধ, কোমল মধুরকণ্ঠে বলিল "তা জানি। কিন্তু আমার জননী মৃত্যুশয্যায়। দরিদ্রা আমরা। পেসাদার ফোটোগ্রাফার লইয়া যাইবার ক্ষমতা নাই। তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি কি এ অনুগ্রহ কর্ব্বেন না?"

রমণীর মুখাবরণ তখন অপসৃত হইয়াছে। আমার ঘরে "অস্‌লারের" উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। আমি রমণীর মুখের দিকে চাহিলাম। তাহার বৃহৎ আঁখিদুটী অশ্রুসিক্ত! লাবণ্যপূর্ণ মুখের উপর একটা করুণ

ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি বলিলাম "আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। আপনার নাম?"

"মতি—"

"বাড়ী?"

"——পার্কের বাঁ ধারে যে রাস্তা, তারই শেষ বাড়ীখানা। আপনি কখন যাবেন?"

"এখনি। আপনি আগে চলুন। আমি যন্ত্রপাতি ল'য়ে যাচ্ছি।"

রমণী চলিয়া গেল। আমিও কিছুক্ষণ পরে যন্ত্রাদিলয়ে—তাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম—একটি মলিন শয্যার উপর এক বৃদ্ধা রমণী শায়িতা। দেখিয়াই বুঝিলাম—তাহার মহাপ্রস্থানের বেশী বিলম্ব নাই। তাহার পার্শ্বে সেই রমণী বসিয়াছিল।

এ সময় যদিও ঠিক নয়,—তবু আমি একবার তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া পরিলাম না। সে সৌন্দর্য্য-প্রতিমার দিকে চাহিয়া আমি স্থান, কাল মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলাম। একদৃষ্টে তাহাকে দেখিলাম। রমণী আমার দিকেও একবার চাহিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভ হইয়া—আমি তাহার জননীর আলোকচিত্র গ্রহণ করিলাম।

*   *   *   *

কয়েকদিন পরে সেই রমণী (রমণী কেন বলি—বালিকা; তাহার বয়ঃক্রম ষোড়শবর্ষের অধিক হইবে না।) আমার কক্ষে আসিয়া বসিল। তাহার পোষাক ও মুখভাবেই জননীর সংবাদ দিতেছিল। সে বলিল— "মায়ের ছবিখানা হোয়েছে কি?"

আমি আমার সংগ্রহ-পুস্তক হইতে একখানা ছবি লইয়া তাহার হাতে দিলাম। সে ছবিখানা লইয়াই বুকের উপর রাখিল। পরে ধীরে ধীরে নামাইয়া বেশ করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার আঁখিপল্লব—স্থির! তাহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ কম্পমান! আমি অদূরে বসিয়া তাহাই নিরীক্ষণ

করিতেছিলাম। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—"রং এত কালো হোয়েছে—কেন?" বুঝাইয়া দিলাম, রাত্রে গৃহীত চিত্র ইহা অপেক্ষা ফর্শা হ'তে পারে না। তবু আমি যথাসাধ্য করেছি।

সে লজ্জিতা হইয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল—"মার আমার অন্তিম সময়ের চেহারা কি সুন্দরই ছিল!"—সে এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। আমি তাহাকে ভুলাইবার জন্ত বলিলাম—"সন্তানেও সে সৌন্দর্য্যের পূর্ণবিকাশ।"

সে বলিল—"কণামাত্র।—তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যের বিন্দুমাত্র। জনক জননী সুন্দর হইলে সন্তানও সুন্দর হইয়া থাকে।"—পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই আপনার বাপ্ মা খুব সুন্দর ছিলেন?"

হাসিয়া বলিলাম—"কেন?"

সে বলিল—"আপনি সুন্দর, সুপুরুষ।"

"ধন্তবাদ! এ কথা এই প্রথম শুনিলাম। আমার চেহারার প্রশংসা বড় কেহ করে নাই; নিজেও কোনো লক্ষণ দেখি নাই।"

"ও কথা সত্য নহে।"—বলিয়া সে যেন অতৃপ্ত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর—দু'চার বার ধন্তবাদ দিয়া ছবিখানা লইয়া চলিয়া গেল।

* * * *

তারপর—এমন ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল—সে যদি একদিন না আসিত, আমার প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত হইত। সেও রোজ—শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রত্যহ আমার নিকট আসিত। বার বার ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিত। আপনার লোকের মত অসঙ্কোচে আমার সহিত আলাপ করিত।

আমি ভাবিতাম—এ কি শুধু কৃতজ্ঞতা? উপকারের বিনিময়? কিছুই ঠিক করিতে পারিতাম না।

এই সময় একদিন বাড়ী হইতে একটা জরুরী টেলিগ্রাম পাইলাম, আমার জননী অসুস্থা! আমাকে তৎক্ষণাৎ বাটী রওনা হইতে হইবে। তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র গুছাইয়া বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া চলিলাম। যখন—পার্কের পাশ দিয়া যাই একবার মনে হইয়াছিল—বিহারী বালিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলে ভালো হইত। কিন্তু হাত ঘড়িতে দেখিলাম Express এর সময় নিকট। তীরবেগে গাড়ী ছুটাইয়া দিলাম।

*　　*　　*　　*

জননীর অসুস্থতার সংবাদ—মিথ্যা! প্রবাসী পুত্রকে গৃহে আনিয়া বিবাহ দিবার কল্পনা ও সংকল্প মাত্র! স্নেহময়ী জননীর অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না। এক শুভদিনে, শুভক্ষণে হেম আসিয়া জানাইল—এ হৃদয় তাহারই।　　　　(ক্রমশঃ)

গুহামুখে।

(১)

১৮৯৭ সালের ভূকম্পে যে সময় বাংলাদেশ ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল, তখন আমি হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে বসিয়া হিমালয়ের শীতল নিঃশ্বাসে উপসেবিত হইতেছিলাম। একটী হিন্দুস্থানী বালক ময়দার পিটুলী আনিয়া তাহার একটী একটী টুকরা নদীজলে নিক্ষেপ করিতেছিল। অসংখ্য শুভ্র মৎস্য সেই পিটুলীর টুকরা খাইবার জন্য গঙ্গার স্বচ্ছজলরাশি আলোড়ন করিতেছিল। আমি বসিয়া বসিয়া তাই দেখিতেছিলাম।

সহসা বালক ঘাটের সিঁড়ির উপরে পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহ কে যেন প্রবল বেগে কম্পিত করিয়া দিল। মাথাটা ঘুরিয়া গেল। ব্যাপার কি বুঝিতে না বুঝিতে চারিদিক্ হইতে কোলাহল উত্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইয়া গেল।

তখন অপরাহ্ণ—বেলা তিনটা কি চারিটা হইবে। অন্য সময় হইলে সে ঘাট জনপূর্ণ থাকিত। কিন্তু সে দিন সে সময় সেখানে সেই বালক ছাড়া আর কেহই ছিলনা। জ্যৈষ্ঠমাস—হরিদ্বারের বায়ু প্রায় সর্ব্ব-সময়েই সুখস্পর্শ। কিন্তু সেদিন প্রাতঃকাল হইতে কেমন একটা অননুভূতপূর্ব্ব গ্রীষ্মে নগরবাসী প্রপীড়িত হইতেছিল। গ্রীষ্মের প্রকোপ সহিতে না পারিয়া আমি গঙ্গাতীরে আসিয়াছি। সবেমাত্র শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় উল্লিখিত ঘটনা ঘটিয়া গেল।

প্রথমে আমি যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলাম। সম্মুখে বালকটী পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাকে যে তুলিতে হইবে তাহা ভুলিয়াছি। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখনও দেখি বালকটী পতিত রহিয়াছে। শশব্যস্ত হইয়া তাহাকে তুলিতে যাইতেছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে আমাকে নিষেধ করিল। ফিরিয়া দেখি এক যোগিনী।

যোগিনী বলিলেন—"বালককে স্পর্শ করিও না। জীবের কর্ম্ম শেষ হইয়াছে। বালক বাঁচিবে না।"

বাঁচিবে না! আমি যোগিনীর বাক্য অবহেলা করিয়া বালকের সাহায্যার্থে দ্রুতপদে সোপান অবরোহণ করিতে লাগিলাম। বালকের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সে মূর্চ্ছিত—মুখখানি গঙ্গার দিকে করিয়া যেন পার্শ্বে ভর দিয়া ঘুমাইতেছে। বালকের মুখ আমি পূর্ব্বে দেখি নাই। এখন দেখিলাম। দেখিবামাত্র মায়ার প্রহারে আমি মূর্চ্ছিতবৎ হইলাম। শুভ্র গঙ্গাজল অভ্যন্তরে তরঙ্গ লুকাইয়া যেন

জমাট বাঁধিয়া একটী প্রস্ফুটিত পদ্মের আকার ধারণ করিয়াছে। ভূকম্পান্দোলিত জল তখনও পর্য্যন্ত উচ্ছলিত হইয়া সিঁড়িগুলাকে আঘাত করিতেছিল। আঘাতে উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গশীকর বালকের সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিতেছিল। গঙ্গা যেন নিজ জলে আপনার নবনীতময় তনুর পূজায় নিযুক্ত। যেন জলনিষেকে আপনাকে তৃপ্ত করিয়া তীর্থ-মাহাত্ম্য অনুভব করিতেছে।

ব্যাকুল হইয়া আমি বালককে উঠাইতে দেহ ঈষৎ অবনমিত করিয়া হস্ত প্রসারণ করিতেছি, এমন সময়ে গম্ভীর—ঈষৎ রুক্ষস্বরে যোগিনী বলিলেন—"মরিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছ কেন?"

কথাটা শুনিয়া আমার একটু যেন ভয় হইল। মনে হইল যেন মৃত্যু বালকের দেহান্তরালে তাহার কঠোর হস্ত লুকাইয়া রাখিয়াছে। বালককে স্পর্শমাত্র সে যেন আমাকেও ধরিয়া ফেলিবে। আমি আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইলাম। যোগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি এমন অন্যায় কার্য্য করিতেছি যে, মরিব?"

"বালকের দেহ স্পর্শ করিলেই তোমার মৃত্যু অনিবার্য্য। অথচ সে মৃত্যুতে তোমার মুক্তি নাই।"

"বালক কি মুক্ত হইল?"

যোগিনী একথায় কোনও উত্তর করিলেন না। কেবল 'হো হো' রবে একটা উচ্চহাস্য করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

ইহার পরে এক দুই করিয়া ক্রমে ঘাট লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। বালকের পিতা আসিল; এবং মূর্চ্ছিত বালককে স্কন্ধে লইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমার আর সাহায্যের প্রয়োজন হইল না। লোক সকল ভূমিকম্পের কথা, বালকের কথা, ক্রমে অন্যান্য নানা কথা লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করিতে লাগিল। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

(২)

সমস্ত রাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি ঘুমাইতে পারি নাই। কি যেন একটা দুর্ব্বোধ যাতনায় ছটফট করিয়াছি। ঘুমাইবার জন্য অনেকবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু প্রতিবারেই তন্দ্রামুখে সেই বালকের কমনীয় মূর্ত্তি আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে আমি বালকের সন্ধান লইলাম। জানিলাম, পূর্ব্বরজনীতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পিতা তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই হরিদ্বার পরিত্যাগ করিয়াছে। সবেমাত্র তিন দিন পূর্ব্বে সে বালক পুত্রটীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে আগমন করিয়াছিল। শুনিয়া বিস্ময় ও দুঃখে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

হরিদ্বার আর আমার ভাল লাগিল না। মনে করিলাম, আমিও এস্থান পরিত্যাগ করি। আমি এখানে তীর্থ করিতে আসি নাই। আসিয়াছিলাম মনের আবেগ দূর করিতে। গৃহে আমি জন্মাবধি কোনও সুখ পাই নাই। দুই দিন একটু সুখের মুখ দেখিবার উপক্রম হইয়াছিল, দৈব বিড়ম্বনায় তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম তীর্থে আসিয়া একটু শান্তি পাইব। এই উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করি। প্রথমে কাশীতে আসি। কিন্তু সে বৎসর কাশীতে এমন প্রচণ্ড গরম পড়িয়াছিল যে, কাশীবাসে অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা একান্ত দুঃসহ। আমি কাশীতে দিন দুই মাত্র থাকিয়াই হরিদ্বারে পলায়ন করি। এখানে সপ্তাহ বাস করিতে না করিতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিল। আমি হরিদ্বার ত্যাগের সঙ্কল্প করিলাম।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে যোগিনীকে একবার দেখিতে আমার ইচ্ছা হইল। ভাবিলাম এ কি! এ বালক যে মরিবে, এ রমণী তাহা কেমন করিয়া জানিল! তাহার পর সে যে সব কথা বলিল, তাহার একবর্ণও আমি বুঝিতে পারিলাম না। বালককে স্পর্শ করিলে আমি মরিব কেন?

মরিলেও আমার মুক্তি নাই। অথচ জীবন-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভের জন্য আমি ইতিপূর্ব্বে অনেকবার মৃত্যু কামনা করিয়াছি। কিন্তু যেই শুনিলাম, মুক্তি নাই—অমনি মরণের চিন্তায় কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। মুক্তিই যদি নাই, তবে এত শীঘ্র মরিয়া লাভ কি!

কিন্তু যোগিনী বলিয়াছে, বালক মৃত্যুর সঙ্গে মুক্তি লাভ করিল। করিল কি না করিল, তাহা এ রমণী কেমন করিয়া জানি ল! আর মুক্তিই বা কি? তাহার লাভে বালকের কি এমন অপূর্ব্ব সম্পত্তি প্রাপ্তি হইল? কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আমি সমস্ত দিন ধরিয়া যোগিনীর অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কোথাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। স্থির করিলাম একেবারে হাওড়ার টিকিট কিনিব। গরমের জন্য উত্তর পশ্চিমের কোন সহরেই যাইতে আমার সাহস হইল না। আমি গাড়ী ছাড়িবার অনেক পূর্ব্বে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমার সঙ্গের বোঝা অতি অল্প ছিল। একটা ছোট বিছানা ও একটী ব্যাগ আমার সম্বলমাত্র ছিল। টাকা কড়ি যাহা আমি সঙ্গে আনিয়াছিলাম, সে সমস্ত আমি একটা গেঁজিয়ায় পুরিয়া কোমরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং আমার মোট ও ব্যাগ আমি একটা আলোকস্তম্ভের নিম্নে রাখিয়া প্ল্যাটফরমে পায়চারী করিতে লাগিলাম।

গাড়ী ছাড়িবার বহু পূর্ব্ব হইতেই অনেক ফেরত যাত্রী ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের প্রায় সমস্তই পঞ্জাবী ও উত্তর পশ্চিম দেশীয়। বাঙ্গালী যে একেবারে ছিল না এমন নয়। তবে আমি দুদণ্ড আলাপ করিতে পারি, এমন বাঙ্গালী সেখানে কেহ ছিল না।

আর দেখা হইবে না স্থির বুঝিয়া আমি হিমালয়ের মোহন গাম্ভীর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্ল্যাটফরমে পদচারণ করিতে লাগিলাম। ক্লান্ত হইয়া বিছানার মোটের উপর বসিতে যাইতেছি, এমন সময় একটী

বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। সে আমাকে দেখিয়াই আমার নিকটে আসিল এবং আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিলাম না। অনেক কথা গোপন করিলাম। কেননা পরিচয় দিয়া আমার আর সুখ নাই। তবে পরিচয়ের মধ্যে বাসভূমির কথাটা আমি তাহাকে গোপন করিলাম না।

বাসস্থানের কথা শুনিয়াই সে বলিল—"সেই জন্যই আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি কি দেশের কোনও সংবাদ রাখিয়াছেন ?"

আমি উত্তর করিলাম—"না। কেন, দেশের কি হইয়াছে ?"

"কি হইয়াছে জানি না। কয়দিন যাবৎ দেশের জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়াছে। দেশ হইতে বহুদিন কোনও সংবাদ পাই নাই। তাই টেলিগ্রাফ করিতে ষ্টেশনে আসিতেছিলাম। পথে আসিতে আসিতে এক যোগিনীর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হইল। তাঁহার মুখে শুনিলাম, ভূমিকম্পে বাংলার অনেক স্থান ধ্বংস হইয়াছে। কলিকাতার সন্নিহিত স্থানে সেরূপ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অনেক অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে।"

তাহার কথা শুনিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। বলিলাম, "সবে মাত্র কাল ত ভূমিকম্প হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গালার খবর এখানে কেমন করিয়া পৌঁছিল ?"

যুবক বলিল—"আমিও তাই ভাবিয়াছি। কলিকাতা হইতে এখানে সংবাদ পৌঁছিতে অন্ততঃ চারিদিন লাগিবে। সে স্ত্রীলোক ইহারই মধ্যে ভূমিকম্পের সংবাদ কোথা হইতে পাইল! আমি তাহার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি নাই।"

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"যোগিনীকে আপনি কোথায় দেখিয়াছেন ?

যুবক উত্তর করিল—"ষ্টেশনের অনতিদূরে—পথে।"

"আপনি তাহাকে দেখাইতে পারেন ?"

"যেখানে দেখিয়াছি, সেখানে তিনি থাকিলে দেখাইতে পারি।"

"চলুন, তাহাকে একবার দেখিয়া আসি।"

আমি আমার মোটটা বগলে উঠাইয়া লইলাম। যুবক ব্যাগটী হাতে লইল। যোগিনীর উদ্দেশে আমরা ষ্টেশন পরিত্যাগ করিলাম।

পথে চলিতে চলিতে উভয়ের মধ্যে পরিচয়ের আরও দুই চারিটী কথা হইল। তাহাতে জানিতে পারিলাম, আমরা উভয়েই একস্থানের লোক। উভয়েরই নিবাস রাজসাহী জেলায়। আমার বাড়ী নাটোরের সন্নিকটে। তাহার বাড়ী আমাদের গ্রাম হইতে ছয়ক্রোশ দূরে। উভয়েই রাঢ়ী-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। এদেশের অধিকাংশই বারেন্দ্র। রাঢ়ীর সংখ্যা অতি অল্প। বিবাহের আদান প্রদান এই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই হইয়া থাকে। আমি কুলীন, সে শ্রোত্রীয়। আমি নির্ধন, সে ধনী। উভয়েই "ভালবাসা" রোগাক্রান্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছি। শুধু তাই নয়—এ প্রণয় ব্যাপারে উভয়ে এক সময়ে পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম। এখন তৃতীয় ব্যক্তি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া উভয়কেই অভিনয়-ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। যাক্, এসব কথা পরে বলিব। এখন যাহা বলিবার তাহাই বলি।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া অধিকদূর আমাদের যাইতে হইল না। যেস্থানে একাগাড়ীগুলা দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারই সন্নিহিত একটী বটবৃক্ষ-তলে দেখিলাম যোগিনী বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে অতি কদর্য্য, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতযুক্ত একটা কুকুর শুইয়া শুইয়া লাঙ্গুল নাড়িতেছে।

যোগিনী যেন তন্ময়ী হইয়া কুকুরটার দিকে চাহিয়াছিল। কুকুরটাও তার মুখেরদিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়াছিল। দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে যেন তাহাদের পরস্পরে আলাপ হইতেছিল। অনুমানে যাহা বোধ হইল তাহাই বলিলাম। এ আলাপ রহস্য আমি বলপ্রয়োগে কাহাকেও বুঝিতে

বাধা করিতেছি না। তবে সে সময় যে কেহই সেখানে উপস্থিত হউন না কেন, একটু স্থিরভাবে উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে, তাঁহারও মনে ওইরূপ অনুমান আসিত এইটাই আমার বিশ্বাস। আমার সঙ্গী যুবকটীও যোগিনীকে দেখিয়া চুপিচুপি আমাকে বলিল—"হাঁ মহাশয়! যোগিনী কি কুকুরের সঙ্গে কথা কহিতেছে?"—তাহার এমনই এক অপূর্ব্ব রহস্যময় দৃষ্টি!

আমি সঙ্গীকে ইঙ্গিতে কথা কহিতে নিষেধ করিলাম; এবং উভয়ে অতি ধীরভাবে তাহার সমীপে উপস্থিত হইলাম। উভয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। কোন আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রয়োগ করা দূরে থাকুক, যোগিনী একটীবারের জন্যও আমাদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল না।

একবার ডাকিলাম—"মা!" কোনও উত্তর পাইলাম না। উত্তর না পাওয়ায় আমার সহচর যেন কিছু ভীত হইল। সে আমাকে আবার অনুচ্চস্বরে বলিল—"আসুন, আমরা কিছুক্ষণের জন্য দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করি। যোগিনী উঠিলে তাঁহার কাছে আসিব।"

সে কথা না শুনিয়া, আমি আবার ডাকিলাম—"মা!" উত্তর পাইলাম না। তখন সঙ্গীর পরামর্শই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিয়া আমরা একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলাম। দূর হইতে তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতে দেখিতে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। যোগিনী সেই বিক্ষ-তাঙ্গ রুগ্ন কুকুরটাকে কোলে তুলিয়া লইল। তাহার পর মাতা যেমন সন্তানকে কোলে লইয়া আদর করে, সেইরূপ আদরের ভাব দেখাইতে লাগিল। তাহার মুখচুম্বন করিল, চক্ষুর জল সযত্নে মুছাইয়া দিল। আমাদের বোধ হইতে লাগিল, যেন কত কথাই সে তাহার সহিত কহিতেছে। অনেকক্ষণ আদর করিবার পর যোগিনী কুকুরটাকে স্কন্ধে তুলিল। তার-পর গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিল। কুকুরটার অবস্থা দেখিয়া আমার অনুমান

হইল সেটা মরিয়াছে। যোগিনী তাহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে চলিয়াছে। এখন আমি কি করিব? যোগিনীর অনুসরণ করিতে হইলে গাড়ী ছাড়িয়া দিতে হয়, গাড়ীতে উঠিতে হইলে কৌতূহল চরিতার্থ করিবার আশা পরিত্যাগ করিতে হয়।

আমি সহচরকে মনের কথা বলিলাম। সে বলিল—"দেশে এত শীঘ্র ফিরিবার আপনার কি প্রয়োজন?"

আমি বলিলাম "প্রয়োজন কিছুই নাই। এস্থান আমার আর ভাল লাগিতেছে না।"

"শুধু ভাল লাগিতেছে না বলিয়া যাইতেছেন? এস্থান যদি আপনার ভাল না লাগে, পৃথিবীর আর কোথায় গিয়া আপনি সুখ পাইবেন? আমার ইচ্ছা আরও দিনকয়েক আপনি এখানে থাকুন।"

"আমি যে বাসা তুলিয়া দিয়াছি!"

"আমার বাসায় থাকিবেন। সঙ্কোচবোধ যদি না করেন, তাহা হইলে যতদিন ইচ্ছা আপনি থাকিবেন। আমি তাতে পরমসুখী হইব।"

কি করিব, দাঁড়াইয়া স্থির করিতেছি, ইতিমধ্যে যুবক একজন মুটেকে ডাকিয়া আমার বগল হইতে বিছানাটা বাহির করিয়া লইল। তারপর আমার হাত ধরিয়া বলিল—"চল ভাই, আর ইতস্ততঃ করিও না।"

এক কথায় যুবক আমাকে আত্মীয় করিয়া লইল। আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার সঙ্গে চলিলাম।

আমাদের পরস্পরের আলাপের অবসরে যোগিনী চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। আমরা পদব্রজেই তাহার অনুসরণ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

চক্র।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে, শুধু যে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব আছে তাই নয়; ইচ্ছা করিলে আমরা পৃথিবীতেই প্রেতাত্মা আনয়ন করিতে পারি—তাদের সহিত কথোপকথন করাও আমাদের সাধ্যাতীত নয়। কিন্তু ইচ্ছা করা যত সহজ, সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। প্রেতাত্মা আনয়নের পথে বহু বাধা বিঘ্ন আছে; প্রথমে সেইগুলি পরাজয় করা চাই—তাহা না পারিলে প্রেতাত্মা দর্শন অসম্ভব।

অনেকে কিন্তু দুই একদিন দেখিয়াই, শেষে বিরক্ত হইয়া ছাড়িয়া দেন; কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত—যে প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য দৃশ্য জগতের সহিত অদৃশ্য জগতের সম্বন্ধ স্থাপন, যার ফলে অদৃশ্য জগতের অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের চক্ষের সমক্ষে খুলিয়া যায়, তাহাতে সফলতালাভ একদিনেই হইতে পারে না; সফল হইতে গেলে অদম্য উৎসাহ চাই, আর চাই ধৈর্য্য—নতুবা শুদ্ধ ইচ্ছা করিলেই হইবে না।

প্রেতাত্মাদর্শন অনেক রকমে হইতে পারে; তবে সাধারণতঃ তিন-রকম উপায়ই অবলম্বন করা হয়; যথা,—

(১) চক্র বা স্পিরিট্ সার্কল

(২) প্ল্যান্চেট্

(৩) মধ্যস্থ বা মিডিয়ম

আমরা এখানে শুধু চক্রের কথাই বলিব।

অনেকে মনে করেন, শুদ্ধ উপবেশনের উপরই চক্রের সফলতা নির্ভর করে, কিন্তু তা নয়—জলবায়ুর অবস্থাও চক্রের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। চক্রে উপবেশন করিবার সময় প্রধানতঃ এই কয়টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে,—

(১) জলবায়ুর অবস্থা,
(২) শারীরিক অবস্থা
(৩) মানসিক অবস্থা
(৪) স্থানিক অবস্থা।

জলবায়ুর অবস্থা ঃ—আকাশ যেদিন মেঘে ঢাকা, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, সেদিন চক্রের উপযোগী নয়; গুমট কিংবা খুব ঠাণ্ডার দিনেও চক্র কখনও সফল হয় না। ঝড়বৃষ্টির সময়, কিংবা বায়ু যখন আর্দ্র থাকে, সে সময়ে কদাপি চক্রে বসিবে না। চুম্বকশক্তির গোলযোগও ইহার অনুকূল নয়।

অল্প অল্প উত্তাপ পড়িয়াছে, অথচ বায়ু জলসিক্ত নয়, সেইরূপ সময়ই চক্রের উপযোগী; যে সময়ে কোন অবস্থাই চরমে উঠে নাই, সেই সময়েই চক্রে উপবেশন করা উচিত—মনে রাখিবে সকল জিনিষেরই মধ্যাবস্থা ভাল; সে সময়ে মানুষের মনের মধ্যেও সামঞ্জস্য থাকে; চক্রে সফলতা লাভ করিতে হইলে, মন ভাল থাকা বিশেষ আবশ্যক।

আলোকের তেজও একটু কম করিয়া দিলে ভাল হয়; কম আলোকে (একবারে অন্ধকার হইলে আরও ভাল) ক্ষমতা অধিক স্ফূর্ত্তি পায়, প্রভুত্ব পরিচালনেরও অনেকটা সুবিধা হয়।

শারীরিক অবস্থা ঃ—উপবেশকের মধ্য হইতে একটা জৈবিক শক্তি (ভাইটাল ফোর্স) বাহির হইতে থাকে—প্রেতাত্মা ও পার্থিব পদার্থ, এতদুভয়ের মধ্যে এই শক্তিই সংযোজক, এই শক্তির সাহায্যেই তারা পৃথিবীতে আসিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির মানবের শক্তি বিভিন্ন প্রকার; সকলের দেহ হইতেই এই শক্তি বাহির হয় না। আবার কোন কোন লোকের শরীর হইতে যে শক্তি নিঃসৃত হয়, তাহা চক্রে সাহায্য করা দূরে থাকুক—বরং সফলতায় বাধা দেয়।

চক্রে উপবিষ্ট সকলেরই প্রকৃতি যদি একরূপ হয়, তাহা হইলে প্রেতাত্মা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে; কিন্তু উপবেশকদিগের প্রকৃতির বিভিন্নতা থাকিলে প্রকাশে সাধারণতঃ বিলম্ব হইয়া থাকে। তবে এক কার্য্য করিতে পারিলে সে ভয় থাকে না। প্রথমে দেখিতে হইবে চক্রে দুইপ্রকার ধাতের লোক আছে কি না; যদি থাকে, তাহা হইলে তাদের এমনভাবে বসাইতে হইবে, যাহাতে তাদের দেহবিনির্গত শক্তি-জগতে (সাইকিকাল্ এট্‌মস্‌ফিয়ার্) সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়।

চক্রের সফলতা ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপরই বেশী নির্ভর করে; যদি দেখ চক্র বিফল হইল, তাহা হইলে উপবেশনের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যতক্ষণ উপযুক্ত অবস্থা না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ এইরূপ করিতে হইবে।

মানসিক অবস্থা :—মানসিক উত্তেজনা (যতটুকুই হউক না কেন) সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায়। যাহাদের মত সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহাদের একত্রে উপবেশন করা উচিত নয়; ঐরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির চক্রের বাহিরে থাকাই ভাল। তবে যাঁদের মতামত তত দৃঢ় নয়, তাঁরা চক্রে থাকিতে পারেন; কিন্তু তাদেরও বসাইবার সময় দেখিতে হইবে, যেন একমতের সকল লোক একত্রে বসিতে না পান। একজন বিরুদ্ধবাদীর পাশেই একজন ভিন্নমতাবলম্বী বসিবেন; তারপরে আবার একজন বিরুদ্ধবাদী—এইরূপে চক্র সাজাইতে হইবে। তাহা হইলে আর কোন গোলযোগের ভয় থাকিবে না।

যে সকল লোকের মধ্যে মিল নাই—যাঁরা পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করেন, তাঁদের যেন চক্রে বসিতে দেওয়া না হয়। বালক, কিংবা কুস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিকে চক্রে স্থান দিবে না।

উপবেশকদের সহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক। অস্থিরমতি ব্যক্তিগণ চক্রে বসিবার উপযুক্ত নহেন।

স্থানিক অবস্থা :—অভ্যাসের জন্যই হউক বা গবেষণার জন্যই হউক, যে সময়ে চক্রে বসিবে, সে সময় অন্য কিছু করিবে না।

ঘরটী বেশ গরম হওয়া চাই—বায়ু চলাচলের পথও প্রয়োজন; কিন্তু বাতাসের ঝাপটা যেন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, ইহার দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

যাঁহারা চক্রে বসিবেন, তাঁরা যেন বসিবার একঘণ্টা পূর্ব্বেই আসিয়া মিলিত হন। যাঁরা একবার বসিবেন, প্রতিবার তাঁরাই বসিলে ভাল হয়। আর এক কথা, উপবেশকেরা প্রত্যেকবার স্থান পরিবর্ত্তন করিবেন না—একদিন যেস্থানে বসিয়াছেন, প্রতিদিন সেইস্থানেই বসিবেন। ইহাতে উপকার এই যে, চক্রে বসিবার সময় শক্তি ক্ষয় হইতে পায় না। প্রেতাত্মাদর্শনের জন্য যে চৌম্বকশক্তি আবশ্যক, সে শক্তি অক্ষুন্ন থাকে।

চক্রে বসিবার নিয়ম।

এইবার কিরকম করিয়া চক্রে বসিতে হয়, তাহাই বলিব। চক্রে সাধারণতঃ চার হইতে আটজন লোক বসিতে পারে; তার মধ্যে অন্ততঃ দুইজন বিরুদ্ধবাদী থাকা ভাল—কিন্তু তাঁরা যেন দৃঢ়চিত্ত না হন।

টেবিলটী যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ করিয়া লইলেই চলিবে; তবে চতুষ্কোণ, আয়ত কিংবা বাদামী আকারের হইলেই ভাল হয়।

চেয়ার সাধারণ কাঠের হইলেই চলিবে; গদিওয়ালা চেয়ার কখনও ব্যবহার করিবে না। বিশেষতঃ, যাঁরা সহজেই ভূতাবিষ্ট হয়েন, কিংবা যাঁদের অনুভূতি খুব প্রখর, তাঁদের পক্ষে এ নিষেধ আরও প্রযোজ্য। গদিতে যদি শক্তি জন্মে, তাহা হইলে উপবেশকের বড়ই অসুবিধা হয়।

যাতে সকলের মনে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, তাই করা উচিত; সঙ্গীত, গল্প, পুস্তক পাঠ, কিংবা ইচ্ছা করিলে স্তোত্রপাঠ বা উপাসনাও করা যাইতে পারে—যে প্রকারে হউক, সকলের মন একমুখী হইলেই হইল।

কিন্তু কথা কহিতে কহিতে তর্ক করিতে বসিও না—চক্রে বসিয়া বিবাদ বিসম্বাদ করা কর্ত্তব্য নয়; মন যাতে আমোদে থাকে, তা'ই করা বাঞ্ছনীয়।

প্রেতাত্মার আবির্ভাব।

চক্রে বসিয়া কতবার যে বিফল হইতে হয়, তার ঠিক নাই। দশবার বসিয়া বসিয়া যদি হইল ত ভাল, নতুবা আবার নূতন করিয়া চক্র আরম্ভ করিবে। একটী চক্রের জন্য কখনও এক ঘণ্টার বেশী সময় দিবে না। তাতেও যদি না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে সে চক্রে আর হইবে না, আবার নূতন করিয়া চক্রের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইতে পারে; আবার হয়ত সমস্ত দিন বসিয়াও কিছু হয় না। যখন দেখিবে, টেবিলে কে যেন টোকা মারিতেছে, টেবিল যেন নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে, তখনই জানিবে প্রেতাত্মা আসিয়াছে; কিন্তু তখনি উত্তর পাইবার জন্য ব্যস্ত হইও না।

(১) যদি টেবিল নড়ে, তাহা হইলে টেবিলের উপর আল্‌তোভাবে হাতটী রাখিয়া দেখ, তোমার নিজেরই হাত কাঁপিতেছে কিনা। যখন বুঝিবে, আমাদের মধ্যে কেহ টেবিল নাড়াইতেছে না, তখন—

(২) হাতটী টেবিল হইতে একটু উপরে তুলিয়া ধরিবে—দেখিও যেন টেবিলে হাত না ঠেকে। তখনও যদি দেখ টেবিল নড়িতেছে, তাহা হইলে প্রেতাত্মার আবির্ভাব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিবে না।

কিন্তু আগে আল্‌তোভাবে হাত রাখিয়া ঠিক না জানিলে, টেবিল হইতে হাত সরাইয়া লইবে না। আগে প্রথম উপায়ে দেখিয়া, তারপর দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়।

Printed by A. Banerji, at the Metcalfe Printing Works :
34, Mechuabazar Street, Calcutta.

পঞ্চম ভাগ। আশ্বিন ১৩২০। ৩য় সংখ্যা।

অলৌকিক রহস্য

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদিত।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বিএ, বিএল,
সহকারি-সম্পাদক।

বার্ষিক মূল্য ১।০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

সূচী।

অলৌকিক রহস্যের নিয়মাবলী

১। "অলৌকিক রহস্য" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলাদি সমেত সহর, মফঃস্বল সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা মাত্র; ভিঃ পিঃতে পাঠাইতে ৵০ এক আনা অধিক লাগে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴০ তিন আনা।

৩। কেবল ৴১০ সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা একখণ্ড প্রেরিত হইবে।

৪। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পর-সংখ্যা-প্রকাশের পূর্ব্বে না জানাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনরায় পাঠাইতে দায়ী থাকিব না।

৫। কেহ যদ্যপি পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া রিপ্লাই পোষ্টকার্ড লিখিবেন।

৬। "অলৌকিক রহস্য"-সম্বন্ধীয় চিঠি-পত্র, টাকা-পয়সা আমার নামে এবং প্রবন্ধাদি বিনিময়ার্থ পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ইউনিভার্শেল লাইব্রেরী,
৫৬।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্,

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পুনরাগমন সামাজিক উপন্যাস যাহা ধারাবাহিক 'অলৌকিক রহস্যে' বাহির হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

অলৌকিক রহস্য।

৫ম বর্ষ।]   আশ্বিন, ১৩২০।   ৩য় সংখ্যা।

প্রেতত্ব ও তাহার মোচনোপায়।

প্রেতঃ নরকস্থপ্রাণী। ভূতভেদঃ ইত্যমরঃ। মৃতে ত্রি প্রত্যয়ে ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ। প্রেত অর্থে নরকস্থপ্রাণী বিশেষ, একপ্রকার ভূত, অমরকোষ অভিধানে কথিত হইয়াছে। যাহারা এই জগৎ হইতে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের প্রেত কহে। প্রেতগণ মৃত্যুপথে এই ভূলোক হইতে চলিয়া গিয়াছে মাত্র; ইহারা এককালে এই জগতেই আমাদের মত মানবদেহ ধারণ করিয়াছিল। ইহাদিগকে অমরকোষকার এক প্রকার ভূত বলিয়াছেন, ইহার অর্থে বুঝা যায়, আমাদের এই পৃথিবী সম্বন্ধে উহারা আর বর্ত্তমান নাই, ইহারা মানবদেহ ধারণ করিয়া থাকে। কালে পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল, এক্ষণে ইহাদের পৃথিবী-বাস অতীত কালের ঘটনা হইয়া পড়িয়াছে, এইজন্য অতীত কালবোধক ভূত শব্দ ইহাদের নাম হইয়াছে। এইরূপ অর্থ অনুসারে মানবকে মৃত্যুর পরই প্রেত, ভূতশব্দে উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু সচরাচর তাহা হয় না। ভূত, প্রেত এই দুইটি শব্দ এক্ষণে কদর্থে, নিকৃষ্টার্থে ব্যবহৃত হইতেছে। মৃত্যুর পর যাহাদের পৃথিবীতে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিবার ইচ্ছা প্রবল আছে ও সেই ইচ্ছার বশে মর্ত্ত্যলোকবাসী মানবকে দর্শন দিতেছে ও নানা প্রকার অত্যাচার আদি করিতেছে, তাহাদেরই চলিত

কথায় লোকে 'ভূত হইয়াছে' বলিয়া থাকে, এবং একটু শুদ্ধ ভাষায় বলিতে হইলে তাহাদের প্রেতত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে বলা হইয়া থাকে। এইরূপ প্রেতত্ব প্রাপ্তির কারণ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জন্তুগণ অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া চতুরশীতি লক্ষ যোনিতে বিচরণ করিতে থাকে। অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ হইয়া প্রত্যেক শ্রেণীতে এক-বিংশতি লক্ষ বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। উপরি উক্ত পৌরাণিক উক্তি সর্ব্বথা ও সর্ব্ব অবস্থায় প্রযুজ্য হইতে পারে না। এক এক অবস্থায় জন্মের সংখ্যা এক-বিংশতি লক্ষ অপেক্ষা অনেক কম করা যাইতে পারে। মানব জন্মে চেষ্টা করিয়া লোকে অনেক অল্প সংখ্যক জন্মের মধ্যেই মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জন্ম মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারে। এমন কি পশুজন্মেই প্রকৃত হিতৈষী লোকের সান্নিধ্যে ও সহায়তায় পশুজন্ম সংখ্যাও অনেক কমিয়া গিয়া থাকে। মানবদেহ হইবার পূর্ব্বে জীবকে পশুদেহে থাকিতে হয়। যাহাদের পশুজন্ম সংখ্যা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ জীবকে গৃহপালিত পশুরূপে জন্মিতে হয়। এইরূপে মানবের সংস্পর্শে আসিয়া ইহাদের আমিত্বের প্রসার হইতে থাকে। অহং জ্ঞান বিশেষ-রূপে ইহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইতে থাকে। যিনি নারায়ণের এই ক্রম বিকাশের নিয়ম বুঝেন, সেইরূপ ভাবে ক্রম বিকাশের কার্য্যে সহায়তা করা তিনি নিজের ধর্ম্ম বলিয়াও জানেন, তিনি আপনার আশ্রিত পশু-দের মধ্যে এই অহংজ্ঞান আবশ্যকমত বৃদ্ধি জন্য পশুদের শিক্ষা দিয়া থাকেন। এইরূপে সাধুর সহায়তার ক্রমে ক্রমে সেই পশুর আবশ্যক মত আমিত্ব বোধ হওয়ায় তাহার পশুজন্মের সংখ্যার শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা এক্ষণে পৃথিবীতে মানবদেহে রহিয়াছি। আমাদের যখন পশু-দেহ ছিল, তখন আমরা চন্দ্রলোকে বাস

করিতাম। তথাকার মানবের সাহায্যে আমাদের অনেকের এইরূপে পশুজন্ম হইতে দুর্লভ মানবদেহ লাভ, কয়েক জন্ম অগ্রে হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। আমাদের গৃহপালিত পশু সকলেরও আমাদের মত জীবাত্মা আছে। তবে তাহার উন্নতি বা বিকাশ আমাদের মত হইতে বিলম্ব আছে। উহারা আমাদের গন্তব্য পথে চলিতেছে, তবে অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছে মাত্র। উহারা আমাদের কৃপার পাত্র, উহাদের অগ্রসর করিয়া দিতে আমাদের চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন। আমাদের পৃথিবীর পশুদের মধ্যে অনেকেরই মানবদেহ লাভ আর পৃথিবীতে ঘটিবে না, তখন প্রাণস্রোত এ পৃথিবী ছাড়িয়া অন্য কোন লোকে থাকা সম্ভব।

অণ্ডজাদি জীব সকলের শরীরের বাক্, চক্ষুদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, শ্রবণ-যুগল ও মূত্র পুরীষের দুইটি পথ আছে, এই সকল ছিদ্রকে দ্বার কহে। নাভির উর্দ্ধে মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত অষ্ট ছিদ্র রহিয়াছে। সুকৃতিসম্পন্ন মানবগণের জীবাত্মা ঐ সকল উর্দ্ধছিদ্রের কোন একটীর মধ্য দিয়া প্রয়াণ করিয়া থাকে। যাহারা অধশ্ছিদ্রে গমন করে অর্থাৎ যাহাদের প্রাণবায়ু নাভির নিম্নস্থ কোন দ্বার দিয়া মৃত্যুকালে বাহির হইয়া যায়, তাহারা সদ্গতিলাভে সমর্থ হয় না। গরুড়পুরাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—প্রাণিগণ মরিলে পরমায়ু সূক্ষ্মীভূত হইয়া তাহাদের গলদেশ হইতে নির্গত হয়, এবং দেহের কর্ণ, নাসা, গলদেশ প্রভৃতি নবদ্বার, রোমকূপ ও তালুরন্ধ্র দ্বারাও বহির্গত হইয়া থাকে। বায়ুর সহিতই জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। যাহারা পাপী, তাহাদের অপান বায়ুর সহিত জীব নিষ্ক্রান্ত হয়। এই অপান বায়ুর স্থান নাভির নিম্নদেশে। এইরূপে যাহাদের জীবাত্মা বাহির হইয়া যায়, তাহাদের জীবাত্মা অধশ্ছিদ্র দিয়া যাইল বুঝিতে হইবে। অতএব এইরূপ জীবের সদ্গতির আশা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ আরও

বলিয়াছেন, তৃষ্ণাভিভূত মানব নরক প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা তৃষ্ণা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গযান লাভ করেন। মায়াপাশে বদ্ধ না হইলেই জীব সুখলাভে সমর্থ হয়। পাশবদ্ধ জীবের মন এই সংসারে নিন্দিত কর্ম্মে ভ্রমণ করিতে থাকে। আমরা এই বচন হইতে বুঝিলাম যে প্রেতত্বের প্রধান কারণ মায়া ও তৃষ্ণা।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যাহারা পরস্ব অপহরণ করিতে,বা পত্নী ও আত্মজগণের অন্বেষণে তৎপর, সেই সকল ব্যক্তি মৃত্যুর পর অশরীরী প্রেতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া বায়ুরূপে নিজগৃহে পুনর্ব্বার আগমন করে ও মূত্রোৎসর্গাদির স্থানে অবস্থিতি করে। সেখানে থাকিয়া রোগ শোকাদির দ্বারা পরিবৃত জনগণকে নিরীক্ষণ করে। অনন্তর ঐকান্তিক জ্বর তাহাদের পীড়া প্রদান করে এবং উচ্ছিষ্টাদি স্থলে অবস্থিত হইয়া নিয়তই চিন্তা করিতে থাকে। তথায় ভূতগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পুত্রগণের ছল অন্বেষণপূর্ব্বক উচ্ছিষ্ট ভোজনযুক্ত পানীয় পান করে। কেহ কেহ নিজ প্রেত অবস্থা হইতে মুক্তি কামনায় স্বীয় পুত্রাদি আত্মীয় স্বজনদ্বারা পুণ্য-কার্য্য করাইবার ইচ্ছা ও প্রয়োজন জানাইবার জন্য পুত্রাদিকে চিহ্নিত করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাদের উপর আবিষ্ট হইয়া থাকে, ও গৃহে নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে। এইরূপে পুত্রাদির প্রতি অধিষ্ঠিত হইয়াও যদ্যপি প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার যমলোকে যাইয়া আশ্রয় লইয়া থাকে, যেহেতু তত্রত্য ব্যক্তিদের কালসহকারে কর্ম্ম-ক্ষয়েই প্রেতত্ব হইতে মুক্তি হইয়া থাকে।

আমরা এক্ষণে সূক্ষ্মলোক-দর্শনে সমর্থ সাধকদের দ্বারা যে উপদেশ পাই, তাহা হইতে বুঝি যে প্রেতের এই ক্ষুধা প্রকৃত ক্ষুধা নহে। উহা ভ্রান্ত বা মিথ্যা জ্ঞান মাত্র; জীবিতাবস্থায় বরাবর ক্ষুধা-বোধ

করিয়া আসায়, খাইবার আবশ্যকতা ও অভাব বোধ তাহাদের সংস্কার-বশতঃ মনে উদয় হয়। উহা কেবল তাহাকে কষ্ট দিবার একতম উপায় মাত্র। তাহার খাইবার আবশ্যকতা নাই। এ ভুবলোকে জীবকে খাইতে হয় না। এখানে না খাইলে তাহার শরীরের কোন ক্ষতি নাই ও ক্লান্তি দৌর্ব্বল্য আসিবে না, একথা সেই লোকে জীবকে বুঝাইয়া তাহাকে ক্ষুধা-রূপ যাতনা হইতে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। অনেক পরদুঃখকাতর পার্থিব দেহধারী ও দেহ-মুক্ত মানবে ভুবলোকে এই কার্য্য রীতিমত দৈনিক করিয়া থাকেন। এই প্রেতত্ব আত্মীয় স্বজনের উপর মায়া বশতঃ হইয়া থাকে বুঝিলাম।

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে, মৃতের চিতাকার্য্য সমাপন হইলেই প্রেতত্ব জন্মে। কেহ কেহ বলেন চিতাকার্য্য বিদ্যমানাবস্থাতেই প্রেতত্বপ্রাপ্তি হয়। কোন কোন প্রেততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের মতে যে সময়ে মৃতব্যক্তিকে প্রেতনামে অভিহিত করিয়া পিণ্ড-আদি প্রদান করা হইয়া থাকে, তখনই তাহার প্রেতত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক পৌরাণিক মতে প্রেতত্ব দুই প্রকার। একপ্রকার প্রেতত্ব মৃত্যুর পর হইতে এক বৎসরকাল ব্যাপী, অর্থাৎ যতদিন না ষোড়শ শ্রাদ্ধ হইয়া সপিণ্ডীকরণ হইয়া থাকে, ততদিন সকল হিন্দুকে প্রেতত্বে থাকিতে হয়, এবং তাহাদের শ্রাদ্ধাদি-কালে তাহাদের প্রেতশব্দে আবাহন আদি হইয়া থাকে। এই মতের পোষক বাক্য কূর্ম্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতির মত নানাস্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। সপিণ্ডীকরণের দ্বারা এই বৎসরকাল স্থায়ী প্রেত-দেহের নাশ হইলে জীবের ভোগ-দেহ হইয়া থাকে। তিথিতত্ত্বধৃত বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরীয়বচন ইহার প্রমাণ,—"কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ-পরং। প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥" মানবের এই প্রেতদেহ পূরকপিণ্ডদান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর

দশ দিনে যে দশ পিণ্ড দেওয়ার বিধি আছে, তাহাকে, পূরকপিণ্ড কহে। এই পূরকপিণ্ড প্রতিদিন এক একটি করিয়া দশ দিনে দশটি দিতে হয়। পথম দিবসে যে পিণ্ড দেওয়া হয় তাহাতে প্রেতদেহের মূর্দ্ধা গঠিত হয়; দ্বিতীয় দিবসের পিণ্ড হইতে গ্রীবা ও স্কন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে; তৃতীয় দিবসের পিণ্ড হইতে হৃদয়দেশ জন্মে। চতুর্থ দিবসের পিণ্ড হইতে হস্ত এবং পঞ্চম দিবসে যে পিণ্ড দেওয়া হয় তাহা হইতে নাভি উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠ দিনে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয় তাহাতে কটিদেশ এবং সপ্তম দিবসের পিণ্ড হইতে গুহ্য হইয়া থাকে। অষ্টম দিবসে যে পিণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে তাহাতে উরুদ্বয়, এবং নবম দিবসের প্রদত্ত পিণ্ড হইতে জানু ও চরণ দ্বয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। মৃতব্যক্তির প্রেতদেহ উক্তরূপে নব পিণ্ড প্রদান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নব পিণ্ড দানের শাস্ত্রীয় উদ্দেশ্য এইরূপ বুঝা গেল। কিন্তু এই কার্য্য করিবার জন্য আমাদের কি কোনরূপ যত্ন চেষ্টা আছে? আমাদের উপদেষ্টা কুলপুরোহিত মহাশয় কি আমাদের এই কথা বলিয়া দেন? প্রত্যহ যে এক এক পিণ্ড দিতে হয় তাহা আমরা অনেকে জানিই না। অশৌচান্তদিনে দশপিণ্ড দান করিতে হয়, তাহাই শুধু আমাদের কর্ত্তব্য, ইহাই আমাদের অনেকের ধারণা আছে। পুরোহিত মহাশয় ত কোন যজমানকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলেন না। উদ্দেশ্য বুঝিয়া কাজ করা হিন্দুদের মধ্যে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য পুরোহিতমণ্ডলীর বিশেষ দোষ বলিতে হইবে, তাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মের রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে উপনয়ন হইয়াছিল মনে আছে। উপনয়নের দিন হইতে দিবসত্রয় ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় ঘরের মধ্যে থাকিতে হয়; কাজেই আমাকেও থাকিতে হইয়াছিল। সূর্য্য শূদ্র প্রভৃতিকে দেখিতে নাই, তাহাও বেশ বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আদেশ পালনও

করিয়া ছিলাম। পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজনও এদিকে বেশ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মনে পড়ে ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহে আবদ্ধ থাকিবার সময় মধ্যাহ্নে ঘরের ভিতর বেশ ঘুমাইতাম, কেহ তাহাতে দোষ ধরিতেন না। আজকাল সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া উপনয়নের মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া জানিতে পারিতেছি, পুরোহিত মহাশয় উপবীত প্রদানকালে অনেকগুলি কার্য্য করিতে আমাদের নিষেধ করিয়াছিলেন। আমরাও তখন নূতন উপবীত ধারণ করিয়া সেই কার্য্য করিব না বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে 'মা দিবা স্বাপ্সি'-নামক একটি নিষেধ ছিল, আমরাও তাহার উত্তরে 'বাঢ়ং' বলিয়াছিলাম। ইহার অর্থ এই—পুরোহিত বলিলেন 'তুমি উপবীতধারী হইয়া দিবাভাগে নিদ্রা যাইও না।' আমরা স্বীকার করিলাম 'যে আজ্ঞা'। কিন্তু এই কার্য্যের অর্থ আমাদের পুরোহিত মহাশয়গণ বুঝাইয়া দেন না। আমরাও তখন বুঝিলাম যে আমরা কি করিতেছি বা কি বলিতেছি। কাজেই নূতন উপবীত ধারণ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিলাম তাহা ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতেই ভঙ্গ করিলাম। ইহার জন্য দোষী কে? পুরোহিতগণ নহেন কি? তাঁহারা কি উপনয়নকালে মানবককে যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালায় বুঝাইয়া দিতে পারেন না? ইহা কি তাঁহাদের ধর্ম্ম নয়?

যাউক, এক্ষণে প্রেতত্ব সম্বন্ধে এই বলা যায় যে মৃত্যুর পর লোকের একেবারে এই পৃথিবীর, এই আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন না। সকলেরই একটু না একটু মানসিক অশান্তি থাকিয়াই যায়। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে এই বৎসরব্যাপী প্রেতত্ব সর্ব্বসাধারণের ভোগ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বৎসরকাল প্রেতকে কোথায় কি অবস্থায় থাকিতে হয়, তাহা গরুড় পুরাণে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার প্রেতত্ব গুরুতর পাপ-হেতু ঘটিয়া থাকে, ইহা সকলের

জন্য নহে। কথিত আছে বৈদিক বিধানে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া যাহাদের হয় না, যাহারা আজন্ম বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদ্বেষী, তাহাদের সংবৎসরব্যাপী প্রেতত্বনাশের পর ভোগদেহ প্রাপ্তি হয়। সেই ভোগ দেহে বহুকাল নরক ভোগের পর পুনরায় প্রেতদেহ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। পদ্মপুরাণ উত্তর-খণ্ড ও গরুড় পুরাণে এই মতের পোষক বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাণে প্রেতকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। প্রেত, মহাপ্রেত ও পিশাচ। মহাপ্রেতকে প্রেতরাজও কোথাও কোথাও বলা হইয়া থাকে। মহাপ্রেতদের সঙ্গে অনেক প্রেত থাকে, ইনি যেখানে যান বহুপ্রেত ইঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সঙ্গে গিয়া থাকেন। কখনও ইঁহাকে একাকী থাকিতে হয় না; সর্ব্বদাই দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করেন। দলস্থ অপর সকলেই ইঁহার আজ্ঞাবহ। শুদ্ধিতত্ত্ব-ধৃত বচনে দেখা যায়, অশৌচান্তের পর দ্বিতীয় দিনে যাহাদের বৃষোৎসর্গ হয় নাই, তাহাদের উদ্দেশে শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও তাহাদের পিশাচত্ব লাভ হইয়া থাকে। এই বচনটি প্রক্ষিপ্ত পাঠ বলিয়াই অনুমান করিতে হয়। অর্থাদি অভাবে বৃষোৎসর্গ অনেকেরই না হইবার কথা, তাহা হইলেই যে তাহাদের প্রেতত্ব মাত্র না হইয়া একেবারে নীচ প্রবৃত্তিযুক্ত অনিষ্টকারী ভয়ানক পিশাচত্ব অবস্থা প্রাপ্তি হইবে, ইহা বিচারসঙ্গত বলা যায় না। অথবা বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের প্রশংসাকাণে মাত্র বলা হইয়া থাকিবে। পিশাচ এক প্রকার দেবযোনি বিশেষ। কিন্তু জীব মৃত্যুর পর যে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা দেবযোনি পিশাচ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রেতের মধ্যে যাহারা অতি বড় পাপী, যাহার মনে হিংসা, দ্বেষ, জিঘাংসা প্রভৃতি কুবৃত্তিগুলি অতিশয় প্রবল রহিয়াছে, যাহারা মানবদেহে থাকিয়া ঘাতক, কসাই, ডাকাইত প্রভৃতির কার্য্য করিয়া গিয়াছে এই সকল লোকের পিশাচত্ব অবস্থা হয়।

যাহারা উদ্বন্ধনাদির দ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহারা প্রায়ই পরলোকে আসিয়াও অন্যের ঐরূপ দশা ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা মর্ত্তালোকবাসী মানবদের এই পথ দ্বারা আপনাদের অবস্থায় আনিবার জন্য সদাই চেষ্টিত থাকে। ইহাদের প্ররোচনায় অনেক মানব একবার একটু আত্মহত্যার কথা মনে করিলেই একেবারে প্রবলভাবে আসক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ মৃতব্যক্তিকে পিশাচ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

জার্মানির কোন একস্থানে রাজসরকার হইতে এক সৈনিক পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যহ তথায় একজন সৈনিক পুলিশকে রক্ষক হইয়া থাকিতে হইত। ঐ স্থানের একজন সৈনিক পুরুষ পারিবারিক অশান্তিবশতঃ আপনার বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করে। সে আপনার পাহারাবস্থাতেই আহত হইয়া পড়িয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। পরে ঐ স্থানে যে কয়টী সৈনিক পুরুষকে পাহারা দিতে পাঠান হইয়াছিল, তাহারা সকলেই একে একে আত্মহত্যা করিল। তাহারা বলিত, কেন কি জানি দুই একদিন ঐ স্থানে পাহারায় থাকিবার পরই তাহাদের মনে আত্মহত্যার বাসনা প্রবলভাবে উদিত হইত; সেই সকল সৈনিকদের মনে এমন কোন অশান্তি ছিল না, যাহার জন্য তাহারা ঐ কার্য্য করিবে। তত্রাচ তাহাদের ঐ স্থানে পাহারায় থাকিলেই মনে এই বাসনা এতই প্রবল হইত যে, কয়েকজন ঐ বাসনা দমন করিতে না পারিয়া উপরি উপরি আত্মহত্যা করিল। শেষে রাজ-সরকার হইতে সেই স্থানে পাহারা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। প্রথমে যে সৈনিক-পুরুষ ঐ স্থানে আত্মহত্যা করে তাহার পিশাচত্ব প্রাপ্তিই পরবর্ত্তী কয়েকটি নিরীহ লোকের আত্মহত্যার কারণ। লোকে এইরূপ আত্মহত্যা করিলে তাহা দের আয়ুষ্কালের যত বর্ষ বাকী থাকে, ততকাল প্রায় তাহাদের পিশাচত্ব

অবস্থায় থাকিতে হয়। তবে সকলের অবস্থা এইরূপ হয় না। যাহাদের উদ্দেশ্য ভাল থাকে, যাহারা বিনাপরাধে আত্মহত্যা করে—যেমন পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথম প্রহরীর প্ররোচনায় যে কয়েকটি প্রহরীর আত্মহত্যা ঘটে—সেই সকল লোকের পিশাচত্ব অবস্থা হয় না। ইহারা তাহাদের আয়ুষ্কালের বাকী বর্ষ এক প্রকার অঘোর অবস্থায় কাটাইয়া দেয়।

ক্রমশঃ

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূতাবেশ।

১৯০৮ সনের ৩০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায় ৫টার সময় একটী ভদ্রলোক আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার বাসাতে একটী স্ত্রীলোকের হিষ্টিরিক ফিট হইয়াছে। তাড়াতাড়ি যাইয়া রোগিণীকে ফিটের অবস্থায়ই পাইলাম এবং পরীক্ষা দ্বারা বুঝিলাম—ইহা হিষ্টিরিয়া নহে, ভূতাবেশ।

সম্পাদক মহাশয়, মার্জ্জনা করিবেন, আজ একটুকু বাজে কথা না লিখিয়া পারিলাম না। প্রায় তিন বৎসর হইতে প্রথম যখন হিষ্টিরিয়া ব্যাধি নহে "ভূতাবেশ", এই কথা সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম, তখন আমার বড়ই ভয় হইয়াছিল যে, হয়ত বা কতই বকুনী শুনিব। প্রথম যেদিন হিষ্টিরিক ফিট সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখি, সে দিন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আপনার প্রবন্ধ দ্বারা অতি সত্বরই একখানা লেপ

প্রস্তুত হইবে"। প্রথমতঃ তাহার কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি নাই, পরে আরও একটুকু বিশদভাবে বলিলেন যে, "পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়গণ ইহা পাঠ করিয়া, এমন করিয়া তুলা ধুনিবেন যে, এ বৎসরে আর লেপ খরিদ করিতে হইবে না।" যাহা হউক ভয়ে সঙ্কোচে প্রবন্ধ প্রকাশিতও হইল। কিন্তু যে ভয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম তাহার কিছুই হইল না; বরং মাঝে মাঝে সহানুভূতিই পাইতেছি।

প্রায় ৬ বৎসর হইল আমি এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী হিষ্টিরিয়া চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইহার ভিতরে শতকরা ৭৫ জনই ভূতাবিষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। এই কয় বৎসরে প্রায় ০০ শত রোগী এবং ভূতাবিষ্ট আমাদের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া সম্যক্ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। যে সমুদায় রোগী ভূতাবিষ্টা নহেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রদরাদি জরায়ু ঘটিত রোগী। বাদ বাকী রোগিগণের মধ্যে কেহও বা ভয় পাইয়া কেহও বা মস্তিষ্ক বিকৃতি হইতে হিষ্টিরিয়া আক্রান্ত হইতেছেন। যে সমুদায় অবস্থার কথা লেখা হইল, ইহার চিকিৎসা খুব সহজ অর্থাৎ অল্প সময়সাপেক্ষ; কিন্তু যাহারা বাতব্যাধি হইতে হিষ্টিরিয়ার অনুরূপ ফিট সহ্য করিতেছেন, তাহারা একটুকু না ভোগাইয়া আরোগ্য হইতে চাহেন না। আমরা যে গুরুর অনুগ্রহে এ বিদ্যার কতক অধিকারী হইয়াছি, ক্রমে ক্রমে তিনি এই সব রোগ চিকিৎসাও রীতিমত শিক্ষা দিয়াছেন।

যাহা হউক, যাহার জন্য এত কথার অবতারণা সে রোগিণীর কথা বলা যাউক। এ রোগিণী অথবা আবিষ্টা কোন গবর্ণমেণ্ট আফিসের উদ্ধতন কর্ম্মচারীর একমাত্র কন্যা। হিষ্টিরিয়ার সংবাদ পাইয়া আবিষ্টার ভ্রাতা তাহাকে তাহার স্বামীর বাড়ী হইতে পিতার চাকুরী স্থানে লইয়া যাইবার পথে চাঁদপুর তাঁহার এক আত্মীয়ের বাসাতে অপেক্ষা

করেন। সেই সময়েই তাঁহার যে ফিট তাহা অবলম্বন করিয়াই এই প্রবন্ধের অবতারণা। ক্রমে সময়ান্তরে ও স্থানান্তরে তাহার অনেকবারই ফিট অথবা ভূতাবেশ হয়। তাহার যে কয়েকটী আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ক্রমে ক্রমে সে সকলই প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই আবিষ্টার আবেশ সমূহ এতই আশ্চর্য্য ও গুপ্ত রহস্যে পরিপূর্ণ যে, আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে কেহ বিস্মিত বা অভিভূত না হইয়া পারিতেন না।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, উহা আমাদের প্রেততত্ত্ব আলোচনার প্রথম অবস্থা। তখন এ বিষয়ে বিশেষ কোনও জ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই। কাজেই কুণ্ডলী না করিয়া এবং যাতনা না দিয়া প্রকৃতই আত্মার আগমন হইয়াছে কি না, বুঝিতে পারিতাম না। সুতরাং রোগিণীর সম্মুখীন হইয়াই কুণ্ডলী করিলাম, কিন্তু তখন রোগিণী এমন কোনও ভাবই প্রকাশ করিলেন না যে, আত্মার আবির্ভাব তাহাতে বুঝিতে পারি। কাজেই একটুকু যাতনা দিতেই বাধ্য হইলাম। ২।৪ মিনিট যাতনা দিবার পর আবিষ্টা এমন একটা ভাব প্রকাশ করিতেছিলেন যে, যেন তিনি জলে ডুবিয়া গিয়াছেন এবং নিশ্বাস লইতে যাইয়াই জলপান করিতেছেন, আর সম্মুখে যাহা পাইতেছেন তাহা অবলম্বন করিয়াই উপরে উঠিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

এই অবস্থাটি দেখিয়াই আমার বিশ্বাস হইল যে, ইহা নিশ্চয়ই এমন কোনও মানুষের আত্মা হইবে, যিনি জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন, এবং অপর মনুষ্য দেহে প্রবিষ্ট হইতেই তাহার সেই অন্তিম স্মৃতিটি জাগিয়া উঠিয়াছে। আর সেই স্মৃতির তাড়নায় বাধ্য হইয়াই তিনি এইরূপ ভাবে ছট্‌ফট্ করিয়া ক্লান্ত হইতেছেন। ক্রমে আবিষ্টার মুখেই আনুপূর্ব্বিক সংবাদ পাইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, আমার অনুমান মিথ্যা নহে।

প্রঃ। তুমি কে?

উঃ। আমি আবার কে, আমি মানুষ—আমি—

প্রঃ। তুমি মানুষ নও, তুমি ভূত, তোমার নাম কি বল? নতুবা তোমায় খুব যাতনা দিব।

উঃ। তুই কে যে, আমায় কষ্ট দিবি। আমি মানুষ, এই যে আমার দাদা ব'সে আছেন। দাদা! দাদা! তুমি আমায় ধর, এ লোকটা আমায় মারবে। একে ঘর থেকে বে'র ক'রে দাও।

প্রঃ। সব কথা খুলে না বল্লে, তোকে ছাড়ব না, আর খুব কষ্ট দিব।

উঃ। দেখ্ তোর ভাল হবে না। আমায় কষ্ট দিলে তোর সর্ব্বনাশ করব।

প্রঃ। তোমার সাধ্য থাকৃলে এতক্ষণ বসে থাকৃতে না, বল তুমি কে?

নাম ধাম জানিবার জন্য নানারূপে প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, কিন্তু একথা সেকথা বলিয়া কেবল সময় নষ্ট করা ভিন্ন অন্য কোনও ফল পাইলাম না। ফল হইতেছে না দেখিয়া আবার কতকক্ষণ যাতনা দিতেই তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

উঃ। আমি প্রিয়বালা।

প্রঃ। তুমি কি এর (আবিষ্টার) কোন আত্মীয়?

উঃ। হাঁ এর বোন্।

প্রঃ। কেমন ক'রে তুমি মরেছিলে?

উঃ। জলে ডুবে।

তখন আবিষ্টার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত—মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহারই একটী দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। তখন পর্য্যন্ত আবিষ্টা জন্মও গ্রহণ করেন নাই। আবিষ্টার ভ্রাতা * * * গবর্ণমেণ্ট আপিসে চাকুরী করেন।

প্রঃ। কেমন ক'রে তুমি জলে ডুবে মর!

উঃ। আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন একদিন আমার মাসিকে একটুকু জল দিতে বলি। তখন তিনি বল্লেন, আমার হাতে কাজ আছে, তুই নিয়ে যা। আমি ঘর থে'কে জল না খেয়ে, বরাবর মাঠে যেয়ে যেই জল খাবার জন্য হাত বাড়িয়েছি, অমনি আমার পেছন থে'কে কে যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিলে। আমি মাকে বাবাকে কত ডাক্‌লুম, কিন্তু কেউ আমার কথা শুন্‌লে না। এখন আমি জলে ডু'বে ম'রে ভূত হ'য়ে আছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

কপাল

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।)

সেও ঠিক এমনি সময়ে, এই শরতকালে, এই আশ্বিন মাসে! বর্ষার বর্ষণক্লান্ত আকাশ নীল হইতে ক্রমশঃ গাঢ় নীল হইতেছিল। আর্দ্র বাতাস 'মনের কথা জাগানো' কি একটা উদাস ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল! জ্যোৎস্না দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। ঠিক এই সময়ে আমার জীবনে যে ঘটনাটী ঘটিয়াছিল তাহা আজ অতীতের বহু সুদূরে হইলেও তাহার স্মৃতি যেন দিন দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। সেই দুটী দিনের ঘটনা আমার জীবনের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—এজীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না। পূজা উপলক্ষে গৃহিণী ঠাকুরাণী পিত্রালয়ে গিয়াছেন। তাঁহার সে পিত্রালয়টী সুদূর যশোহর জেলার এক অখ্যাতনামা পল্লিগ্রামে।

সারাদিনটা অফিসের কাজে, সাহেবের তাগাদায়, পরের হিসাবে জলের মত কাটিয়া যাইত। কিন্তু রাত্রি আর কাটিতে চাহিত না। এক এক দিন অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রাভঙ্গে মনে হইত পৃথিবী যেন রসাতলে গিয়াছে, সূর্য্যদেব আর উঠিবেন না, এ কাল রাত্রি আর যেন পোহাইবে না। মনকে নিবিষ্ট রাখিবার জন্য কত কি পুস্তক পাঠ করিতাম। শুনিয়াছিলাম যোগে মনকে বশীভূত করা যায়। দুর্দ্দমনীয় বন্যমন-মাতঙ্গকে শিক্ষিত হস্তীর মত "উঠ বোস্" করান যায়। তাই এক একদিন সুদুষ্কর কাজে, পায়ের উপর পা তুলিয়া—আকাট সোজা হইয়া বসিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিতাম! এই নিঃশ্বাসই ত যত নষ্টের গুরুঠাকুর। যাহা হউক তাহাতে মনকে যে কতদূর বশ করিতে পারিয়াছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু এক একদিন প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে খাঁচা ছাড়িবার চেষ্টা করিতেন। কখন বেদান্ত আলোচনা করিয়া বুঝিতাম—এ সংসার অসার—মায়া – কেবল মায়া। কে কার? আমিই আমার নয়। পৃথিবীর সকলই নাম আর রূপ। নাম রূপ বাদ দিলে এত সাধের ধরা শূন্য হইয়া আকাশে মিলাইয়া যায়। এ আফিস, এ গোলমাল, জীবন লইয়া এই সহস্র কাজে টানা ছেড়া, এই বিরহবিদগ্ধ প্রাণ, কিছুই থাকে না। কেবল অব্যক্ত ব্রহ্ম—অদ্বিতীয় নিঃসঙ্গ, নির্গুণ, অরূপ ব্রহ্ম কি জানি কোন প্রয়োজনে একাকী হা হা করিতে থাকেন। এক একদিন দিন বেশ কাটিয়া যাইত। দেহ মাটী—মাটী দেহ! কেবল প্রাণ নামক একটা মায়া পাঁচটা ভূতকে লইয়া সারা জগতময় হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি করিতেছে! শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ বলিয়া যে কেহ আছে সেটা ভুল, ভুল, মস্ত ভুল। যে দ্রষ্টা, সেই দর্শন, সেই দৃক্‌শক্তি! তবে কিসের জন্য এত মাথা কুটাকুটি।

বলিয়া রাখি সংসারে আমার সবে ধন নীলমণি, অন্ধের নড়ি, কানার

একটী চক্ষু; সবের সকল, সকলের সব যা কিন্তু ঐ একটী মাত্র কুটুম্বিনী। আমার স্ত্রীরত্নটুকুর রূপের ব্যাখ্যা করিয়া আর পাঠক পাঠিকাকে হাসাইতে ইচ্ছা নাই। আজকাল বাঙ্গলার নভেল নাটকে যেরূপ রূপ বর্ণনার ছড়াছড়ি তাহাতে যে সে বেচারী আমার এ ক্ষুদ্র গল্পের নায়িকা হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে, সত্য কথা বলিতে কি, সে বিশ্বাস আমার নাই। হয়ত তিনি শুনিলে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিবেন, কিন্তু আমি সত্য কথা বলিতে বসিয়া কাহার খাতির রাখিতে পারিব না। তাঁহার বিমলার মত বাক্‌চাতুর্য্য, আয়েসা তিলোত্তমার মত রূপ, সূর্য্যমুখীর স্বামি-প্রেম, ভ্রমরের মত অভিমান কিছুই নাই, তবে কোন্ লজ্জায় আমি তাঁহাকে প্রকাশ করিব। তাঁহার নাসিকা বাঁশীর মতও নহে, গরুড়-গঞ্জনও নহে, অথবা "তিলফুল জিনি"ও নহে। বর্ণ চম্পকগৌর বলা মিথ্যা। তাঁহার নয়ন দেখিয়া কোন দিন আমার চঞ্চলা হরিণী অথবা চকিতা খঞ্জনার কথা মনে হয় নাই, কিংবা তাঁহাকে চলিতে দেখিয়া করিণী বলিয়াও ভ্রম হয় নাই! আমি তাহাকে দেখিয়া বলিতাম,—তুমি যেন ঠিক নাতিদীর্ঘ নাতি হ্রস্ব, সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট, শ্যামায়মান, অফলন্ত কলা গাছটী। সে হাসিয়া একদিন বলিয়াছিল "যে যার ভক্ত, তার সেই কথাই মনে পড়ে।" সেই একদিন মাত্র আমি তাহার কাছে হার মানিয়াছিলাম। তবে তার গুণ ছিল,—সে নভেল পড়িতে জানিত না, সূচীকর্ম্ম জানিত না, নানান ফ্যাসানে চুল বাঁধিতে জানিত না, আরও এখনকার কালের কত কি জানিত না—তবু তার গুণ ছিল। সেই চৌদ্দ বৎসরের বালিকা এ গরীবের সংসারে সমস্ত কাজ কর্ম্ম একাকী করিত। রন্ধনে দ্রৌপদী না হইলেও ব্যঞ্জনে নুন ঝাল ঠিক সমান দিত! কোন দিন তার সাজা পানে চূন কম হইতে দেখি নাই। অফিস থেকে যখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অবসন্ন দেহে, বিকৃত মস্তিষ্কে বাসায় ফিরিয়া আসিতাম, সে সেই ক্ষুদ্র

হাতের ক্ষুদ্র সেবায় তার বেসুরা যন্ত্রটীকে এক সুরে বান্ধিয়া দিত। তবে সে কোন দিন জলখাবারের জন্য খাজা গজা, মিহিদানা বা সীতাভোগ রাখিত না এবং আমিও কোন দিন তা'র মুখ দেখিয়া খাইতে ভুলিয়া যাইতাম না। মায়ের মত সেবা, ভগ্নীর প্রীতি, ভার্য্যার কোমলতা সবই তাহাতে ছিল, তবু যেন একটা কি ছিল না। সে বড় বেশী কথা কহিতে ভাল বাসিত না। আর লেখাপড়া শিখিতে একবারে নারাজ ছিল, সেইটাই আমার অসন্তোষের একটা মস্ত কারণ। সে লেখাপড়া অল্পই জানিত! মাঝে মাঝে পত্রও লিখিত। কিন্তু আজকালের দিনে সে গুলাকে পত্র বলাও বিড়ম্বনা! তাহাতে "প্রাণেশ্বর", "জীবিতেশ্বর" "হৃদয়সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি মধুমাখা অমৃত সেঁচা কথাগুলি একটীও থাকিত না; প্রেমপত্রের পদ্য ত তাহাতে থাকিতই না। গদ্যও নিছাক্ প্রথম ভাগের "গোপাল বড় সুবোধ বালকের" মত পদ্য! তাহাতে কি আর এখনকার দিনে মন উঠে। আর কখন তাহার পত্র পড়িয়া বুঝিতে পারি নাই, সে আমার বিরহে বাণবিদ্ধা কুরঙ্গিণীর মত ছট্‌ফট্ করিতেছে; অথবা পিঞ্জরাবদ্ধ বিড়ালীর মত হাঁচড় পাঁচড় করিতেছে। ভালবাসা হয় কিসে? যখন কোন ঘন ঘোর বর্ষার দিনে মেঘদূতখানি টানিয়া তাহাকে নিকটে বসাইয়া ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতাম, সে একদিনও মন দিয়া শুনিত না; আরও কি না বলিত "ও ছাই পড়ে কি হবে?" "কি মুখ গুজে বসে আছ, অসুখ কর্ব্বে যে" বলিয়া যখন সে আমাকে কুমার-সম্ভবের একাদশ সর্গ থেকে বিচ্যুত করিত, তখন রাগে সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিত। আমি ভাবিতাম "বই ভাল না বউ ভাল।" যখন গম্ভীর ভাবে তাহাকে শরীরস্থ পঞ্চকোষের কথা বুঝাইয়া দিতাম—অন্নময়ের মধ্যে মনোময়, তার মধ্যে প্রাণময়, তার মধ্যে বিজ্ঞানময়—তখন সে বলিয়া উঠিত "আমাদের বাগানে একটী কাঁটাল গাছ আছে, বল্লে বিশ্বাস যাবে

না—তার কোষ এই এত বড় বড়।" শুনিয়া আমার আনন্দময় কোষে নিরানন্দে ডুবিয়া যাইত। যখন মেস্‌মেরিজম্ শিক্ষার জন্য আর কাহাকে না পেয়ে তাহাকেই Subject সাব্যস্ত করিলাম, তখন কিছুতেই তাহাকে এক স্থানে বসাইতে পারিলাম না! এ দুঃখ কি বলিবার! তার বিনয়, নম্রতা, কর্ম্মপটুতা, নীরব সেবা—যত গুণই থাক্, আচ্ছা তোমরাই বল তাহাকে কি ভালবাসা যায়! তবু আমি তাহাকে ভালবাসিতাম! কিন্তু সে কথা সে চক্ষের সমক্ষে থাকিলে কোন দিন বুঝিতে পারি নাই, বা তাহাকে বুঝাইতেও পারি নাই! এ জগৎ যে কি রহস্যময়!

এত যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম সত্ত্বেও, এত ধরা বান্ধা করিয়াও সময় সময় মন এমন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত যে, তাহাকে সামলান আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। ধ্যান ধারণায় আর কুলাইত না; বেগতিক দেখিয়া বেদান্ত তাঁহার মায়াবাদ লইয়া সরিয়া পড়িতেন। ক্যাণ্ট আর মস্তিষ্কে ঢুকিতে সাহস করিতেন না! কেবল হেগেল আর সাংখ্য বিজয়ী সৈন্যের মত জয় জয়কার করিয়া উঠিত। একজন অন্ধ আর একজন খঞ্জ। মনে হইত যেন খঞ্জ প্রকৃতই অন্ধ পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়া তাহাকে পৃথিবীময় ঘোড়দৌড় করাইতেছে। সংসার কিছুই নয়, কিন্তু তবু ঐ কিছুনয়ের ভিতর এমন একটা কি আছে—সেটী ধরা ছোঁয়া দেয় না—দূরে দূরে থাকিয়া মানুষকে লইয়া কত রঙ্গই করে। এ রহস্য মানুষ মনুষ্য-জন্মের শৈশব হইতে খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু আজও 'যে তিমিরে সেই তিমিরে।'

যাহা হউক, আমার যে অবস্থা তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। ইহাতে যদি তোমরা আমাকে স্ত্রৈণ বলিয়া সাব্যস্ত কর, সে অপবাদ আমি সহ্য করিতে রাজি আছি। এ সংসারে যার ভার্য্যাই স্ত্রী, মাতা, ভগ্নী, কন্যা সকলের স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহাকে স্ত্রৈণ বলা

যুক্তিসঙ্গত কি না, যিনি বলিবেন তিনি অবশ্য বুঝিয়াই বলিবেন। কিন্তু আমার জীবনে সুখ ছিল না। ইহার কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাই নাই! দুঃখও যে বিশেষ কিছু ছিল, তাহাও বুঝিতে পারিতাম না। তবুও দুঃস্বপ্নের মত আমার জীবনের উপর কি একটা দারুণ দৈত্য সারাজীবন ধরিয়া প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল! কি এক অব্যক্ত নিদারুণ মর্ম্মন্তুদ বেদনায় বুকের ভিতর যেন কি একটা হাহাকার করিয়া উঠিত। যেন পৃথিবীর কোন প্রান্তে কে আমার জন্য চুল ছিঁড়িয়া, বক্ষ চাপড়াইয়া, উলটিপালটি করিয়া কান্দিতেছে—তাহারই অব্যক্ত সুকরুণ কণ্ঠ-মূর্চ্ছনা বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া আমার কাণে আঘাত করিত! কে যেন তাহার প্রাণপণ শক্তিতে আমার হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রী ধরিয়া টান দিত আর বক্ষ ফাটিয়া যাইত, নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইত। আমি আজন্ম এমনই একটা রহস্যময় রোগে ভুগিতেছি! আরও রহস্যের কথা, যতদিন কলিকাতায় ছিলাম, এই ব্যাধি ব্যাধের মত সদাসর্ব্বদা আমাকে যেন সংসার অরণ্যে তাড়াইয়া বেড়াইত! বিশেষতঃ সকালে যেমন ঘুম ভাঙ্গিত আর মনে হইত আমার বক্ষ যেন চিরিয়া দুই খণ্ড হইয়া গিয়াছে আর কোথা হইতে পৌষের রজনী শেষের মত বরফ শীতল একটা নিদারুণ কন্‌কনে হাওয়া হুহু করিয়া আমার হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। আমি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া যাইতাম। মনে হইত বুঝি বা পাগল হইয়া যাইব। এই কষ্টের তাড়নায় আমি কলিকাতা ছাড়িতে বাধ্য হইলাম। কলিকাতার সুদূর উত্তরে একস্থানে চাকরী যোগাড় করিয়া একদিন অকস্মাৎ আমার জিনিসপত্র লইয়া ভাসিয়া পড়িলাম। বন্ধুজনে মনে করিল, আমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে আর নয় এমন চাকরীও ছাড়ে। যে দেশে এখন আমার বাসস্থান, তাহার নামের কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। যদি দরকার

বোধ হয়, বুদ্ধিমান্ পাঠক পছন্দ মত তাহার একটী নামকরণ করিয়া লইবেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এখানে আসিয়া অনেকটা সুস্থ হইলাম বটে, কিন্তু একদিনের তরেও সেই ভয়ঙ্কর ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই। অবসর পাইলেই সে তাহার স্বভাবসিদ্ধ জ্বালা যন্ত্রণা লইয়া বুকের মাঝে উঁকিঝুঁকি মারিত। কিন্তু মাণি নিকটে থাকিলে কিছু সুস্থ বোধ করিতাম। সেই জন্য সাধ্য পক্ষে তাহাকে পাঠাইতে চাহিতাম না! সেবার বড় পীড়াপীড়িতে পাঠাইতে বাধ্য হইয়া ছিলাম। আমার স্ত্রীরত্ন টুকুর নাম বলিয়া আর পাঠক পাঠিকাগণকে হাসাইতে চাহি না। আজকালকার কালে সে নামে কোন গৃহস্থবৃন্দকে ডাকা একটা বিষম উপহাস। এই নাটক নভেল ছড়াছড়ির কালে, এই সভ্যতা-জ্ঞানালোকপূর্ণ বিংশ শতাব্দীতে সে যে কেমন করিয়া সে নামটী সংগ্রহ করিয়াছিল, ইহাও আমার কাছে এক দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা। যাহা হউক, বিধাতার ভুল অনেকটা সংশোধন করিয়া লইয়া কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মত তাহাকে আমি মাণি বলিয়া ডাকিতাম। কারণ তাহার চরিত্রে ঐ জিনিসটার অত্যন্তাভাব ছিল। সেই মাণির অভাবে যদিও আমার সপ্তাহের দিনগুলা এক রকমে কাটিয়া যাইত, কিন্তু তখনকার সেই পোড়া রবিবারগুলা আর কিছুতেই কাটিতে চাহিত না! যেন আমাকে জ্বালাইবার জন্য মতলব করিয়া পৃথিবীকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিত। যে রবিবার তোমাদের পরমারাধ্য পরম সুখের—সত্য কথা বলিতে কি, একদিন আমারও আকাঙ্ক্ষার দিন ছিল, সেই কালস্বরূপে আমার বুকের রক্ত শোষণ করিত। দিন আর কাটিত না। মনে করিতাম বুঝি সূর্য্যদেব অস্তাচলে যাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন! রবিবার কি ভগবানের "মেলডে" নাকি? কিন্তু সূর্য্যদেব কোন দিন সেরূপ ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া স্মরণ হয় না। আর করিলেও সে কথা আর

আমাকে লিখিতে হইত না। সংসারে ভাল মন্দ বলিয়া কিছুই নাই। একই জিনিস সময়, অবস্থা, পাত্রভেদে স্বর্গসুখের জনক, আবার নরকাগ্নির চেয়ে বিভীষণ! হায়! জগৎ রহস্য।

আমার লেখার ভঙ্গিতে যদি কেহ মনে করিয়া বসেন, আমি আফ্রিকা অঞ্চলে তরুগুল্মশূন্য, বারিবিহীন, জনপ্রাণিরহিত নীরস শুষ্ক বালুকাময় সাহারার কোন স্থানে বাস করিতাম, তবে তিনি যে নিতান্তই ভুল বুঝিয়াছেন, তাহা মনে করি না। কারণ আমার হৃদয়দেশটা অনেকটা সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল বটে। স্থানের অবস্থা আদৌ সেরূপ নহে। প্রথমতঃ বাস করিতাম লোকালয়ে। আমার মত সুখ-দুঃখপূর্ণ জীবন লইয়া অনেকগুলি মানুষ আশপাশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। দোষের মধ্যে তাহাদের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র মনের যোগ বা সম্বন্ধ ছিল না। সকলেই যেন দূরে দূরে অপরিচিত অবস্থায়। চারিদিকে আম, লিচু, কাঁটাল প্রভৃতি গ্রাম্য বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল; এমন কি আমার আঙ্গিনায় একটা পেয়ারা গাছ, একটা পেঁপে গাছ, দু' চারিটা ফুলেরও গাছ ছিল! গৃহও জনপ্রাণী শূন্য ছিল না। ঘরে মাকড়সা, পিঁপড়া, দু' তিনটী টিকটিকি, বারান্দায় একটী বৃদ্ধ ভেক, আর একটি প্রৌঢ় ছুছুন্দর প্রভৃতি অনেকগুলি প্রাণী বাস করিত। তা' ছাড়া আর একটী জনও ছিল। সে আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য গুলজার! আমি তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসি। ভৃত্য হইলেও একদিনও তাহাকে আমি-হেম-বাবুর নকর বলিয়া মনে করি নাই! তাহার সঙ্গে অনেকটা ভায়ের মত ব্যবহার করিতাম! সে তাহার দেশের গল্প, গৃহস্থির গল্প, কত কথা উপকথায় আমার উদাস সন্ধ্যা কাটাইয়া দিত! সে যখন আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে, স্নেহমাখা সুরে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিত "বাব্ হু আপ হামারা বাপ মাতারি হ্যায়।" তখন বাস্তবিক আমার হৃদয়টা যেন

কেমন হইয়া যাইত। আমি বলিতাম "কুছ্ ডর নেহি, তোম্ হামারা ভাইয়া হ্যায়, হামারা ছেলিয়ামেইয়া হ্যায়।" সে বলিত "ঠিক—ঠিক"। এইরূপ সৃষ্টিছাড়া সম্বন্ধ পাতাইয়া উভয়ে উভয়ের হৃদয়ভাব বুঝিতে, সেই নির্জ্জন সন্ধ্যায় সেই রোয়াকটীতে বসিয়া স্নেহের বিনিময় করিতে কিছুমাত্র বাধা ঠেকিত না।

সে কথা আজও বেশ মনে আছে। ভুলিবার চেষ্টা করিলেও ভুলিতে পারি না। আমার সমস্ত স্মৃতি রাজ্যটী জুড়িয়া পরাক্রান্ত মহাবলবান্ বিদেশীর মত চাপিয়া বসিয়া আছে! যখনই নির্জ্জন পায়, শত বাহু বাড়াইয়া আমার জীবনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। সেদিন রবিবার। সারাদিন খুটিনাটি করিয়া কাটাইলাম; রাত্রিতে আমার জীবনসঙ্গী তক্তপোসের উপর শিথিল অঙ্গ ছড়াইয়া দিয়া কি একখানি বহি পড়িতেছি! দেওয়ালের গায় ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করিয়া সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ ঘরে এক শব্দ-প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছে। চারিদিকের কোলাহল মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। কচিৎ কোন কুকুরের চিৎকার অথবা কোন গৃহস্থ-শিশুর নিদ্রাবিজড়িত ক্রন্দন শব্দ শুনা যাইতেছিল। আমি পাতার পর পাতা উল্‌টাইয়া যাইতেছিলাম; কিন্তু পুস্তকখানির মর্ম্ম অথবা কোনরূপ ভাব আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছিল না। এইরূপে কখন যে নিদ্রাদেবী তাঁহার পরিত্যক্ত সন্তানকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন, কিছুই জানিতে পারি নাই। নিদ্রা আর মৃত্যু একই পিতা মাতার কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ সন্তান। জগতের দ্বৈতভাব ঘুচে এক নিদ্রায় আর বোধ হয় মরণে। জীবন থাকিতে সহস্র চেষ্টায় অদ্বৈতভাব হৃদয়ে ফুটে না। নিদ্রায় স্বপ্ন আছে—মরণে কি আছে কে বলিতে পারে? অদ্বৈতবাদিন্ যতই দ্বৈতের দোষ দাও, ওসব কেবল মুখের কথা। "আমি" থাকিতে দ্বৈত যায় না। ঘড়ির ঠং ঠং শব্দে যখন আমার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন উন্মুক্ত

দ্বারপথে অন্ধকারমাখা জ্যোৎস্না আসিয়া সকল ঘরে ছড়াইয়া রহিয়াছে। আলো কখন নিবিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিলাম। তখন রাত্রি ঠিক্ বারটা। অনেক ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ির পর, কত ঘর পার হইয়া ঘড়ির দুইটী কাঁটা একত্রিত হইয়া মিশিয়াছে। বাহিরে চাহিয়া দেখি নীলাকাশে চাঁদ হাসিয়া হাসিয়া ভাসিয়া চলিতেছে! সুপ্ত পৃথিবী নীরব—নিথর। কিন্তু বাহিরের দরজাও ঘরের মত সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। তবে কি গৃহে চোর প্রবেশ করিয়াছিল! আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি আপন হাতে দুই দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছি। আলোক লইয়া গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, কিন্তু একটী সামান্য দ্রব্যও স্থানচ্যুত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু গা ছমছম্ করিতে লাগিল। ঘরের ভিতর যেন কাহার মৃদু উষ্ণশ্বাস আমার কানে আসিতে লাগিল। যেন কাহার কাপড়ের খস্‌খস্ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। বিংশ শতাব্দির ইংরাজী-শিক্ষিত আমি—আমি ভূত, প্রেত, পরলোক এমন কি আত্মা পর্য্যন্ত মানি না। আমার শারীরিক বল সেরূপ না থাকিলেও অদম্য মানসিক বলে বলীয়ান্ আমার মনে ভয় বলিয়া কোন জিনিষের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি—ভয়ে মানুষের চুল খাড়া হইয়া উঠা যদি বিজ্ঞান-সম্মত হয়, তবে সে দিন শ্রেণীবদ্ধ সৈনিকের সঙ্গীনের মত আমার চুল সোজা হইয়া উঠিয়াছিল।

কেন যে এত ভীত হইতেছিলাম, অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়াও ইহার কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হইলাম না। মনে হইতে লাগিল যেন একটা অশরীরী আকাশচারী ভয় উন্মুক্ত দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া ঘরে কোথায় লুকাইয়া আছে, এখনি তাহার বিকট আত্মমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। তাহা হইলেও বাঁচিতাম। অতি ভীষণ প্রত্যক্ষ হইতে অজানিত সন্দেহ মানুষের মনকে অধিক বিচলিত করে। পৃথিবী-

বিজয়ী বীর—রণাঙ্গন যাঁহার শয্যা, দুঃখ কষ্ট যাঁহার অঙ্গের আভরণ, মৃত্যু যাঁহার খেলার জিনিস, তিনিও নাকি কোন অলৌকিক কার্য্য দেখিলে ভয়ে আত্মবিস্মৃত হন। আমি যাহা হয় একটা কিছু দেখিতে পাইলে কতক নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া কিসের জন্য অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কোন সুন্দর বা কুৎসিত পরলোকনিবাসী আমার সমক্ষে উপস্থিত হইল না, আমার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য কোন অলৌকিক অতীন্দ্রিয় ঘটনা আমার সমক্ষে ঘটিল না। ভৃত্য নাসিকাধ্বনি সহকারে বাহিরে নিদ্রা যাইতেছিল আর আমার ঘড়িটী সময়ের পদশব্দের মত তালে তালে টিক্ টিক্ করিতে করিতে মিনিটের পর মিনিট পার হইতে ছিল। বাহিরের জগৎ নীরব—নিস্তব্ধ। আমার হৃদয়ও চিন্তাশূন্য নিথর নিস্তরঙ্গ।

অনেক ডাকাডাকির পর ভৃত্যটীকে জাগাইলাম, সে তাহার ঘুমবিজড়িত কণ্ঠে যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে আমিই দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সে বাহিরে থাকিতে স্বয়ং যমও আমার ঘরে আসিতে ইতস্ততঃ করিবে। কোন ভয়ের কারণ নাই, অতএব পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা যাওয়াই এখনকার কর্ত্তব্য। এই অমূল্য উপদেশ দিয়া সে তাহার আরব্ধ কার্য্যে পুনরায় মনঃসংযোগ করিল। কিন্তু বহুদিনবিস্মৃত স্বপ্নের মত আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন কাহার সঙ্কেতে নিজের হাতে দরজা খুলিয়াছি। কিন্তু সে স্মৃতি কুয়াসাঢাকা ঊষার মত অতি ক্ষীণ, অতি-অস্পষ্ট। তবে কি আমার স্মৃতি আজ আমাকে প্রতারণা করিতেছে? বাল্যকাল হইতে আমার স্মৃতিশক্তি অতিশয় প্রখরা ছিল। আমার এ কথার প্রমাণের জন্য এখনও আমি আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকগণকে সাক্ষী দেওয়াইতে পারি। তবে কি আমার মতিভ্রম? আমাদের

ইংরাজীশিক্ষা-পরিষ্কৃত মতির কথনই ভ্রম হইতে পারে না। অসম্ভব। নেপোলিয়ান বলিয়াছেন, "জগতে অসম্ভব বলিয়া কোন কথা নাই"; "কিন্তু তাহা অন্য হিসাবে। "হাঁ" আর "না" এই দুই শক্তির সংঘাতে এ জড় জগৎ,—জগতের রূপ, রূপান্তর। এই "হাঁ" ও "না" একত্র মিশিলে কি হয় তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ভেদ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইতে না পারিলে, সে কথা বলা যায় না। জগতে মানুষের অসাধ্য কাজ আছে। মানুষ একই সময়ে এক সঙ্গে বসিয়া থাকিতে এবং চলিতে পারে না, কথা কহিতে এবং চুপ করিয়া থাকিতে পারে না—এইরূপ কতকগুলি অসম্ভব আছে। আর অসম্ভব-ইংরাজীশিক্ষিত, উর্ব্বর-মস্তিষ্কশালী আমাদের প্রত্যক্ষের অপলাপ, মতির ভ্রম, স্মৃতির বিভ্রম। দেখুন পাঠক, আমি কতদূর আত্মশক্তিবিশ্বাসী স্বাধীনমতপ্রিয়, সরলমনা লোক। আর আমার জ্ঞানের বোঝা আপনাদের কাহার অপেক্ষা যে কম ছিল ইহা আমি আদৌ মানি না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, ইহারভিতর আমার ভুলের কোন কৃতিত্ব আছে? তবে একি!

মনে হইল কেহ কি আমার ঘরে লুকাইয়াছিল? আমার নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাতসারে দরজা খুলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান্ কি উদ্দেশ্যে এ গরীবের ঘরে তাহার পদধূলি দিবে? আমার সম্পত্তি ত আর কাহার অবিদিত নাই? আর যদি সেই মহৎ কাজই তাহার উদ্দেশ্য ছিল—তবে কিছুই লয় নাই কেন? জগতে আমার কেহ শত্রু আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস,—একটুকু বিশ্বাসও নাই। যে আমার প্রাণ লইতে বা কোনরূপ প্রতিহিংসা সাধন করিতে আসিবে। আমি চিরদিনই জগতে নিরপেক্ষ উদাসীন, নির্জ্জনতাপ্রিয়, অল্পভাষী। সম্বলের মধ্যে আমার পরিষ্কৃত হইলেও বহুদিনের জীর্ণ অফিসের পোষাক, কতকগুলি

বহি আর আমার নিদারুণ চিন্তা, হৃদয়ের অব্যক্ত কাতর ক্রন্দন, ইহা লইতে আর কোন্ বুদ্ধিমান্ তাহার অমূল্য সময় নষ্ট করিতে আসিবে? কোন মীমাংসাই যুক্তিশাস্ত্রে খুঁজিয়া পাইলাম না, বিজ্ঞানও এ ক্ষেত্রে কোনরূপ কার্য্যকারী হইবে বলিয়া বোধ হইল না। কাজেই আমিও বুদ্ধিমানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমার বিরামদায়িনী, বহুদিনপালিনী সেই বিছানাটীর কোলে গা ঢালিয়া দিয়া শয়ন করাই এখনকার যুক্তি বলিয়া সাব্যস্ত করিলাম।

যেমন ইচ্ছা, অমনি কাজ! বিশেষ সাবধানতা সহকারে দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া, শয়ন করিলাম। আলোকাধারটী দপ্ দপ্ করিয়া সমস্ত গৃহ আলো করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কখন পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছি ঠিক্ স্মরণ নাই। কিন্তু স্বপ্নঘোরে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, কে যেন আমার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দ্রুত এবং উষ্ণশ্বাস আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। কেবল অনাবৃত মুখখানি ব্যতীত তাহার সর্ব্বাঙ্গ একখানি শুভ্র—অতি শুভ্র জ্যোৎস্নালোকের মত চাদরে ঢাকা। সে কি মুখ, কি মুখের শ্রী,—এ জীবনে কখন সেরূপ রূপ দেখি নাই; ধ্যানলোকে, কল্পনাস্বর্গে কখন সে রূপের অস্তিত্বের সন্ধান পাই নাই। সে শুভ্র লোহিত মুখমণ্ডল হইতে কতকগুলি রশ্মিরেখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সে কৃষ্ণতারা আঁখি দুটী হইতে কত আশা বেদনা আনন্দের কোমল ভাব জাগিয়া উঠিতেছে! সে হাসি-অশ্রুমাখান অধরোষ্ঠ, সে আয়ত লোচন, সে ঘনকৃষ্ণ সুবঙ্কিম ভ্রূযুগ, সে নীলজ্যোতি বিচ্ছুরিত কুন্তলকলাপ এ জীবনে কখন কল্পনায়ও দেখি নাই। মুখের উপর রৌদ্র ও ছায়ার খেলার মত আনন্দ ও বিষাদের একটা অপূর্ব্বভাব উছলিয়া পড়িতেছে। তাহার মুখখানি ছাড়া আর কোন অঙ্গ দেখা যাইতেছিল না। কেবল মুখখানি—সেই অপ্সরারূপ-

লাঞ্ছিত মুখখানি আমার সমস্ত জ্ঞানস্মৃতি বুদ্ধি প্লাবিত করিয়া যেন পূর্ণ-চন্দ্রের মত হাসিতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মনে কোনরূপ ভয় বা বিস্ময়ের সঞ্চার হইল না! মনে হইতে লাগিল যেন কত জন্মের পরিচিত, যেন কতদিন কত বৎসর তাহার নিকটে নিকটে এ জীবন কাটিয়া গিয়াছে। তথাপি সে যে কে, এ কথা ঠিক্ স্মৃতিপথে আসিতে ছিল না। মানুষের এইরূপ হয়—সময় সময় এক এক খানি মুখ দেখিয়া ঠিক্ মনের ভিতর চিনি চিনি, চিনি না; জানি জানি জানি না তবু পরিচিত—কত জন্মের পরিচিত বলে মনে হয়—কেন হয়, মানুষ তাহা জানে না!

ধীরে ধীরে একখানি হস্তোত্তোলন করিয়া সে অভূতপূর্ব্বা অনন্যদৃষ্টা দেবী আমার ললাটে প্রদান করিল। সে হস্ত কি শুভ্র; সে স্পর্শ কি শীতল, কি প্রাণারাম! যেমন করিয়া দক্ষিণ বাতাসে গোলাপের পাঁপড়িগুলি কম্পিত হয়, ঠিক্ তেমনি করিয়া তাহার ওষ্ঠপুট ধীরে অতি ধীরে নড়িয়া উঠিল; আমাকে বলিল—"আপনি কি ভয় পাইয়াছেন?" সে কণ্ঠস্বর কি সুন্দর, বাঁশরীলাঞ্ছিত, মানবকল্পনাতীত; যেন আমার আত্মা পর্য্যন্ত সে স্বরের কোমলতায়, মধুরতায় শান্তিময় হইয়া গেল! অনেক কষ্টে আত্মসংযম করিয়া আমি বলিলাম "তুমি কে?" সে অবনত মস্তকে ধীরকণ্ঠে উত্তর দিল "আমি—আমি—এ হতভাগিনীকে চিনিতে পারিতেছেন না—আমি আপনার স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী, দাসী।" আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল, বুকের রক্ত হিম হইয়া আসিল, তবে কি মাণি! প্রেততত্ত্ববিদেরা বলিয়া থাকেন, মৃত্যুর পর বিদেহাত্মা—এইরূপ ভাবে নাকি প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যায়। তবে কি মাণি নাই! মর্ত্ত্যজগতের খেলা অবসানে আমার একমাত্র হৃদয়ের সুখশান্তির আশ্রয় মাণি—আমার মাণি—আজ পরলোকের পথে তাহার হতভাগ্য

স্বামীকে একবার চিরদিনের জন্য দেখা দিতে আসিয়াছে! না, না, সে হইতেই পারে না! তাহাকে আর আমি চিনি না? মানুষ মরিলে মানুষের মূর্ত্তি যদি এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তবে মানুষের পক্ষে মানুষ—সে থাকা না থাকা উভয়ই সমান। মানুষ ক্ষণিকের, কিন্তু রূপ অনন্তকালস্থায়ী। ব্যক্ত আর অব্যক্ত! (ক্রমশঃ)

চিদানন্দ —

গুহামুখে।

(৩)

প্রথমে আমরা কুশাবর্ত্তঘাটে উপস্থিত হইলাম। সেস্থানে যোগিনীর আগমনের কোনও নিদর্শন বুঝিতে পারিলাম না। ঘাটের দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোনও উত্তর দিতে পারিল না। তখন এ ঘাট ওঘাট করিয়া আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে উপস্থিত হইলাম। ব্রহ্মকুণ্ডই হরিদ্বারের মধ্যে পবিত্রতম তীর্থ। এইস্থানে নদী-জলের গভীরতা ও স্রোত দুই অধিক। তীর্থযাত্রীদের সকলকেই অন্ততঃ একবার এখানে স্নান করিতে হয়।

যখন সে স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা যায় যায় হইয়াছে। হিমালয়ের অন্তরালগামী সূর্য্যের লোহিতকিরণ তাহার মুখে শেষ হাসি মাখাইয়া সমস্ত দেশটায় অন্ধকার ঢালিবার উদ্যোগ করিতেছে। সেখানেও যোগিনীকে দেখিতে পাইলাম না। তবে তীর্থ-সোপানে অবস্থিত লোক সকলের কথোপকথনে তাহার উপস্থিতির আভাব প্রাপ্ত হইলাম। অন্যদিন এই সন্ধ্যায় সাধু সন্ন্যাসিগণ এই ঘাটে আসিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি

কার্য্যে নি ক্ত থাকেন। আজ তাঁহারা নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তায় কোলাহল উত্থিত করিয়াছেন। তাঁহাদের আলাপ শুনিয়া বুঝিলাম, সকলেই যোগিনী ও তাঁহার কুক্কুর সম্বন্ধেই কথা কহিতেছেন। কেহ যোগিনীকে পাগল বলিতেছিলেন, কেহ বা তাঁহাকে উচ্চসাধিকার শ্রেণীভুক্ত করিতেছিলেন।

আমরা বুঝিলাম যোগিনী এই ঘাটে আসিয়াই মৃত কুক্কুরটাকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। নিক্ষেপ করিয়াই তিনি এ স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। সহচর যুবক বলিল—"আর কেন ভাই, চল বাসায় তোমাকে লইয়া যাই। আজ আর তাঁর দেখা মিলিবে না। ইহার পরেও যে মিলিবে, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। ভাবে বোধ হইতেছে, তিনি আমাদের মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। সেই জন্যই যত্নসহকারে তিনি আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিয়া গিয়াছেন। বাসায় চল, যদি খুঁজিবার প্রয়োজন হয়, কাল খুঁজিও।"

আমিও যোগিনীর পুনর্দ্দর্শনলাভে হতাশ হইয়াছিলাম। তবু একবার মনকে সন্তুষ্ট করিতে তাঁহার তত্ত্ব লইতে আমার অভিলাষ হইল। উপস্থিত লোকসকলের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে উচ্চ সাধিকার আখ্যা প্রদান করিতেছিল, তাহাকে আমি প্রশ্ন করিলাম। উত্তর শুনিয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

সে বলিল—"একটী রমণী একটী মৃত কুক্কুরকে কোলে লইয়া কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে গঙ্গায় ডুব দিয়াছে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত উঠে নাই। সে রহিল কি ডুবিয়া মরিল, এখনও পর্য্যন্ত কেহ স্থির করিতে পারিতেছে না। বরফ গলিয়া আজ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় জল বাড়িয়াছে, স্রোতও অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। তাহাতে অনেকের অনুমান রমণী কোনরকমে পদস্খলিত হইয়া জলমগ্ন হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে জীবিত

আছে। অলৌকিক শক্তি সাহায্যে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া সে এস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।"

আমি যোগিনীর এরূপ অলৌকিক শক্তির অযথা প্রয়োগের কিছুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করিতে পারিলাম না। আমিও বুঝিলাম, কুক্কুরটা ইহজগৎ ত্যাগের সঙ্গে যোগিনীকে পরলোকের পথে সঙ্গিনী করিয়াছে। ক্ষিপ্তার মত তাঁহার অস্বাভাবিক কুকুরপ্রীতি দেখিয়া ক্রোধান্বিতা জাহ্নবী তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন।

সহচর তাহার কথা শুনিয়া আমাকে বলিল—"আর কেন, চল বাসায় যাই। আর এখানে থাকিয়া লাভ কি?"

আমি বলিলাম—"লাভ কিছুই নাই। এইবারে ফিরিব। যোগিনী বাঁচুক আর মরুক, আর তাকে খুঁজিব না।"

খুঁজিব না বলিলাম বটে, কিন্তু যোগিনীর পরিণাম কথা শ্রবণে মনটা দারুণ অসুস্থ হইয়া উঠিল। আর যে সকল সাধু সন্ন্যাসী তাহার রক্ষার চেষ্টা না করিয়া কেবল বাজে কথায় সময় নষ্ট করিতেছিল, তাহাদের উপর—শুধু তাহাদের উপর কেন—সত্যকথা বলিতে হইলে তাহাদের সন্ধ্যা আহ্নিকের উপরও আমার ঘৃণা হইল। যে লোকটা আমাকে যোগিনীর সংবাদ দিল, তাহার উপরেও আমি ক্রুদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। ঈষৎ রুক্ষস্বরে তাহাকে বলিলাম—"তোমরা বুঝি রমণীর অলৌকিক ক্ষমতা স্থির করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে, তাহার রক্ষার কোন উপায় করিলে না?"

আমার রুক্ষস্বর শুনিয়াও সাধু রুষ্ট হইলেন না। তিনি অতি শান্তভাবেই উত্তর করিলেন—"সন্ধান পাইলে, অবশ্যই রক্ষার উপায় হইত। স্রোতোহীন জলে মগ্ন হইলেও রক্ষার ব্যবস্থা হইত। এরূপ তীব্রস্রোতে অনিশ্চিত অনুসন্ধানে জলমগ্নপ্রাণীর উদ্ধার স্বয়ং নারায়ণ ভিন্ন অন্যের অসাধ্য।"

কথাটা যুক্তিযুক্ত বোধ হইলেও আমি প্রকাশ্যে তাহার কথার অনুমোদন করিলাম না। পূর্ব্বদিনে যোগিনীর কথা শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, তিনি বাঙ্গালী রমণী। সেইজন্য তাঁর স্মরণের সঙ্গে কেমন একটা মমতা জড়াইয়া গেল, যুক্তিযুক্ত বুঝিলেও সাধুর উত্তরে তুষ্ট হইতে পারিলাম না। সাধুও আমার মত প্রকাশের অপেক্ষা করিল না, কথার উত্তর দিয়াই সে ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

মুটেটা মোট মাথায় লইয়া বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল। আর মুটের যা স্বভাব—পরিক্রমণের প্রতিপদে ভাড়ার মাত্রাবৃদ্ধির আবেদন করিতেছিল। তাহার বারংবার আবেদনে বিরক্ত হইয়া সহচর তাহাকে বলিয়াছিল,—"আমরা যেখানে ইচ্ছা যাইব। তুই চুপ্ করিয়া কেবল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিবি, বাসায় যখন পৌঁছিব, তখন যাহা বলিবার বলিবি।"

তথাপি সে বলিতে নিবৃত্ত হয় নাই। আমরা এক ঘাট হইতে অন্য ঘাটে ফিরিতেছি দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল, আমরা বাসা ঠিক্ করিতে পারিতেছি না। সেইজন্য সে পথে আমাদিগকে একটী ভাল পাণ্ডার বাড়ীতে বাসা লইবার উপদেশ দিয়াছিল আমরা সে উপদেশ গ্রহণ করি নাই। ব্রহ্মকুণ্ডে আমাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, সে বুঝিল, আমরা এতক্ষণে বাসাসম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছি। তাই বুঝিয়া সে বলিল—"এস বাবু, আমার সঙ্গে—আমি তোমাদিগকে ভাল বাসা দেখাইয়া দিই।"

সহচর বলিল—"তোকে বাসা দেখাইতে হইবে না। আমাদের বাসা ঠিক্ করা আছে।" সহচরের কথা শুনিয়াই সে বিস্ময়ের ভাব দেখাইল—"তবে বাবু এঘাট ওঘাট ঘুরিতেছ কেন?"

উত্তর দিব কি তাহার প্রশ্ন শুনিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম

না। আমি বুঝিলাম, মাথার মোটটী, আর সেই মোটের ভাড়াটী ছাড়া দুনিয়ার আর কোনও বস্তুতে তাহার লক্ষ্য ছিল না। আমরা বাসায় যাইয়া তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ যাহা দিব, তাহারই চিন্তায় সে মগ্ন ছিল। সম্মুখে এত যে কথা হইল, তাহার এক অক্ষরও তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই।

আমার সহচর যখন তাকে আমাদের ঘুরিবার কারণ বুঝাইয়া দিল, তখন সে বলিল—"তাহার কাছে কি আপনাদের কোনও দরকার আছে?"

আমি বলিলাম—"ছিল বই কি, নইলে এতক্ষণ ঘুরিতেছি কেন?"

"আমার সঙ্গে আসুন বাবু, আমি তাহাকে দেখাইয়া দিব।"

"তুই তাকে জানিস্?"

"জানি বাবু! আমার সঙ্গে আসুন, আমি মায়িজীর কাছে লইয়া যাই।"

"আর কোথায় যাইবি! মায়িজীকি আর আছে?"

"তার কি হইয়াছে বাবু?"

"এতক্ষণ কি কথা হল, শুন্‌লি না?"

"না বাবু, শুনি নাই।"

"মায়িজী জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।"

"নেহি বাবু!"

"আর 'নেহি বাবু',—ঘাটের সমস্ত লোক দেখিয়াছে।"

এরূপ কথা শুনিয়াও মুটের বিশ্বাস হইল না যে, মায়িজী জলনিমগ্ন হইয়াছে। এরূপ বিশ্বাসের কারণ জানিতে তাহাকে প্রশ্ন করিলাম। সে উত্তর করিল না। আমার সঙ্গীও তার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে অনুসরণে আদেশ করিল। অল্পক্ষণ পরেই আমি সঙ্গীর বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

(৪)

সহচর যেখানে বাসা লইয়াছিল, তাহা একটী ধর্ম্মশালা—একটী সুরম্য দ্বিতল অট্টালিকা। ইহারই দ্বিতলের একাংশে তিনটী ঘর লইয়া সঙ্গী প্রায় একমাসকাল অবস্থান করিতেছে। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম,—সঙ্গী একাকী আসে নাই, তাহার সঙ্গে পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ না কেহ আসিয়াছে। একটা ঘরের মাঝখানে পরদা দিয়া, তাহার অর্দ্ধেক অন্তঃপুর ও অপরাংশ বৈঠকখানারূপে পরিণত করা হইয়াছে।

বৈঠকখানা যথাসম্ভব সজ্জিত। সমস্ত মেজে একটা বৃহৎ সতরঞ্চ দিয়া আবৃত। সতরঞ্চের উপর একটী সুন্দর গালিচা। তাহার উপর গোটা তিনচার তাকিয়া ইতস্ততঃ রক্ষিত। ঘরের এক প্রান্তে একটা বিছানা গুটানো ছিল।

গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র একজন ভৃত্য আমার সঙ্গে সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই সেই বিছানা পাতিয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল। আমি অনুরোধ রক্ষা করিলাম না, সহচরের আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহাকে বলিলাম—"তুই আগে তোর মনিবকে ডাকিয়া দে।"

সে বলিল—"আপনি বিশ্রাম লউন। তিনি এখনি আসিতেছেন।"

"তিনি না আসিলে আমি বসিব না।"

"তিনি আমাকে আপনার পরিচর্য্যার আদেশ দিয়া, আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।"

"আমার বিছানাপত্র কি হইল?"

"অপর ঘরে রাখিয়াছি।"

"মুটের ভাড়া?"

"বাবু আমাকে দিতে হুকুম দিয়াছিলেন, আমি দিয়াছি।"

ভৃত্যের ক্ষিপ্রকারিতায় আমি বিস্মিত হইলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত কাজ নিষ্পন্ন করিয়া, আমি গৃহপ্রবেশ করিতে না করিতেই সে আমার কাছে উপস্থিত হইয়াছে!

মুটের ভাড়া আমারই দেয়, এইজন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মুটেকে কি দিয়াছ?"

ভৃত্য উত্তর করিল না। বুঝিলাম সে বলিতে ইচ্ছুক নহে। আর মুটের নীরব প্রস্থানে ইহাও বুঝিয়াছি, সে আশাতিরিক্ত পুরস্কার লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভৃত্যকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই বলিয়া, আমি অন্য কথার অবতারণা করিলাম।

"তুমি বাবুর সংসারে কতকাল আছ?"

"আমরা পুরুষানুক্রমে ইঁহাদের চাকরী করিতেছি।"

"তা হইলে বাবুদের সম্বন্ধে তোমার কিছুই অবিদিত নাই?"

"কি সম্বন্ধে বলিতেছেন?"

"এই সংসার সম্বন্ধে?"

"বংশানুক্রমে আমরা তাঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছি। আমি বাল্যকাল হইতেই বাবুর সেবায় নিযুক্ত আছি। বাবুদের সংসারের অনেক কথা জানি বই কি। তথাপি আমি চাকর, সমস্ত জানিতে আমার অধিকার কি?"

তাহার উত্তর শুনিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। দেখিলাম সে শুধু কার্য্যকুশল নহে, বুদ্ধিমান্ ও সুসভ্য।

সে আবার আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল। বলিল—"আপনার পরিচর্য্যার ক্রটী দেখিলে প্রভু আমার উপর রুষ্ট হইবেন। আমার কোনও কৈফিয়ৎ তিনি শুনিতে চাহিবেন না।

সহচরের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, বাধ্য হইয়া আমাকে

বসিতে হইল। আমাকে বসাইয়াই সে সত্বর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

এতক্ষণ পরদা দেখিয়া অনুমান ছাড়া সে গৃহে স্ত্রীলোকের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি নাই। ভৃত্যটীর গৃহত্যাগের পর স্ত্রীলোকের স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। কথা শুনিয়াই অনুমান করিলাম, তিনি গৃহিণী—আমার সহচরের মাতা অথবা অপর কোন পূজনীয়া আত্মীয়া হইবেন। তিনি বলিতেছিলেন—"একজন ভদ্রলোককে ঘরে বসাইয়া সে মূর্খ কোথায় গেল।"

এ প্রশ্নে যে উত্তর দিল, সেও রমণী। উত্তর শুনিয়া অনুমান করিলাম সে পরিচারিকা। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর কি মিষ্ট! স্বর শুনিয়াই তাহার বয়স অনুমান করিয়া লইলাম; রমণী যুবতী—বয়স কোনও ক্রমে পঁচিশ বৎসরের বেশী হইবে না। সে বলিল—"বলাই বাবুটীর পরিচর্য্যা করিতেছে। সে না আসিলেত জানিতে পারিব না। সে বোধ হয় পা ধুইবার জল আনিতে নীচে গিয়াছে।"

সে ঠিক্ অনুমান করিয়াছিল। তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই বলাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"বাবু, একবার বাহিরে আসিতে আজ্ঞা হউক, আমি চরণ ধুইয়া দি।"

আমি বলিলাম—"পা আমি নিজেই ধুইতেছি। তুমি ততক্ষণ ভিতরে যাও। ভিতরে কেহ বোধ হয় তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন।"

বলাই চলিয়া গেল। আমি এই অবসরে পাদপ্রক্ষালনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহে পুনঃ উপবিষ্ট হইলাম।

অনেকক্ষণ একাকী বসিয়া রহিলাম, বলাই আসিল না। বুঝিলাম, সে প্রভুর অন্বেষণে চলিয়া গিয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে একটী রমণী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"বাবু! আপনি কি তামাক খান?"

আমি উত্তর করিলাম—"না।"

"তা হ'লে অনুমতি করুন, আমি আহ্নিকের যোগাড় করিয়া দিই।"

"আহ্নিক আমি একরূপ গঙ্গাজলেই সারিয়াছি।"

আসল কথা, ইংরাজী পড়ার আরম্ভ হইতেই আহ্নিকাদি কার্য্য আমি গঙ্গাজলে অঞ্জলি দিয়াছিলাম। হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম্ম,—কিছুই করিতাম না। দেবতা মানিতাম না। সমস্তই ত্যাগ করিতেছিলাম। কেবল হিন্দুর নামটা, আর কৌলিন্যের অভিমানটা ত্যাগ করিতে পারি নাই। তাহাও করিতাম, অর্থাৎ ব্রাহ্ম হইতাম, যদি না পূর্ব্বকথিতা কুলীন-কন্যার রূপে আকৃষ্ট হইতাম। সুতরাং সে রমণীকে আমি বড় একটা মিথ্যা কথায় প্রতারিত করি নাই। সে যাহা বুঝুক না কেন, আমি ঠিক্ বলিয়াছি।

রমণী বলিল—"তাহা হইলে জলখাবার লইয়া আসি?"

এই সময়ে আমি একবার সহচরের নামটা তাহার কাছ হইতে জানিয়া লইলাম। এতক্ষণ তাহাকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়াছি; কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহার নামটী জানিবার অবকাশ পাই নাই। এখন জানিলাম, তাহার নাম ললিতমোহন।

তাহার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে, আমি তাহাকে আর একটা প্রশ্ন করিব স্থির করিলাম। তাহাকেই দাসী মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার শ্রী দেখিয়া, তাহাকে দাসী বলিতে আমার সাহস হইল না। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সহিত এরূপভাবে কথা কহিয়াছি, যাহাতে তাহার মর্য্যাদার হানি না হয়। কিন্তু এবারে আমাকে ইতস্ততঃ করিতে হইল—হয় তুমি, না হয় আপনি বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিতে হইবে। দাসী হইলে, 'আপনি' বাক্য প্রয়োগটা বড় লজ্জার কথা। বিশেষতঃ আমি দরিদ্র, আশ্রয় লইয়াছি ধনীর গৃহে। দাসীকে সম্মানসূচক বাক্যপ্রয়োগ করিলেই হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। সুতরাং 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করাই যুক্তি-

যুক্ত মনে করিলাম। ভাবিলাম, যদি দাসী না হয়, তাহা হইলে কথাটা সংশোধন করিয়া লইব। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি ললিত বাবুর—

'কে' বলিতে রমণী আমাকে অবকাশ দিল না। কথা শেষ হইতে না হইতে, সে একটু রহস্যের ভাবে উত্তর দিল—"বোধ হয়, আপনি এখন আহ্নিক করেন নাই। ললিত বাবুর কেহ হই আর না হই—আমি ব্রাহ্মণকন্যা। আমি—

আমিও তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া, বলিলাম—"আমায় মাপ্ করিবেন। আমি না জানিয়া অমর্য্যাদা করিয়াছি। ললিত বাবু আসিলে যা হয় করা যাইবে—পূর্ব্বে নয়।" রমণী প্রস্থান করিল। আমি তাহার রূপ, তাহার সরসবাক্যের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া একটা চিন্তার খিচুড়ী করিতেছি ও সেই সঙ্গে একটু একটু তন্দ্রার আকর্ষণে ঝিমাইতেছি ;

এমন সময় সহচর ব্যস্ততার সহিত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল—"ভাই! আশ্চর্য্য! যোগিনী যাহা বলিয়াছে সব সত্য, ভূমিকম্পে আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের বাড়ীর একাংশ ভূমিসাৎ হইয়াছে। গ্রামের অনেক বাড়ী অল্প বিস্তর ভাঙ্গিয়াছে। অনেক লোক মরিয়াছে।"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

"দেওয়ান আমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছে। টেলিগ্রাম পাইয়াই, আমি ষ্টেশনে আবার ছুটিয়াছিলাম। দেওয়ানকে টেলিগ্রামের জবাব দিয়া ফিরিতেছি।" এই কথা বলিয়াই বন্ধু গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। আমি বুঝিলাম, সে মেয়েদের এই সংবাদ দিতে চলিয়াছে।

কিন্তু তাহার আচরণ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। সেত এক মর্ম্মভেদী সংবাদ বহন করিয়া আনিল, কিন্তু এরূপভাবে এ সংবাদ আমাকে শুনাইল যে, আমার মনে হইল যেন ভূমিকম্পে তাহার উল্লাস

হইয়াছে। মনে করিলাম, হয় সে নরাধম, নয় সে চিরানন্দময় সাধু। তাহার শেষোক্ত ভাবটাই আমি অনুমান করিয়া লইলাম। চিরদিন সুখে লালিত হইয়া আসিয়াছে, কাজেই দুঃখের ভাব বুঝিতে সে একান্ত অসমর্থ। ভূমিকম্প শুধু দেশের ক্ষতি করে নাই, তাহারও ত অনেক ক্ষতি করিয়াছে। সে নিজ মুখেই তাহার আবাস বাটীর ধ্বংসের কথা শুনাইল।

যাই হ'ক এতৎসম্বন্ধে দ্বিতীয়বার ললিত বাবুর সঙ্গে আলাপ না করিয়া, কোনও মত পোষণ করা অবিধেয় বোধে আমি আবার একটু ঝিমাইবার সূত্রপাৎ করিলাম। অদৃষ্ট বেশীক্ষণ এ অবস্থায় থাকিতে আমাকে অবসর দিল না। সে রমণী, রমণীই বা বলি কেন—রমণী কথাটা কিছু ব্যবহারাতিশয্যে গুরুত্ব হারাইয়াছে—যাক্—গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিল..."উঠিয়া আসুন—জলযোগের আয়োজন হইয়াছে।"

প্রথমে অন্তরালে বসিয়া যখন তাহার কথা শুনি, তখন সে কথা আমার কর্ণে বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। মাঝে কথোপকথন সময়ে যে সকল কথা সে কহিয়াছিল, সেগুলা আমার শুনিবার দোষেই হউক, অথবা তাহার বলিবার দোষে কেমন একটু তীব্র রসাত্মক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এবারে মধুর—'মধুরং মধুরোঽপি চ মধুরং'—হিমাচলশিরশ্চ্যুত জমাট বাঁধা হিমশিলাখণ্ডবৎ মাধুর্য্যের একটা সমষ্টির মত তীব্রবেগে ঝুপ করিয়া যেন আমার কর্ণকুহরে পড়িয়া গেল। সচল হিমক্ষেত্র যেমন প্রচণ্ডবেগে শৈলপাদাভিমুখে প্রধাবিত হইতে গিয়া শৈল-গাত্রস্থ অনেক শ্যামক্ষেত্র অনেক বৃক্ষ সকলকে চূর্ণ করিয়া দেয়, যুবতীর একস্বরঝঙ্কারে আমারও মানসক্ষেত্রটা সেইরূপ ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। বহুদিন হইতে এক্ষেত্রে যে যত্ন করিয়া কত গাছ-আগাছা, কত পুষ্পলতা রোপণ করিয়াছি! আর ত সেগুলাকে দেখিতে পাইতেছি

না! আর তাহাদের মধ্যস্থলে আমার সযত্নরক্ষিত পুষ্পরাণী সে কই—কোথায় গেল? মধুর দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গলিয়া গলিয়া সে কোথায় মিলাইল?

'উঠিয়া আসুন!'

আমার চিন্তাস্রোত পর্য্যন্ত এবারে বরফে চাপা পড়িল। আমি মাথা তুলিলাম, যুবতীর মুখের পানে চাহিলাম। ঘরের আলোটা তেমন উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছিল না, অথবা আমার চোখের জ্যোতিটা কিছু অবসন্ন হইয়াছিল—আমি যুবতীর মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু অস্পষ্ট দেখার জন্যই যেন সে মুখখানি দূরস্থ, প্রকৃতির চেলাঞ্চলে অর্দ্ধাবৃতা দিগ্‌বধূর মুখের মত একটা কেমন কেমন—অতি কেমন বোধ হইতে লাগিল।

তাই ত! 'উঠিয়া আসুন' বলিলেই দেবাদিষ্টের মত উঠিয়া দাঁড়াইব! আরও দুই একটা তাহার কথা শুনিবার জন্য আমি কি একটা কথাও কহিতে পারিব না! কিভাবে কথা কহিলে কথাটা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে মনে একবার ভাবিয়া লইলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনিই না ইতিপূর্ব্বে এঘরে আর একবার আসিয়াছিলেন?"

অতি ধীর ভাবে, অথচ একটু রহস্যের সহিত সে উত্তর করিল—"আপনার কি মনে হয়?"

"আমার মনে হয়—তবে কি না—মাঝের অপানি, আর এই শেষের আপনি—এ দুইটা সুবিধা মত বড় মিলিতেছে না।"

"আপনি কি আফিং খান?"

আরে গেল, এ বলে কি? এ মেয়েটাকে অন্তর্য্যামিণী—যোগিনীর একটা নূতন ধরণের গার্হস্থ্য সংস্করণ?

আসল কথা, সহসা বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া, যন্ত্রণার হাত এড়াইবার জন্য কোনও বিজ্ঞ অহিফেন-সেবীর পরামর্শে বৎসর দুই পূর্ব্বে আমি একটু আফিং ধরিয়াছিলাম। বাতটা বহুদিন হইল আমার দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আফিং আর আমাকে ছাড়ে নাই। শুধু ছাড়ে নাই নয়, একটী তিল, তিল তিল বাড়িয়া, এই দুই বৎসরে একটী বৃহৎ মটরের আকার ধারণ করিয়াছে। ষ্টেশনে যাইবার পূর্ব্বে—হে পাঠক, তোমাকেও গোপন করিয়া সেই একটী মটর আমি সেবন করিয়াছিলাম। নানা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া সে ক্রিয়ামাধুর্য্য প্রকাশের অবসর পায় নাই। যখন অবসর পাইল, তখন করুণাময়ী ভোজনলোভ দেখাইয়া আমার তন্দ্রার রাজ্য আক্রমণ করিল। যুবতীর এই শেষ কথাতেই আমার নেশা কাটিয়া গেল। আমি একেবারে উঠিয়া, দাঁড়াইলাম, এবং তাহার অনুসরণে গৃহান্তরে গমন করিলাম।

(ক্রমশঃ)

মৃতের সান্ত্বনা প্রদান।

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ রায় অতি শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোক। ইনি মহা-মহোপাধ্যায় কবিরাজ ৺বিজয়রত্ন সেনের বৈবাহিক। গত ১৩১৫ সালের আশ্বিন মাসে কলিকাতায় তাঁহার স্ত্রী ও চারি বৎসরবয়স্কা কন্যার হঠাৎ মৃত্যু হয়। সে সময় তিনি কলিকাতায় ছিলেন না। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার অভাবনীয় মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার বাইশ বৎসর বয়স্ক উপযুক্ত পুত্র নানা রোগযাতনা ভোগ করিয়া ইহধাম ত্যাগ করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটাতে রায় মহাশয় অত্যন্ত মনঃকষ্ট ভোগ করিতে ছিলেন।

কার্ত্তিক মাসের শেষে যখন তিনি নিজ জন্মভূমি খুলনা জেলার অন্তর্গত ভট্টপ্রতাপ গ্রামে ছিলেন, তখন একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া ক্রন্দন করিতে ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার কন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া পিতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল যে "আমার সময় হইয়াছিল তাই আমার মৃত্যু হইল। নিয়তির লেখা ত আর খণ্ডান যায় না। বৃথা ক্রন্দন করিয়া লাভ কি? আমরা এখানে সুখে আছি। মা, দাদা ও আমি এখন পর্য্যন্ত এক জায়গায় আছি। আমরা এখন যে স্থানে আছি ইহা অতি উত্তম স্থান।"

রায় মহাশয় তাহাকে দেখিতে চাহিলে, সে বলিল যে "আমার বর্ত্তমান রূপ দেখিলে আপনি ভয় পাইবেন. সে মূর্ত্তি দেখিয়া কাজ নাই।" তাহার পর সে চলিয়া গেল।

ইহার ৭।৮ দিন পরে রায় মহাশয় ক্রন্দন করিতে থাকিলে তাঁহার কন্যা আসিয়া বলিল "বাবা, আমি সেদিন তোমাকে ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলিলাম, তবু তুমি কেন বৃথা ক্রন্দন করিতেছ!" রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি চারি বৎসরের শিশু, তুমি আমাকে এত জ্ঞানোপদেশ দেও কি প্রকারে?" কন্যা বলিল "এস্থানেরই গুণ, এখানে কেহ শিশু আর কেহ বৃদ্ধ নহেন, সকলেই সমান। পৃথিবীতে আমি, শিশু ছিলাম বটে, কিন্তু এখানে শিশু নই। এখানে সকলেই জ্ঞানলাভ করে।" "তুমি কোথায় জন্মগ্রহণ করিবে?" রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার কন্যা উত্তর করিল "আমার পাপক্ষয় হইলে ত জন্মগ্রহণ করিব।" রায় মহাশয় বলিলেন "তুমি ত অল্পদিনই পৃথিবীতে ছিলে, তোমার আবার পাপ কি?" কন্যা বলিল "আমার অল্প পাপ বলিয়াই শীঘ্রই পাপক্ষয় হইবে। আমি অল্পদিনের মধ্যই জন্মগ্রহণ করিব।" রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় জন্মগ্রহণ করিবে?" কন্যা

বলিল "তাহা এক্ষণে বলিব না, আমি এখন যাই।" তখন রায় মহাশয় তাহাকে ধরিতে গেলে একটা খুঁটীতে হাত ঠেকিয়া গেল। তাহাতে রায় মহাশয়ের তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। তৎপর দিন হইতে রায় মহাশয় খুঁটী হইতে দূরে গিয়া শয়ন করিতে লাগিলেন। ইহার ১৫ দিন বাদে রাত্রে রায় মহাশয় ক্রন্দন করিতে থাকিলে পরে তাঁহার কন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল "বাবা, আপনাকে এতবার বলিতেছি তবু আপনি স্থির হইলেন না! অদ্যই আমি জন্মগ্রহণ করিব, তাই একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম।" রায় মহাশয় বলিলেন "কে কে জন্মগ্রহণ করিবে?" মেয়েটী বলিল "অদ্য কেবল আমিই জন্মগ্রহণ করিব। মা'রও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাঁহার পাপের বিচার এখনও হয় নাই, বিচার না হইলে কোথাও জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন না। তাঁহার জন্মগ্রহণ করিতে অনেক দেরী আছে। আমার অল্প বয়সে মৃত্যু হইয়াছে, এই জন্য আমার পাপ অল্প আর সেই কারণে আমার বিচার শীঘ্রই হইয়া গিয়াছে।" রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোথায় জন্মগ্রহণ করিবে?"

কন্যার আত্মা বলিল "তাহা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না। বলিতে নিষেধ আছে।"

রায় মহাশয় তখন অনেক কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন কোথায় জন্মগ্রহণ করিবে জানিবার জন্য। ঐ স্থান জানিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা জ্ঞাপন করায় আত্মা বলিল "অমুক জেলা, অমুক গ্রাম, অমুকের বাটীতে অদ্য রাত্রেই জন্মগ্রহণ করিব। অদ্য হইতে আর আপনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। অদ্য আমার শেষ দেখা। আমি যেখানে জন্মগ্রহণ করিলাম, তাহা কেবল আপনাকেই বলিলাম। সাবধান একথা যেন আর কাহাকেও না বলেন। খুব গোপনে রাখিবেন। যদি প্রকাশ

করেন, তবে আপনার ও আমার উভয়েরই অনিষ্ট হইবে।" এই বলিয়াই আত্মা চলিয়া গেল, তাহার পর আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। উপরোক্ত ঘটনার প্রায় ১॥০ দেড় বৎসর পরে রায় মহাশয় একবার বরিশাল গিয়াছিলেন। তথায় একদিন রাত্রে শুইয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় চেহারা নাই। এমন কি চেহারা এত বিকৃত দেখাইতেছিল যে রায় মহাশয় ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এত ভয় পাইতে দেখিয়া তাঁহার মৃতা পত্নী বলিলেন "আমাকে দেখিয়া এত ভয় করিতেছেন কেন? আমি ত আপনাকে ভয় দেখাইতে অথবা মারিয়া ফেলিতেও আসি নাই। আমার পাপের ক্ষয় এখনও হয় নাই, পাপের ক্ষয় হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।" রায় মহাশয় এখন মধ্যে মধ্যে ঐ চেহারা দেখিয়া থাকেন।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন।

"মানব না দানব?"

ইহজগতে মানব-জীবন অধিকাংশ স্থলেই কর্ম্মক্ষেত্র, অর্থাৎ এজীবনে প্রায় সকলকেই কোন না কোন কর্ম্ম করিতে হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে কাজ করাই সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে। যে মানুষ নামের উপযুক্ত তাহার কার্য্য করিবার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা থাকা চাই। শ্রমজীবী-দের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করা আবশ্যক। শুধু তাহা নহে, সকল অবস্থার লোকের পক্ষে, এবং যাঁহার যেরূপ পদই হউক না কেন, কর্ম্ম রাকঅতীব প্রয়োজনীয়।

ভাবুকের ধীরনেত্রে মানবজীবন ও পতঙ্গজীবনে কিছুমাত্র প্রভেদ নহে! ইতর বড় সকলেরই যথায় উৎপত্তি, তথায়ই নিবৃত্তি; অর্থাৎ ধূলার দেহ ধূলাতেই মিশিবে। পরিশ্রমী এবং আলস্যপ্রিয় বিলাসী উভয়েই অবস্থা-ভেদে নানাবেশে সজ্জিত হইয়া পতঙ্গজাতির ন্যায় কিছুকালের জন্য জীবন-বায়ুতে নৃত্য করিতে থাকে; অর্থাৎ কেবল সংসারের সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। এবং পতঙ্গ যেরূপ কোন দুর্ঘটনায় প্রতিহত অথবা বার্দ্ধক্যবশতঃ দুর্ব্বল হইয়া বায়ুতে উড়িতে না পারায় ধরাতলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে, মানবও সেইরূপ অকালে কোন দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ অথবা বৃদ্ধ বয়সে অক্ষমতা হেতু ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া ধূলীশয়নে মহানিদ্রায় নিদ্রিত হয়।

আমার অনুমান হইতেছে যেন ইন্দ্রিয়সুখনিরত যুবকগণ (ব্যঙ্গচ্ছলে) আমাকে এইরূপ উত্তর দিতেছে; ওহে! তুমি যে আমাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা নীতিশিক্ষা দিতেছ, তুমিও কৃপার পাত্র, যেহেতু তুমিও একটীমাত্র পতঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নও। তোমার সুখে সুখী হইতে কোন সুন্দরী সঙ্গিনী নাই; ভবিষ্যতের জন্য তুমি কিছুই সঞ্চয় করিতে পার নাই, তোমার এমন বাহ্যসুন্দর পরিচ্ছদ নাই যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তোমার যৌবন অল্পদিন ফুরাইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদের সহিত তোমার তুলনাই হইতে পারে না। এই শ্রেণীর শিক্ষিত বাবুরা আজকাল ভূতের কথা শুনিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। আমি আজ একটী অলৌকিক ঘটনা পাঠকবর্গের গোচর করিবার মানসে, এই পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করিতেছি। এক্ষণে আপনাদের বিশ্বাস হইবে কি না বলিতে পারি না। কারণ আধুনিক শিক্ষিত সমাজের অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মানবের পরলোকবিষয়ক অস্তিত্ব সম্বন্ধে আদৌ বিশ্বাস করেন না। এই শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাস যে কতদূর তাহা জানি না।

এই স্থূল শরীরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত মনুষ্যজীবনের অতিরিক্ত ও সূক্ষ্ম-ভাবে স্থিত মৃত্যুর পরপারে অন্য জীবন আছে, এদেশের কৃতবিদ্য শিক্ষিত সমাজে এ বিশ্বাস একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই সকল বাবুরা বলেন "যে কেবল কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিতা কুসংস্কার-কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন স্ত্রীলোকদিগের, এবং স্ত্রী-স্বভাবাপন্ন, অকর্ম্মণ্য, বিকৃত-মস্তিষ্ক পুরুষদিগের মধ্যে বিজ্ঞানের আলোক না পাইয়া ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ এখনও দেহাতীত জীবনে বিশ্বাস করেন।" আমার বিশ্বাস ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যে একেবারে ভ্রান্তসংস্কারপাশে আবদ্ধ, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহাদের অবগতির জন্য এই ঘটনাটী বিবৃত করা হইল,—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার কোনও আত্মীয় প্রেসিডেন্সি জেলের ডাক্তার ছিলেন। দিবারাত্র ঐস্থানে রোগী দেখিতে হইত বলিয়া তিনি সপরিবারে উক্ত স্থানেই বাস করিতেন। যে সকল অপরাধি-গণের গুরুতর অপরাধের জন্য ফাঁসি হইত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই অপঘাতে মৃত্যু হওয়াপ্রযুক্ত আত্মার মুক্তি না হওয়ায়, তাহাদের প্রেতাত্মা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। স্পষ্টই দেখা গিয়াছে যে ঐ সকল প্রেতাত্মা কখন কখন নিজ কলেবর ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিত। আবার সময় সময় সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত।

এই জেলখানার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বহুকালের পুরাতন একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষে বহুসংখ্যক প্রেতাত্মা বাস করিয়া থাকে। যাহারা বিষপানে দেহত্যাগ করে, কিম্বা যাহাদের অপঘাতে মৃত্যু হয়, তাহাদের আত্মার মুক্তি হয় না বলিয়াই বোধ হয়, তাহারা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া এইরূপ ভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে।

এই জেলখানার চতুর্দ্দিক্ ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ঐ সকল প্রাচীরের স্থানে স্থানে কিয়দ্দূর অন্তর এক একটী করিয়া গম্বুজাকৃতি স্থান আছে। যাহা রাত্রিকালে প্রহরীদিগের পাহারা দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রতি রাত্রেই সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া পর্য্যায়ক্রমে এক একটী প্রহরীকে পাহারা দিবার জন্য উক্ত স্থানে নিযুক্ত থাকিতে হইত।

একদিন গভীর রাত্রে একটী সশস্ত্র প্রহরী ঐ উচ্চ স্থানে পাহারা দিতেছিল। তখন রজনীর দ্বিযাম অতীত। প্রশান্ত গগন, বিশাল ধরণী সুধাংশুর তরল মাধুরীতে উছলিত। অচঞ্চল সমীরেও ঘোর গম্ভীরতা—আবাতকম্পিত তরুলতা থরে থরে ফুটন্ত ফুলরাশি ছড়াইয়া চারিদিক্ সুবাসে আমোদিত করিতেছে।

বিমান-সঞ্চারী অমরগণ অম্বরতলে ছায়াপথে নৈশ-নিসর্গ-কান্তি দেখিয়া বেড়াইতেছেন। জগৎ নিস্তব্ধ নীরবে নিদ্রিত। গিরি-প্রস্রবণের সফেন সলিলোচ্ছ্বাস—কৌমুদী-স্নাত তরল তরঙ্গিণীর মধুর কুল কুল নাদ—অদূর নিঃসৃত ঝিল্লির সুধারব—নির্জ্জন প্রান্তরে জম্বুকের ধ্বনি—শান্ত নিশীথিনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বাতাসের গায়ে লতায় পাতায় মিশাইয়া যাইতেছে। কোন কোন নররাক্ষস এমন শান্তিনিস্রাবিনী নিশীথে নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়া অপরের সর্ব্বনাশ ও স্বার্থসাধন-উদ্দেশ্যে ষড়্যন্ত্রের জাল পাতিতেছে। কোন প্রণয়বিধুর নিভৃতে নির্ঝরিণী-তীরে বা বাপীতটে বসিয়া তাহার সেই—প্রেমের অমিয়খানি কামনার হৃদয়-সরোজের স্বর্ণ-পঙ্কজিনী—স্মৃতির সম্বল—জীবনের সুখতারা—জীবন-সঙ্গিনীর বিদায়ের অশ্রুসিক্ত সজল মুখখানি মনে করিয়া হতাশ প্রেমের হুতাশে তপ্তশ্বাস ফেলিয়া সজল নয়নে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। চন্দ্রমাশালিনী যামিনীর নির্ম্মল জ্যোৎস্নাভিষেকে রজত-কান্তি সৌধশিখর-শ্রেণী নীলাম্বরের নীলোৎসঙ্গে মিশিয়া অপরূপ বিনোদদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছিল।

এমন সময়ে উক্ত প্রহরী পশ্চাতে একটী আলোকরশ্মি দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, এবং সহসা একটা প্রেতাত্মা আসিয়া ধাক্কা দিয়া তাহাকে উপর হইতে নিম্নে ফেলিয়াছিল, সেও অমনি সুষুপ্ত রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সিঁড়ির উপর দিয়া শব্দায়-মান হইয়া গড়াইতে গড়াইতে নিম্নে পতিত হইল, ঐ শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ Headwarder ছুটিয়া আসিয়া এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া সাহেবকে সংবাদ দিল, Superintendent সাহেব তৎক্ষণাৎ জেলদারোগা, এবং একজন ইংরাজ ডাক্তার, ও একজন দেশীয় ডাক্তার লইয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে গম্বুজের উপর যে ব্যক্তিকে পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, সে উপর হইতে নিম্নে পতিত হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। তাহাকে ঐরূপ অবস্থায় পতিত থাকিতে দেখিয়া তাহার মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিল, ও পরে সংজ্ঞা হইলে পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে সে কিরূপে উপর হইতে নিম্নে পতিত হইল। সে বলিল—"যখন আমি পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, তখন একটা বিকট মূর্ত্তি আমার সম্মুখীন হইয়া আমাকে ধাক্কা দিয়া উপর হইতে নিম্নে ফেলিয়া দিল। প্রহরীর প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবকাশ প্রদান করা হইল। এই ভয়াবহ সংবাদ যখন অন্যান্য প্রহরিবর্গের কর্ণগোচর হইল, তখন উক্ত কার্য্যের জন্য কেহই যাইতে চাহিল না। তখন Head warder ও Superintendent সাহেব প্রহরীদিগকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন যে উহা কিছুই নহে, মস্তিষ্কের বিকার বশতঃ এইরূপ ঘটিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন রাজপুত শান্ত্রিই ঐ স্থানে পাহারা দিতে স্বীকৃত হইল না। পরে একজন মুসলমান প্রহরী বলিল "আচ্ছা আমি ঐ স্থানে পাহারা দিব, দেখি কে আমাকে ফেলিয়া দেয়। ঐ মুসলমানটী সামান্য ভৌতিক

মন্ত্র জানিত। সে পাহারা দিবার সময় মন্ত্রবলে আপনার শরীরকে সুরক্ষিত করিয়া পাহারার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সেই রাত্রে পুনরায় কোন দুর্ঘটনা হয়, এই ভাবিয়া Headwarder বারংবার তথায় আসিয়া সংবাদ লইতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সে রাত্রে কোন দুর্ঘটনা হয় নাই। এক্ষণে পাঠকপাঠিকাবৃন্দের নিকট আমার এই জিজ্ঞাস্য—গভীর নিশীথে একটী সশস্ত্র প্রহরীকে ঊর্দ্ধস্থান হইতে কে ফেলিয়া দিল? মানব না দানব?

(একান্ত বশম্বদ)
শ্রীননীভূষণ শেঠ।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদবিদ্যাবিনোদ এম-এ প্রণীত।

আলিবাবা (রঙ্গনাট্য)	...	...	...	॥০
প্রতাপাদিত্য	...	...	...	১৲
প্রমোদরঞ্জন (নাটক)	...	...	...	॥০
জুলিয়া (ঐ)	...	...	...	।৵০
পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত	...	...	...	১৲
সাবিত্রী (ঐ)	...	...	...	॥০
বেদৌরা (গীতিনাট্য)	...	...	...	১৲
বৃন্দাবন-বিলাস (গীতিনাটিকা)	..	...	...	।৵০
কবি-কাননিকা (রঙ্গন্যাস)	...	...	...	১৲
রঘুবীর (নাটক)	...	...	...	।৵০
উলুপী (ঐ)	...	...	...	॥০
নারায়ণী (উপন্যাস, বিলাতী বাঁধা)		...	...	১॥০
রক্ষঃ ও রমণী ...	...	...	...	।৵০
চাঁদবিবি (ঐতিহাসিক নাটক)	...	...	...	১৲
অশোক (ঐ)	...	...	...	১৲
বাসন্তী (রঙ্গনাট্য)	...	...	...	।০
বরুণা (গীতিনাট্য)	...	...	...	॥০
পলিন ...	...	...	...	॥০
বিরাম-কুঞ্জ ...	...	...	...	।৵০
পলিন ...	...	...	...	।০
দুর্গা (উপাদেয় স্ত্রীপাঠ্য ; উৎকৃষ্ট বাঁধাই)		...	...	।৵০
মিডিয়া (বৈজ্ঞানিক নাটক)	...	...	...	॥০
খাঁজাহান (ঐতিহাসিক নাটক)	...	...	...	।৵০
"ভীষ্ম" ...	...	...	...	১৲
রূপের ডালি ...	...	...	...	॥০

ইউনিভার্শেল লাইব্রেরী, ৫৬।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed by A. Banerji. at the Metcalfe Printing Works:
34, Mechuabazar Street, Calcutta.

পঞ্চম ভাগ। কার্ত্তিক ১৩২০। ৪র্থ সংখ্যা।

অলৌকিক রহস্য

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
সম্পাদিত।
শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বিএ, বিএল,
সহকারি-সম্পাদক।

বার্ষিক মূল্য ১৷০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

সূচী।

অলৌকিক রহস্যের নিয়মাবলী

১। "অলৌকিক রহস্য" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলাদি সমেত সহর, মফঃস্বল সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা মাত্র; ভিঃ পিঃতে পাঠাইতে /০ এক আনা অধিক লাগে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ তিন আনা।

৩। কেবল ৵১০ সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা একখণ্ড প্রেরিত হইবে।

৪। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পর-সংখ্যা-প্রকাশের পূর্ব্বে না জানাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনরায় পাঠাইতে দায়ী থাকিব না।

৫। কেহ যদ্যপি পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া রিপ্লাই পোষ্টকার্ড লিখিবেন।

৬। "অলৌকিক রহস্য"-সম্বন্ধীয় চিঠি-পত্র, টাকা-পয়সা আমার নামে এবং প্রবন্ধাদি বিনিময়ার্থ পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ইউনিভার্সেল লাইব্রেরী,
৫৩।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্‌, } শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পুনরাগমন সামাজিক উপন্যাস যাহা ধারাবাহিক 'অলৌকিক রহস্যে' বাহির হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

অলৌকিক রহস্য।

৫ম ভাগ] কার্ত্তিক, ১৩২০। [৪র্থ সংখ্যা।

কর্ম্ম অনুসারে জীবের গতি।

গরুড়ের প্রশ্নমতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেতের উৎপত্তি, রূপ, বাসস্থান ও তাহাদের ভোজনক্রিয়া কিরূপে হইয়া থাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন। ভগবান্ বলেন, যাহারা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকে, তাহারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রেতরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহারা পুষ্করিণী, কূপ, দীর্ঘিকা, উপবন, দেবালয়, পানীয়শালা প্রভৃতি পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম বিক্রয় করে, সেই পাপিষ্ঠেরা মরণান্তে প্রেত হইয়া থাকে। (পিতৃপিতামহের কাল হইতে নানা লোকে যে সকল দ্রব্য ভোগ করিয়া সুখী হইয়াছে, সেই সকল জলাশয় বা ভোজনশালা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে বহুলোকের কষ্ট ও অভাববোধ হইয়া থাকে, ইহাতে লোকের মনঃকষ্ট উৎপাদন করারূপ পাপ হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী কার্য্যও এই হেতু সাধারণের অপ্রীতিকর ও তজ্জন্য প্রেতত্ব ভোগের বিধান।) যাহারা লোভপরতন্ত্র হইয়া গোচারণস্থান, গ্রামসীমা, তড়াগ, উপবন, গহ্বর এই সকল কর্ষণ করে, তাহারা প্রেতত্ব পাইয়া থাকে। চণ্ডালের আঘাতে, জল পতনে, সর্পাঘাতে, ব্রাহ্মণ হইতে, বিদ্যুৎপাতে, দংশক জন্তু হইতে ও পশুগণের আঘাতে যে সকল পাপকর্ম্মা ব্যক্তিদের মৃত্যু হয়, যাহারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, যাহারা বিষ ও শস্ত্রাদির দ্বারা আহত, যাহারা আত্মাপঘাতী

যাহারা বিসূচিকা রোগে মৃত, যাহারা অগ্নিদাহে আহত, যাহারা মহারোগে ও পাপরোগে মৃত, যাহারা দস্যুগণ কর্ত্তৃক মৃত, যাহারা অসংস্কারাবস্থায় প্রাণত্যাগ করে, যাহারা বিহিতাচারবর্জিত, যাহাদের বৃষোৎসর্গাদি সংস্কার ও মাসিক পিণ্ডাদি লুপ্ত হইয়াছে, শূদ্রগণ যাহার অগ্নি তৃণ ও কাষ্ঠাদি আহরণ করে, পর্ব্বতাদি হইতে পতন হইয়া যাহার মৃত্যু হয়, যাহারা ভিত্তি-পাতে মৃত, যাহারা রজঃস্বলাদিস্পৃষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করে, যাহার ভূমিতে মৃত্যু হয় না, যাহারা আকাশে মৃত, যাহারা বিষ্ণুনাম স্মরণে বিমুখ, যাহারা সূতিকাদি সম্পর্কবিশিষ্ট, যাহাদের দুষ্টশল্যাদিতে মরণ ঘটিয়াছে, এবং যাহারা অন্যান্য কুমৃত্যুর বশগ, তাহারা প্রেত-যোনিতে অবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করে। (এস্থলে ভগবান্ অকস্মাৎ-মৃত্যুর যাবদীয় ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন; অকস্মাৎ-মৃত্যুতে জীব অনেক সময় মরিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারে না, জীবিত আছি মনে করিয়া পৃথিবীর কার্য্যাদি করিতে যাইয়া থাকে: পরে মৃত্যু হইয়াছে জানিয়া ঘোর বিষণ্ণ হইয়া তাহারা সংসার-আদির ব্যবস্থা করিয়া আসিতে পারিল না ভাবিয়া কাতর থাকে ও অন্যে মর্ত্ত্য-লোকের সুখ-ভোগ করিতেছে দেখিয়া ঈর্ষান্বিত অবস্থায় তাহাদের সুখ নষ্ট ইচ্ছা করিয়া থাকে। যাহাদের উপরি উক্তরূপ অকস্মাৎ-মৃত্যু হয়, তাহাদের ভগবান্ পাপকর্ম্মা বলিয়াছেন, (অর্থাৎ পাপকর্ম্মে রত না থাকিলে এরূপ মৃত্যু হয় না।)

ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদ প্রেতত্ব সম্বন্ধে অনেক বিষয় আমাদের বুঝাইয়া দেয়। এই উপাখ্যান অগ্নিপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি কয়েকখানি পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে এই উপাখ্যান এখানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতামহ! লোকসকল কি কারণে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং কি উপায়েই সেই প্রেতযোনি হইতে মুক্ত হয়?" ভীষ্ম

কহিলেন, " জীবগণ কর্ম্মবশে ঘোরতর দুষ্কর নরক প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বদা বিষ্ণুর নাম স্মরণ এবং পুণ্যপ্রদ তীর্থের অনুকীর্ত্তন করিলে উপস্থিত প্রেত-যোনিতে ও প্রেতভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে। হে বৎস! আমি শুনি-য়াছি পূর্ব্বকালে অতি সুব্রত সন্তপ্তক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ তপশ্চরণমানসে তীর্থে গমন করেন। তথায় অরুণোদয়কালে তীর্থসলিলে স্নান করিয়া তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদা জগদ্-গুরু পরমেশ্বরের নাম স্মরণ, তাঁহার রূপ চিন্তন, ও তাঁহাকে নমস্কার করিতেন। এক দিবস সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া আশ্রমে আসিতে-ছিলেন, দৈবাৎ ত্বরিতগমনে মার্গভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে-ছেন, এমন সময় পথিমধ্যে সুদারুণ পঞ্চ প্রেতকে দেখিতে পাইলেন। নির্জন অরণ্যময় বৃক্ষবর্জিত কণ্টকদেশে তাহারা নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছে। ব্রাহ্মণ বিকৃতাকার ভয়ঙ্করদর্শন ঐ পঞ্চ প্রেতকে দর্শন করিয়া উদ্বিগ্নহৃদয়ে নয়নযুগল মুদিত করিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। কিয়ৎ-কাল পরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ত্রাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দূর হইতে তাহা-দিগকে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কে? কি নিমিত্ত এইরূপ বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইয়াছ? তোমরা কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ যাহার জন্য তোমরা এইরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছ? কেনই বা তোমরা একরূপ কর্ম্ম করিতেছ? এবং তোমরা কোথায় প্রস্থান করিতেছ?' প্রেতগণ কহিল, 'আমরা স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে প্রেতত্ব ভোগ করিতেছি। আমরা সকলেই পরদ্রোহরত ও দুষ্ট মৃত্যুর বশীভূত। এই নিমিত্তই ক্ষুৎপিপাসায় পরিপীড়িত হইয়া প্রেতভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা সকলেই হতবাক্, নষ্টসংজ্ঞ, ও বিচেতন। আমরা দিক্ বিদিক্ কিছুই জানি না, সুতরাং অতি দুঃখে কালযাপন করিতেছি। আমরা মূঢ়, কর্ম্মবশে পিশাচত্ব পাপ্ত হইয়াছি। কোথায় গমন করিতেছি কিছুই জানি না, স্বীয় কর্ম্মদোষে পিশাচযোনি

প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ দুঃখ ও উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। আমরা আপনার দর্শন লাভ করিয়া আহ্লাদিত ও আশ্বাসিত হইয়াছি। আপনি কিয়ৎ-কাল অপেক্ষা করুন, আমাদের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি।

আমার নাম পর্য্যুষিত, ইহার নাম সূচীমুখ, তৃতীয়ের নাম শীঘ্রগ, চতুর্থের নাম রোহক এবং পঞ্চমের নাম লেখক। আমি সুস্বাদু দ্রব্য স্বয়ং ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণদের পর্য্যুষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া আসিয়াছি, এই কর্ম্মবিপাক বশতঃ আমার পর্য্যুষিত নাম হইয়াছে। ইনি অনেক ব্রাহ্মণকে সূচিত করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্নকামনায় সমাগত ব্রাহ্মণদের অনেক তিরস্কার করিয়াছেন, এই হেতু এই পিশাচের নাম সূচীমুখ হইয়াছে। কোন ব্রাহ্মণ ক্ষুধিত হইয়া প্রার্থনা করিলে ইনি শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিয়া-ছিলেন, এই কারণে ইহার শীঘ্রগ নাম হইয়াছে। এই ব্যক্তি সর্ব্বদা পৈত্র ও দৈব মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিত, ব্রাহ্মণদিগের অভাবে ইহার কেবল দৈব ও পৈত্র মিষ্টান্নে অধিকার, এই হেতু ইহার নাম রোহক হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বিপ্রগণ ইহার নিকট যাচ্ঞা করিলে ইনি মৌনী হইয়া পৃথিবীতে লেখন করিতেন, এই কর্ম্মবিপাকে ইহার নামক লেখক হইয়াছে।' জীবগণ কর্ম্মবশে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া মেষানন, লেখক, রোহক, পর্ব্বতা-নন, শীঘ্রগ, পশুবক্ত্র, সূচক, সূচীবক্ত্র, পর্য্যুষিত, ও বলগ্রীব এই সকল নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এইক্ষণে ইহাদের রূপ-বিপর্য্যয় দর্শন করুন। প্রেত-গণ মায়াময় রূপ ধারণ করিয়া নরকার্ণব হইতে পলায়ন করে। ইহারা সকলেই বিকৃতাকার ও বিকৃতানন, ইহাদের ওষ্ঠগুলি লম্বমান রহিয়াছে। প্রেতগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বৃহৎশরীর, বৃহৎদন্ত ও বক্রাস্থ হইয়া থাকে।

সন্তপ্তক কহিলেন, 'এক্ষণে তোমাদের আহার শুনিতে ইচ্ছা করি, যথার্থরূপে বল।' প্রেতগণ কহিল, 'আমরা যাহা আহার করিয়া থাকি' তাহা সর্ব্বপ্রকারে বিগর্হিত। আপনি এই কুৎসিত আহার শ্রবণ করিলে

অনেক নিন্দা করিবেন; শ্লেষ্মা, মূত্র, পুরীষ, রেচক, মল ও উচ্ছিষ্ট পক্কান্নদ্বারা প্রেতগণের ভোজন হইয়া থাকে। যে সকল গৃহ শৌচ-বর্জ্জিত ও সর্ব্বপকার উপকরণরহিত অথচ মলিন, সেই সকল স্থানেই প্রেত-গণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যাহার গৃহে শৌচ, সংযম ও সত্য নাই এবং যে গৃহ পতিত, দস্যুগণ যে গৃহে ভোজন করে, তাহার গৃহেই প্রেতগণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যে গৃহে বলি, হোম, স্বাধ্যায় ও ব্রতাদি কিছুই হয় না, সেই গৃহেই প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে। যে গৃহী ব্যক্তি অতি কুৎসিত এবং যাহার লজ্জা মর্য্যাদা কিছুই নাই এবং যাহার গৃহে দেবার্চনাদি সৎকার্য্য হয় না, সেই গৃহে প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে। যে গৃহে লোভ, ক্রোধ, নিদ্রা, শোক, ভয়, মত্ততা, আলস্য, কলহ ও মায়া সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, সেই গৃহে প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে। যে গৃহে ভর্ত্তৃহীনা নারী পরপুরুষের সেবা করে, সেই গৃহে প্রেতগণ বীর্য্যমূত্রযুক্ত অন্ন ভোজন করে। আমাদের স্বকীয় ভোজন বর্ণন করিতে লজ্জা হইতেছে। স্ত্রীগণের যোনিগত যে রজঃ তাহাই আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। হে তপোধন! আমরা প্রেতরূপে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া আপনাকে দৃঢ়ব্রত জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিরূপ আচরণ করিলে আর প্রেতত্ব ভোগ করিতে হয় না, তাহার উপদেশ প্রদান করুন। বরং প্রতিদিন মৃত্যুযাতনাও শ্রেয়স্কর, তথাপি কখনও প্রেতত্ব না হয় ইহাই প্রার্থনা।' (আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মৃত্যুর পর আর আহার করিবার আবশ্যকতা থাকে না, ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না। এই পঞ্চ প্রেত কুকর্ম্মের দণ্ডস্বরূপে জানিয়া শুনিয়া ঐ নিন্দিত বস্তু আহার করিতে যাইত ও ঐ সকল আহার করিলাম বোধে নিজে নিজে মনঃকষ্ট বোধ করিত। লোকে যেমন কুকর্ম্মে রত থাকিলে যতই বুঝান যাউক সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা উপাদানের সম্মুখীন হইলে সেই

কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, ইহাদেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। ইহাদিগকে দৃঢ়ব্রত হইয়া আহারকার্য্যে নিরস্ত থাকিতে শিক্ষা দিলেই ইহারা মানসিক বলে এই অখাদ্য-ভোজনজনিত মানসিক যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।)

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'প্রতিদিন উপবাসরত হইয়া কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিলে প্রেতত্ব নিবৃত্ত হয়। প্রেতত্বনাশে অন্যান্য পুণ্যকর কার্য্য নিষ্প্রয়োজন। যে ব্যক্তি মহাযজ্ঞ, বিবিধ দান, মঠপ্রতিষ্ঠা, আরাম, জলাশয়, ও গোষ্ঠাদি নির্ম্মাণ করে, যিনি স্বশক্তি অনুসারে কুমারী ও ব্রাহ্মণগণের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দেন, যিনি শিষ্যগণকে বিদ্যা প্রদান করেন, ভীতব্যক্তিকে অভয় প্রদান করেন, সে ব্যক্তির কখনও প্রেতত্ব হয় না। পতিতের অন্ন ভোজন করিয়া সেই অন্ন উদরে থাকিতে থাকিতে যাহার মৃত্যু হয়, এবং যে ব্যক্তির পাপরোগাদি হেতু মরণ হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয় প্রেতত্ব লাভ করে। যে অযাজ্যযাজক, এবং যাজ্য ব্যক্তিদের বর্জ্জন করে, যিনি কুরুগণের সহিত সর্ব্বদা বিচরণ করেন, যে ব্রহ্মস্ব দেবদ্রব্য ও গুরুদ্রব্য অপহরণ করে, যে ব্যক্তি শুল্ক গ্রহণ করিয়া কন্যা দান করে, মাতা, ভগিনী, পুত্রবধূ এবং কন্যা প্রভৃতিদের যে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করে, যে ব্যক্তি ন্যস্তবস্তু অপহরণ করে, যে ব্যক্তি মিত্র-দ্রোহকারী, পরদাররত এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতী, যে ব্যক্তি ভ্রাতৃদ্রোহকারী, ব্রহ্মঘ্ন, গোত্রঘ্ন, মদ্যপায়ী, গুরুপত্নীগামী, এবং যে ব্যক্তি কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অসত্য আচরণে সর্ব্বদাই রত থাকে, এবং যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও ভূমি অপহরণ করে, তাহাদের নিশ্চয় প্রেতত্ব হয়।' ব্রাহ্মণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ও তাহার সহবাসবশতঃ প্রেতগণের কুমতির নাশ হইল ও তাহাদের সদ্গতি হইল। বরাহপুরাণে এই স্থলে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে,

ব্রাহ্মণ কহিলেন 'প্রেতত্বমোচনে মথুরাবাসই শ্রেষ্ঠ উপায়। শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশী তিথিতে মথুরায় গিয়া যদি তাহারা বাস করে ও শ্রীকৃষ্ণের বামনমূর্ত্তির দর্শন করে ও তাঁহার পূজা হোম ইত্যাদি করে, তবে তাহাকে আর প্রেতযোনি ভুগিতে হয় না। আমি শুনিয়াছি, প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ মথুরামাহাত্ম্য শুনে, তবে তাহার প্রেতত্ব দূর হইয়া অক্ষয় বৈষ্ণবপদ অধিগত হইয়া থাকে।' প্রেতগণের ইচ্ছামতে ব্রাহ্মণ এক্ষণে তাহাদের কল্যাণকর শ্রবণাদ্বাদশী ব্রতের বিষয় বলিতে লাগিলেন। এই ব্রত মথুরাতীর্থে করিতে হয়। ব্রাহ্মণের এই কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, 'দেখ তীর্থপ্রভাব প্রত্যক্ষ লক্ষিত হইতেছে। কারণ এই তীর্থকথা শুনিতে শুনিতে তোমাদের সদ্গতি সমুপস্থিত বলিয়া মনে হইতেছে।' এমন সময় প্রেতগণের জন্য বহুবিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবদূতগণ বলিল, 'ব্রাহ্মণের মুখে তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণে তোমাদের প্রেতত্ব মুক্তি ঘটিল, তোমরা ঊর্দ্ধলোকে চল।' এই তীর্থ পিশাচতীর্থ নামে নির্দ্দেশিত আছে। বরাহপুরাণ ১৪ অধ্যায়ে এই তীর্থকর্ত্তব্য সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

উপর্য্যুক্ত উপাখ্যানকথিত প্রেতত্ব-প্রাপ্তির কারণ সকল পাঠ করিলেই শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। উপর্য্যুক্ত পঞ্চ প্রেতের পাপ আমরা কে না করিয়াছি? ঠাকুর-পূজার চিনি-সন্দেশ যত অল্প মূল্যেরই হউক দিতে হয়, জামাই কুটুম্ব আসিলে অতি উৎকৃষ্ট সন্দেশ না আনিয়া গৃহস্থ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, ইহাই আজ কালের গৃহস্থের ব্যবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। ভিক্ষুক আসিলেই, তাহার সবল দেহ-দর্শনে তাহাকে খাটিয়া খাইবার উপদেশ আমরা প্রত্যহই দিতেছি। ভিক্ষুকদের তিরস্কার করা সে ত বাটীর পঞ্চমবর্ষীয় শিশুগণ পর্য্যন্ত অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাল বলিয়া পাপের শাস্তির পরিমাণ

যদ্যপি কম না হইয়া থাকে, তবে আমাদের সমাজের অতি অল্প লোক-মাত্রই যে প্রেতত্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে আশা করা যায়। সাধারণতঃ প্রেতত্ব কি তবে আজকালকার লোকের একচেটিয়ার মত অধিকার হইয়াছে। গরুড়পুরাণেও লিখিত আছে, কলিকালে অনেকেরই প্রেতত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। প্রেতগণ নিজকুলের পীড়া উৎপাদন করে, ছিদ্র পাইলে অপরেরও পীড়ন করিয়া থাকে। প্রেতের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়, রোদন করিতে নাই। বন্ধুগণ রোদন করিয়া শ্লেষ্মা ও অশ্রুমোচন করিলে মৃতব্যক্তিকে ঐ শ্লেষ্মা ও অশ্রু ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব মৃত ব্যক্তির জন্য রোদন করিবে না, পরন্তু যথাশক্তি তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিবে। কেবলমাত্র এই রূপেই মৃতের মঙ্গল করা যাইতে পারে।

আমরা পৌরাণিক উপর্য্যুক্ত বিবরণ পাঠে বুঝিলাম যে মৃত্যুর পূর্ব্বে মানব যতই জগতে পাপাচরণে নিযুক্ত থাকে, ততই তাহাদের মৃত্যুর পর প্রেতত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশী থাকে। আমরা ইহা জানি যে মৃত্যুর পর জীবকে যে লোকে যাইতে হয়, তাহাকে কামলোক কহে। এই কাম অর্থে কামনা, বাসনা, ইচ্ছা, তৃষ্ণা বুঝায়। এই কামলোকের মূল পদার্থ বা জমি আমাদের মর্ত্ত্যলোকের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থ অপেক্ষা অতিশয় সূক্ষ্ম হইতেছে। এখানকার চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থই এই সূক্ষ্ম পদার্থে গঠিত। মর্ত্ত্যলোকে যেরূপ সূক্ষ্মতার তারতম্য অনুসারে কঠিন, তরল, বাষ্পীয়, ইথিরিয় প্রভৃতি সাত বিভাগ আছে, সেইরূপ কামলোকেরও সূক্ষ্মতার তারতম্য অনুসারে উক্তরূপ সাত বিভাগ আছে। এক এক স্তরের পদার্থ অন্য স্তরের পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম। আমরা আমাদের কামনা বা বাসনাকে বস্তুমধ্যে গণ্য করি না, কিন্তু ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তু হইতেছে। আমাদের

মর্ত্ত্যলোকের সর্ব্বোপরি বিভাগের অতি সূক্ষ্ম বস্তুর অপেক্ষাও এই বাসনার নির্ম্মাপক উপাদান অতি সূক্ষ্ম হওয়ায়, আমরা আমাদের বাসনাকে বস্তু বলিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি বিশেষ ভাবে উন্নত হইয়াছে,—যাঁহারা কামলোকের পদার্থ দেখিতে পাইয়া থাকেন, তাঁহারা দেখেন যে কামলোকের যাবতীয় পদার্থ যে বস্তু লইয়া গঠিত, বাসনাও সেই বস্তু দ্বারা সেইরূপে গঠিত। এবং অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বাসনার আকার, বর্ণ প্রভৃতি আছে। তাঁহারা আরও দেখেন যে বাসনা যে পরিমাণে ভাল, সেই পরিমাণে বেশী সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। সুবাসনা অতি সূক্ষ্ম কণায় নির্ম্মিত, কুবাসনা কামলোকের সর্ব্বোপরি স্থূল (যাহা অবশ্য পৃথিবীর বস্তু অপেক্ষা অনেকাংশে সূক্ষ্ম) কণা সকলে গঠিত হয়। রাগ, দ্বেষ, হিংসা, ব্যভিচার, পরাপকার, হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রভৃতির উপাদান অতিস্থূল। কামলোকে যে সাতটি স্তর আছে, তন্মধ্যে প্রথম স্তর অপর ছয় স্তর অপেক্ষা স্থূল হয়, কাজেই কুবাসনা সকল এই স্তরেরই অন্তর্গত হইতেছে। কাজেই যে সকল মৃত ব্যক্তির মনে কুবাসনা প্রবল রহিয়াছে, তাহাদের কামদেহ এইরূপ স্থূল কণাবহুল হওয়ায় তাহাদের এই সর্ব্বনিম্ন প্রথম স্তরে বাস ব্যতীত উর্দ্ধস্থ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অপর ছয়টি স্তরে যাইবার অধিকার থাকে না।

মৃত্যুর পর মানবের ক্ষিতি, অপ্, তেজঘটিত, অর্থাৎ কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় বস্তুঘটিত ভাণ্ডদেহ পড়িয়া থাকে ও এইদেহ আমরা নষ্ট করিয়া ফেলি। এই ভাণ্ডদেহই আমাদের জড়দেহ, ইহা আমরা সকলেই দেখিতে পাইয়া থাকি। এই দেহ ব্যতীত মানবের আর একটি দেহ এই মর্ত্ত্যলোকে বাসকালে থাকে, তাহাকে পিণ্ডদেহ কহে। এই দেহকে আমরা দেখিতে পাই না। কারণ যে জড় পদার্থে মানবের ভাণ্ডদেহ গঠিত, সেই কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় জড়পদার্থ অপেক্ষা ইথিরিক, প্রভৃতি

পার্থিব জড়ের অপর চারিটী সূক্ষ্ম বিভাগের পদার্থ দ্বারা এই দেহ গঠিত। এই দেহে পৃথিবীর ৭ম, ৬ষ্ঠ, ৫ম ও ৪র্থ বিভাগের যথাক্রমে আদি, অনুপাদক, ব্যোম ও মরুত নামক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা মাত্র থাকে; ইহাতে কঠিন, তরল বা বাষ্পীয় কোন কণা থাকে না। আমরা এই শেষ চারিটী বিভাগের বস্তুকে সূক্ষ্ম বলিয়া দেখিতে পাই না; সাধারণতঃ ইহারা আমাদের দৃষ্টিশক্তির অতীত। এই পিণ্ডদেহ ভাণ্ডদেহ-দাহকালে সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই দাহপ্রথা আজকাল অনেকে ভাল বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, অবশ্য অন্যান্য কারণও আছে। মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতিদের মধ্যে দাহপ্রথা না থাকায়, উহাদের পিণ্ডদেহ কবরস্থানের উপরেই বর্ত্তমান থাকে, এবং মৃত্তিকামধ্যে ভাণ্ডদেহ যেরূপ ধীরে ধীরে ধ্বংস হইতে থাকে, ইহাও সেইরূপ ধীরে ধীরে ধ্বংস হইতে থাকে। মৃত্যুকালে কোন মানব স্বীয় আত্মীয়কে দেখিবার জন্য বা তাহাকে আপনার অবস্থা জানাইবার জন্য তীব্র ইচ্ছা করিয়া থাকিলে, এই পিণ্ডদেহ সেই আত্মীয়কে দেখা দিয়া থাকে ও তাহার নিকট যাইয়া থাকে। এই দেহ কথা বলিতে পারে, যেন নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্নমত অবস্থায় প্রকাশ হইয়া থাকে মাত্র। এই পিণ্ডদেহ কবরের উপর থাকা কালে উহার অবয়ব মৃত ব্যক্তির অবয়বের মতই থাকে, কখনও বা বেগুণে রংএর বাষ্প মত থাকে। মৃত্যুর অব্যবহিত কালমধ্যে এই পিণ্ডদেহকে ক্ষণকালের জন্য জীবিত করা যাইতে পারে।

মর্ত্ত্যলোকে মানব-দেহের বহিরাবরণ এই ভাণ্ডদেহ থাকে। মৃত্যুর পর কামলোকে তাহার বহিরাবরণ কামদেহ হইয়া থাকে। এই কামদেহ মর্ত্ত্যলোকের মানবদের জীবিত থাকা কালেও সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে,—কিন্তু মৃত্যুরপর তাহা বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং আমাদের সকল কার্য্যই এই দেহসাহায্যে তখন করিতে হয়। জীবিত থাকা

কালে মানব পৃথিবীতে এই দেহসাহায্যে সুখ দুঃখ বোধ, বাসনা, তৃষ্ণা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি ভোগ করিয়া আসিয়াছে, কাজেই কামলোকেও মানব ঐ দেহসাহায্যে ঐরূপ ইন্দ্রিয়সুখভোগে সমর্থ থাকে। ইন্দ্রিয়গুলি তাহার পার্থিব দেহে ছিল, কিন্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি এই কামদেহে থাকায় ইন্দ্রিয়-সুখবোধ এই কামদেহসাহায্যেই মর্ত্ত্যলোকে মানবের হইয়া থাকে। এই কামদেহ পূর্ব্ব হইতে মানবের সহিত থাকিলেই, মৃত্যুর পর ইহাই বহিরা-বরণ হইয়া পড়ায়, এই দেহের কণা (tissue) সকল ক্রমশঃ ওলট পালট হইয়া নূতন ভাবে সজ্জিত হইতে থাকে! যে সকল কণা (অর্থাৎ cells বা tissue) সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল তাহার দ্বারা সর্ব্ববহিরাবরণ হয়, তাহার পরের আবরণ তাহার অপেক্ষা একটু সূক্ষ্ম কণায়, তদপেক্ষা একটু বেশী সূক্ষ্ম কণায় তাহার ভিতরের তৃতীয় আবরণ; এইরূপ সূক্ষ্মতার আধিক্য অনুসারে এক এক স্তর অন্য অন্য স্তরের ভিতরে যাইতে থাকিবে। এইরূপ অসংখ্য স্তর লইয়া একটি কামদেহ হইয়া থাকে। আমাদের পার্থিব দেহের যেমন কণার ক্ষয় হইয়া ভোজনজন্য নূতন কণা জন্মাইতে থাকে, কামদেহের সেরূপ হয় না। কামদেহের বাহির হইতে এক একটি করিয়া আবরণ খোলোস রাখামত হইয়া খসিয়া যাইতে থাকে, এমতে জীবের কামদেহ কালসহকারে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইতে থাকে। ভূলোকে যেমন জড়দেহ ত্যাগ হইলে তাহা নষ্ট করা হয়, কামলোকে জীবের যে ক্ষয়প্রাপ্ত কামদেহ জীব ছাড়িয়া স্বর্গলোকে যায়, তাহা কেহ নষ্ট করে না, কামলোকেই থাকিয়া যায়। এই পরিত্যক্ত অসংখ্য কামদেহ কামলোকে রহিয়াছে। সদ্যমৃতলোকে ঐ সকল পরিত্যক্ত কামদেহ দেখিয়া ভীত হয়। আবার ঐ সকল পরিত্যক্ত দেহমধ্যে নানাপ্রকার নিকৃষ্ট প্রাণী প্রবেশ করিয়া, কোন মূর্ত্তি ধরিয়া মর্ত্ত্যলোকবাসী বা কাম-লোকবাসীদের নিকট জুয়াচুরী করিয়া থাকে। এইরূপ এক প্রতারণার

কথা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিব। কামদেহ এইরূপে গঠিত ও সজ্জিত হইবার কাল বোধ হয় মৃত্যুর পর দশ দিন। বোধ হয় সেই জন্যই শাস্ত্রে এই দশ দিনে দশ পিণ্ড দিবার বিধান আছে। বোধ হয় এই কামদেহের সাজান হইবার অবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়া পুরাণে ঐ সময়ের নবপিণ্ড হইতে প্রেতদেহের সৃষ্টি হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। এইরূপে কামদেহ সজ্জিত হইলে চৈতন্যশক্তি ঐ কামদেহমধ্যে থাকিয়া, বাসনা হইতে মনকে পৃথক্ করিতে থাকেন। কামদেহের ঐরূপে এক প্রকার দুর্ভেদ্য অবস্থা হওয়ায়, পার্থিব লোকের বাসনা প্রভৃতি যাইয়া আবরণ মধ্যস্থিত চৈতন্যশক্তিকে বড় একটা আন্দোলিত করিতে পারে না। যতই মানব কামলোকে বাসনা, তৃষ্ণা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির উত্তেজনা বন্ধ করিয়া থাকিতে পারে, ততই তাহার কামলোক বাসের সময় কমিয়া আসিতে থাকে। এবং কালসহকারে বহিরাবরণগুলি এক এক করিয়া খসিয়া যাইতে থাকে। তবে এই আবরণগুলি একেবারে খসিয়া যায় না।

যে সকল মানব প্রবল বাসনা বশতঃ পৃথিবীর আত্মীয় স্বজনের জন্য কামলোকেও চিন্তিত থাকে, বা রাগ, দ্বেষ, হিংসা, লাম্পট্য, পানাসক্তি প্রভৃতি বশতঃ পৃথিবীতে ফিরিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের এই কামলোকীয় কামদেহ ক্রিয়াশীল থাকে। জীব কামদেহসাহায্যে ক্রিয়া করিতে থাকা হেতু, এই কামদেহ হইতে তাহার মনোময় দেহের পৃথক্‌জ্ঞান শীঘ্র হইতে পারে না। সে কামদেহকেই 'আমি' জ্ঞান করিয়া তাহার মন ও চিন্তার সহিত ঐ সকল কামদেহজনিত প্রবৃত্তির কার্য্যসকলকে তাহার নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই হেতু জীবকে কামলোকে আবদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া যাইতে হয়। আমরা পৃথিবীতে থাকার কালে, এই পার্থিব দেহকেই 'আমি' বলিয়া জ্ঞান রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকি; রাগ,

দ্বেষ, বাসনা প্রভৃতিকেও 'আমি' বলি, চিন্তা প্রভৃতিও 'আমি'র মধ্যে জ্ঞান করিয়া থাকি; এইরূপে কার্য্য করায়, আমাদের মন অনেকটা কামনার সহিত মিশিয়া যায়। আমাদের বুঝিতে হইবে প্রকৃত 'আমি' সেই জীবাত্মা; মন, বাসনা ও জড়দেহ এই জীবাত্মার খোসামাত্র, এই জ্ঞান না থাকাই বদ্ধ অবস্থা; এই প্রভেদজ্ঞান যতটা থাকিবে, আমাদের ততটা মুক্তাবস্থা। স্বর্গে যাইতে হইলে জড়দেহ, কামদেহ ছাড়িয়া মনোময় দেহ লইয়া যাইতে হয়; এই জড়দেহ ও কামদেহ আমার নয় বলিয়া জ্ঞান হইলে তবে স্বর্গে যাইবার সময় হয়, তবেই আমরা কামদেহ ছাড়িয়া কামলোক হইতে বাহির হইতে পারিব। যাহা হউক যতদিন না মনের সহিত বাসনার মেশামিশি ভাব কাটিয়া যায়, ততদিন জীবকে কামলোক ছাড়িয়া মনোময় লোক স্বর্গে যাইতে হয় না। আত্মীয়-স্বজন মৃত মানবের জন্য শোক করিয়াও মৃতের কামদেহকে ক্রিয়াশীল করিয়া দেয়, অর্থাৎ তাহার কামদেহে বাসনা জাগাইয়া দেয়। আত্মানয়ন-চক্রে অনেককে টানিয়া আনিয়া ঐরূপে তাহাদের বিপন্ন করা হইয়া থাকে। যে বৃত্তির ব্যবহার না করা যায়, তাহা কালক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে; যে ইন্দ্রিয় চালনা করা না যায়, তাহা ক্রমে অশক্ত হইয়া পড়ে। সেইরূপ মৃত্যুর পর মানবের চৈতন্য-শক্তি অন্তর্মুখী থাকে বলিয়া তাহাদের কামদেহের বৃত্তিগুলিও ক্রিয়ার অভাবে ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যায় ও কামদেহের ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে ও মনোময় কোষ জীবাত্মা সহ কামদেহ ছাড়িয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে।

মৃতের জন্য শোক করিলে এই শোক যাইয়া কামদেহকে আঘাত করিয়া তাহাকে শোকাভিভূত করিয়া ফেলে। এইরূপে মানবের শোকবশতঃ কামলোকীয় দেহে যে চৈতন্যশক্তি অন্তর্মুখী ছিল তাহা বহির্মুখী হইয়া পড়ে ও কামদেহসাহায্যে বাহিরে ক্রিয়াশীল হয়, অর্থাৎ ঐ মৃত মানবের কামদেহে পার্থিব আত্মীয়দের জন্য শোক ও তাহাদের

দর্শন ইচ্ছা প্রকাশ পায়, এইরূপে কামদেহ ব্যবহারহেতু জীব কামদেহকে 'আমি' নয় বলিয়া বুঝিতে পারে না; মনের সহিত কামদেহের পার্থক্য উপলব্ধি হইতে ব্যাঘাত ঘটে ও কামলোকে কালবিলম্ব ঘটিয়া যায়। অন্যের দ্বারা মৃত মানবের কামলোক বাসের সময় এইরূপে বাড়িয়া গিয়া থাকে। আবার প্রবল বাসনাসক্ত মানব নিজ বাসনা কামলোকে যাইয়াও ত্যাগ করিতে না পারিয়া, সেই সকল বাসনা পূরণের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। মদ খাইবার ইচ্ছা যাহার বেশী, সে মদ খাইবার জন্য অধীর হইয়া পড়ে; মুখ নাই, পানের ইচ্ছা প্রবল, মদও সম্মুখে দেখিতে পায়, কামদেহে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয় ও কষ্টবোধ হয়, এইরূপে কামদেহের অবিরত ক্রিয়া হইতে থাকায়, সে কামদেহকেই 'আমি' বলিয়া জ্ঞান আর ছাড়িতে পারে না। তাহার চৈতন্য অন্তর্মুখী না হইয়া বহির্মুখী থাকিয়া যায় ও তাহাকে দীর্ঘকাল কামলোকে থাকিয়া যাইতে হয়। মৃত মানব এইরূপে নিজ নিজ প্রবল বাসনা হেতু কামলোকে বদ্ধ অবস্থায় থাকে। মৃত মানবদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের পার্থিব আত্মীয়দের মধ্যে কাহারও উপর লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন ও ইহার বিপদাপদের সম্ভাবনা হইলে আপন মূর্ত্তিতে তাহাকে দেখা দিয়া সতর্ক করিয়া দেন বা তাহাকে বিপদ্‌কালে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশে সেই মৃত ব্যক্তিকে কামলোকে বদ্ধ অবস্থায় থাকিতে হয়; তবে এইরূপে বেশী দিন থাকে না। কেহ কেহ তাহাদের অন্ধবিশ্বাস বশতঃ মনে করে যে পৃথিবীতে বাসকরা কালের কোন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে না পারা হেতু, তাহার ভবিষ্যতে বড়ই ক্লেশ পাইতে হইবে; এই জন্য সে মৃত্যুর পর কোন না কোন ব্যক্তির সাহায্যে সেই কার্য্য সম্পন্ন করাইবার চেষ্টায় থাকে। তাহার চৈতন্য এইরূপে বাসনা বশতঃ বহির্মুখী থাকিয়া যায়, যতদিন না তাহার সেইকার্য্য সুসম্পন্ন হয়,

ততদিন তাহাকে কিছুতেই অন্তর্মুখী করিবার বাসনা ত্যাগে মতি করান যায় না। এই অবস্থায় ইহারা আত্মীয়দের দেখাদিয়া থাকে। কেহ কাহারও কিছু ধারে, পরিশোধ করিয়া যাইতে পারে না; তাহার অন্ধবিশ্বাস আছে ঋণপাপ মহাপাপ, এ পাপ থাকিলে ভোগ অনেক, কাজেই মৃত্যুর পর এই ঋণজন্য সে বিশেষ উদ্বিগ্ন থাকে, কিসে তাহার ঋণ শোধ হইবে এই ভাবনায় সে মর্ত্ত্যলোকে মানবের সম্পর্কে থাকিয়া কাহারও সাহায্যে ঋণমোচনের চেষ্টায় থাকে। কাহারও কোন গুপ্তধন এমন স্থানে রহিয়াছে, যাহা কাহারও পাইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ তাঁহার ইচ্ছা সেই ধন কোন আত্মীয়বিশেষে পায়, এই অভিলাষ বশতঃ তিনি কামলোকের নিম্নস্তরে থাকিয়া সেই আত্মীয়কে ঐ গুপ্ত ধনের বিষয় জানাইবার চেষ্টা করেন ও সমর্থ হইলে তাহাকে দেখাদিয়া অবগত করান, অক্ষম হইলে তাঁহার কামলোকের নিম্নস্তর বাস আর শেষ হয় না, বহুকাল এই অবস্থায় তিনি থাকিয়া যান।

ছেলেদের জন্য কোন সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই, এই ভাবনা কাহারও মৃত্যুর পরও প্রবল থাকিয়া যায়, তিনি এইবিষয়ে কোন কিনারা করিবার জন্য পৃথিবীর সম্পর্কে কামলোকের সর্ব্বনিম্নস্তরে থাকিয়া দাতা লোকের বা ধনবান্ আত্মীয় লোকের গোচরে আপন ছেলেদের আনিবার চেষ্টা করেন। এই সকল লোক যে বাসনার বশে পৃথিবীর সম্পর্কে কাম-লোকের নিম্নস্তরে থাকিতে বাধ্য হয়েন, সে বাসনা কুবাসনা নহে, এবং তাহার নির্মাপক অণুসকলও কামলোকের নিম্নস্তরের মত স্থূল নহে, ইঁহারা মাত্র নিজের অদম্য বাসনার জন্য বদ্ধ থাকেন, কাজেই কোন উপায়ে ইঁহাদের ঈপ্সিত ব্যাপার সিদ্ধ হইলেই ইঁহারা একেবারে উর্দ্ধলোকে চলিয়া যান। পরার্থে এইরূপ নিজের ক্ষতি করিয়া বদ্ধ অবস্থায় থাকায়ও একটা ফলের তাহারা অধিকারী হয়েন। (শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী বি এ, বি এল্।)

নরকোৎসব।

দশম উল্লাস।

গান।

আমায় রোগে ধরিল,—শয্যা গ্রহণ করিলাম। ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিলেন, যকৃতের ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলায় ব্যাধি জন্মিয়াছে। যকৃৎ খারাপ হইয়াছে—সবিশেষ সুচিকিৎসায় আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারে। চিকিৎসার কোন ত্রুটী হইল না,—তিন চারি মাস ধরিয়া কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছুই উপকার হইল না।

ক্রমে আমি জীর্ণ হইতে লাগিলাম। উঠিতে গেলে মাথা টলিয়া পড়িত,—ক্ষুধা মাত্রই ছিল না,—আহারের নামও স্মরণ করিতে ভয় হইত। জগতের কিছুই ভাল লাগিত না,—যাহার রূপের মোহে ইহ পরকালের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও স্মরণ করিবার অবকাশ পাই নাই,—সে কাছে আসিলে যেন মনে যন্ত্রণা উপস্থিত হইত! সন্ধ্যা নিকটে আসিলেই যেন কার্ত্তিকঠাকুর দা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিত। সন্ধ্যাকে মোটেই ভাল লাগিত না। তাহাকে দেখিলে ইহকাল মনে পড়িত,—পরকাল মনে পড়িত;—আর অনুতাপের তপ্ত ব্যথা যেন হৃদয় হইতে উঠিয়া আমার সমস্ত দেহকে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত; সে ব্যথার করুণ রবে আমার আত্মা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িত। তবে এ ব্যথা কেবল যে, সন্ধ্যাকে দেখিলেই হইত তাহা নহে। ইহা এখন আমার নিত্য সঙ্গী। এ ব্যথার বংশীরব আমার কাণে সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইত। এ ব্যথা আমার কলুষ-ক্লিষ্ট

আত্মার আত্ম-হারা রোদন। এ ব্যথা আত্মার উপর রক্তমাংসের বিপুল দংশন। তবে সন্ধ্যা নিকটে আসিলে, অথবা সময়ে সময়ে এ যাতনা বৃদ্ধি পাইতমাত্র।

এই অবস্থায়—এক একবার মনে হইত, ভগবানের দয়াল নাম গ্রহণ করি, তাঁহার শান্তিময় নামের বলে অশান্ত জীবনে শান্তি আসিতে পারে। চেষ্টা করিতাম,—হইত না। প্রাণে তাহার স্থান ছিল না। ভগবানের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাসই আসিত না। বর্ষণলঘু মেঘের মত সে ভাব অল্প-ক্ষণেই হৃদয়াকাশ হইতে উড়িয়া যাইত। এতদিন যে সকল কাজ করিয়াছি,—সেই সকল কাজের একান্ত চিন্তাই যেন প্রাণে একটু শান্তি দিত। কল্পনার বলে গাড়ী যুড়ী কামিনী কাঞ্চন নেশা-ব্যসন এই সকলের নূতন নূতন সংস্করণ মনের মধ্যে গড়াইয়া লইয়া, তাহারই চিন্তা করিতে ভাল লাগিত। ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর যেমন শুষ্ক অস্থি চর্ব্বণ করিতে করিতে তাহারই দন্তমূল বিগলিত শোণিত-ধারায় তৃপ্তিবোধ করে,—আমিও তদ্রূপ আত্ম-কৃত কুকর্ম্মরাশির সংস্কারবিগলিত কল্পনা লইয়া তৃপ্তি বোধ করিতাম।

মানুষ ভাবে, এখন আমার নূতন বয়স, নূতন জীবন,—এখন শুষ্ক ধর্ম্মের চর্চ্চা করিব কেন; জরা আসুক, তখন সে সকল হইবে। কিন্তু তা' হয় না। আমার জীবন দিয়া আমি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি,—মনে হইত, ভগবানের চিন্তা করি, কিন্তু সাধ্য কি? তাহা প্রাণে স্থানই পাইত না। আগে যে সকল কাজ করিয়াছি, তাহার সংস্কার মনের সকল যায়গায় দাগমারা হইয়া গিয়াছে,—সেই সংস্কার এখন চিন্তনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

যাক্,—আমার কথা বলিব, তাহাই বলি।

তখন আমি বাড়ী আসিয়াছি। বাড়ীই থাকিতাম। সন্ধ্যা দুই এক-দিন অন্তর আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইত।

সে দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমি আমাদের বাড়ীর দরোজার সম্মুখে বসিয়া একটি কল্পনা-লোক-বাসিনী কামিনীর রূপ লইয়া চিন্তা করিতে-ছিলাম—হাব-ভাব-কটাক্ষে মজিয়াছিলাম, এমন সময় এক ভিখারিণী আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—"দাদাবাবুর শরীর যে একেবারে গলিয়া গিয়াছে দেখিতেছি। তোমার কি অসুখ গা ?"

ভিখারিণীর সহিত আমার কখনও পরিচয় নাই। তবে মধ্যে মধ্যে তাহাকে ভিক্ষা করিতে আসিতে দেখিয়াছি মাত্র। তাহার আগমনে আমার কল্পনা-সুন্দরী অন্তর্হিতা হইল, কাজেই মাগীটার উপর ভারী রাগ হইল। তাহাকে ধমক দিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু সে ততক্ষণ আমাদের বাড়ীর মধ্যে প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমাকে প্রশ্ন করিয়া তাহার উত্তরের অপেক্ষা করে নাই,—বোধ হয়, তত সময় নষ্ট করা তাহার পক্ষে অনাবশ্যক বোধ হইয়াছিল,—ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের উপরে তাহার যত অনুরাগ, আমার ব্যাধির বিবরণ শ্রবণে তত নহে!

প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া ভিখারিণী দীর্ঘস্বরে ডাকিল--"মা ঠাকুরুণ গো, ভিক্ষা দাও। কেউ গান শুন্‌বে না ?"

কেহই কোন উত্তর করিল না। ভিখারিণী কিন্তু গান গাইতে নিরস্ত থাকিল না। সে গান ধরিল!

গান কি হৃদয়বিদারক! মনের মধ্যে যে সকল স্মৃতি ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মত পড়িয়া থাকে,—তাহাকে একেবারে জ্বালাইয়া দেয়। নব-বসন্তের অবসানোন্মুখ দিবসে যখন ভিখারিণীর কণ্ঠ হইতে উচ্চস্বরে গান গীত হইতে লাগিল, তখন তাহার ভাব কি মর্ম্মভেদী হইয়াছিল, তোমরা তাহা হয়ত বুঝিতেই পারিবে না।

ভিখারিণী গাহিতেছিল—

"সাধের ঘুম-ঘোর কভু কি ভাঙ্গিবে না।
কাল বিছানায় শুয়ে, আশার চাদর ঢাকা
কতদিন গেল কেটে, বিবেক-রজক-ঘরে
তারে ধুয়ে লও না॥
বিষয়-মদ খেয়ে, আছ তুমি মাতাল হ'য়ে
সে মদের ঘোর কি কভু কি ভাঙ্গিবে না॥
কোলে করি আছ শুয়ে, কামনা-স্বরূপা মেয়ে,
তারে ছেড়ে একবার পাশ ফির না।
কি ছার ঘুমখানি, যতনে সেধেছ তুমি,
সুখের রজনী কিরে কভু ভোর হবে না॥
কিন্তু এ ঘুমঘোরে, মহা ঘুম ঘেরিবে তোরে,
ডাকিলে চেতনা সে দিন আর ত মিলিবে না।
তখন প্রাণের বাছাগুলি, প্রিয়ারও আকুল বুলি,
ডেকে ডেকে আর তোমায় জাগা'তে পারিবে না।
এখন ফিরে যাবার বেলা হ'ল, আর কেন ঘুমাও বল,
সময় থাকিতে কেন হরি হরি বল না॥"

গানটি পুরাতন, তথাপি গানের প্রত্যেক কথাগুলি যেন বিষমাখান তীক্ষ্ণধার সূক্ষ্ম ছুরিকার ন্যায় আমার মর্ম্মত্বক্ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সেই থিয়েটারের দিন হইতে আর আজ পর্য্যন্ত যেন একখানি আলেখ্য হইয়া আমার মনশ্চক্ষুতে পতিত হইল। মুহূর্ত্তে মনে হইল,—মানুষ এতটুকু! তাহার কাজ এতটুকু! পার্থিব হিসাবে—কালের গণনায় কয়েক বৎসর হইবে, কিন্তু মনে করিয়া দেখিলে, সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কয় মুহূর্ত্তের কার্য্য! অল্পক্ষণ—অতি অল্পক্ষণ! এই অল্পক্ষণের জন্য

মানুষ কত পাপ করে। আমি কত পাপ করিয়াছি। যদি এই কয়টা মুহূর্ত্ত—এই কয়টা দিন, একটা গাছতলায় পড়িয়া থাকা যায়, তথাপি মানুষের চলিয়া যায়। জন্ম ও মরণের মধ্যকাল কতটুকু! এরমধ্যে মানুষ কত দানবীয় কাজ সমাপ্ত করিয়া অনন্ত কালের জন্য তাহার জ্বালা সহ্য করিতে থাকে। বোধ হয় মায়া ইহার মূলীভূতা; এবং বিলাস ও ভোগায়তন দেহের প্রতি অতি দৃষ্টিই এই অধঃপতনের হেতু। দেহী জীব ঐশ্বর্য্যের শিখরে উঠিতে যাইয়া কতক দূর উঠিলে সুরাপায়ীর ন্যায় প্রমত্ত হইয়া পড়ে। তখন প্রমাদ-বহ্নিপানে দগ্ধপ্রাণ হয়।

ভিখারিণী ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেল। আমি আর চলিতে পারিলাম না। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল,—একটু একটু শীত অনুভব করিলাম। বোধ হয় জ্বর আসিল,—অতি কষ্টে—কোন প্রকারে ধীরে ধীরে গিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম।

একাদশ উল্লাস।

মানসিক গঠন।

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল। পালঙ্কের উপরে শুইয়া, আপাদ কণ্ঠ একখানা মোটা চাদরে আবৃত করিয়া উন্মুক্ত বাতায়নপথে ক্ষীণদৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম।

শূন্য—ফলপত্রবহুল নারিকেল বৃক্ষের মাথার উপর দিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলাম—শূন্য। সন্ধ্যারাগরঞ্জিত আকাশতল শূন্য—ধূ ধূ। একটা শকুনী পাক দিয়া উড়িয়া উড়িয়া সেই শূন্য পথে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। কোথায় যাইতেছে? কোথায় যাইবে? দেখিতে দেখিতে আমার মনে কেমন একটা ভয়-মিশ্রিত ভাবের উদয় হইল। কেন

হইল, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ভাবটা যে কি রকমের তাহাও ঠিক করিতে পারিলাম না। জীবনে কখনও ভাল মন্দ, ভাব অভাব, ন্যায় অন্যায়, এসকলের চিন্তা করি নাই। কার্ত্তিক ঠাকুরদার অতুল ঐশ্বর্য্য, সন্ধ্যার অপ্সরারূপ আর সুরার মত্ততা, ইহা লইয়াই দিন কাটাইয়াছি। সুতরাং কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে শিখি নাই,—বিচার বিশ্লেষণে অধিকার জন্মে নাই। সংসারে পাপপুণ্য বলিয়া যে কিছু আছে, তাহাও অনুভব করিবার অবকাশমাত্র পাই নাই। কিন্তু আজ অলস,অত্যাচারী, সুরাসক্ত অন্তঃপ্রকৃতি অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইয়া আমার হৃদয় মথিত করিতে লাগিল।

যদিও কোন গুরুতর চিন্তা করিতে আমি অশক্ত, তথাপি মনে পড়িতে লাগিল,—যাত্রা করিয়াছি বলিয়া বুঝি এ দুঃখের করুণধ্বনি। ব্যাধি আর সারিল না—ঐ শকুনীর মত আমাকেও উড়িয়া উড়িয়া উর্দ্ধে যাইতে হইবে।

মনে হইল, তাতে ক্ষতি কি? সংসারেই বা সুখ কি! আত্মগ্লানিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—বাঁচিয়া লাভ কি! কার্ত্তিকঠাকুরদার প্রেত-মূর্ত্তি আমাকে যেরূপ ভাবে তাড়াইয়া ফিরিতেছে, তাহাতে মরণই মঙ্গল।

কিন্তু! কিন্তু আবার কি? উষা—আমার অভাবে উষা বড় কষ্ট পাবে! চিরাচরিত অভ্যাসমত উষাকে কাল রাত্রে যখন অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছিলাম,—তখন তাহার যে দৃষ্টি দর্শন করিয়াছিলাম, হায়! তেমন আর কখনও দেখি নাই।—মরি মরি, সে দৃষ্টি কি করুণ কাতরতায় পূর্ণ। অনশনখিন্ন, প্রহৃত, পালিত কুক্কুর যেমন প্রভুকে দেখিয়া সস্নেহ কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া থাকে, সে দৃষ্টি তেমনই। সে চাহনি স্থির, অচঞ্চল অথচ বিষাদময়। সে বুঝি তখন তাহার দাম্পত্য জীবনের বিপুল বেদনারাশি আমরই পদে নিবেদন করিয়া নিখিল-স্বামীর চিরশান্তি-

মাথা চরণে আমার আরোগ্য কামনা করিতেছিল। উষার সেই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দৃষ্টিই আজিকার এই প্রাণের পরিবর্ত্তন ব্যাপারের মূল ;—তারপরে যা' দেখিতেছি, তাতেই যেন কতভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। আমি মরিলে বাস্তবিক তার গতি কি হবে! সহসা আমার কপালের শিরা সমুদয় টন টন করিয়া উঠিল। বুকের মধ্যে ধড় ধড় করিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গের রোম নিঃশেষিত স্বল্পাবশিষ্ট ক্ষীণ রক্তটুকু আগুন হইয়া উঠিল। আমার মনে পড়িল, কার্ত্তিকঠাকুরদার অভাবে সন্ধ্যা যা' করিতেছে, আমার অভাবে উষাও তাই করিবে!

কি সর্ব্বনাশ! কি ভীষণ তত্ত্ব! উষাও কি সন্ধ্যার মত পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হইবে? আমার মস্তকের কেশগুলা পর্য্যন্ত ফুলিয়া দাঁড়াইল—আমি কাঁপিতে লাগিলাম।

মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলাম। সন্ধ্যা যেমন, উষা তেমন নয়।

আমার মনের মধ্যে যেন দুইটা মানুষ আসিয়া দাঁড়াইল। দুই জন যেন প্রশ্নোত্তরে বিবাদ বাধাইয়া তুলিল।

একজন বলিল,—"সন্ধ্যা যেমন উষা তেমন নয় কি গা? উষা আর সন্ধ্যা এক বাপ-মার মেয়ে,—একই প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা।"

দ্বিতীয় গম্ভীর ভাবে বলিল,—"উষা সতী, সন্ধ্যা অসতী।"

প্রথম হাসিয়া বলিল—"সন্ধ্যা ত আর মায়ের পেট হইতে অসতী হইয়াই জন্মিয়াছিল না। এই পাপাত্মা পুরুষের প্রলোভনেই মজিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।"

দ্বিতীয়। একজন হইয়াছে বলিয়া কি আর এক জনেরও হইতে হইবে?

প্রথম। যদি হয়?

দ্বিতীয়। যদির কথা ছাড়িয়া দাও।

প্রথম। আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই হবে।

দ্বিতীয়। কেন ?

প্রথম। রমণী আর লতা সমান—গাছ যেমন লতাও তেম্‌নি হয়। যার স্বামী পরের সর্ব্বনাশ করে,—সেও সর্ব্বনাশী হয়।

আমি যন্ত্রণায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলাম !

দ্বিতীয় বলিল,—"অনেক যায়গায় দেখা গিয়াছে, স্বামী কুচরিত্র নরকের কীট, স্ত্রী আত্মসংযমে স্বর্গের দেবী।"

প্রথম। বাহিরে দেখিয়া মানুষের পাপ পুণ্য স্থির করা যায় না। স্বামীর জীবিত কালে যাহাকে সতী বলিয়া জানা যাইবে, স্বামী মৃত্যুর পরে তাহাকে অসতী দেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয়। ঊষা সেরূপ মানুষ নয়।

প্রথম। এই পাপাত্মা তাহাকে আজন্ম আদর সোহাগে বঞ্চিত রাখিয়াছে। প্রেমের সোহাগ, প্রেমের আদর কাহাকে বলে, সে তাহা বুঝিতেই পারে নাই। ইহার মৃত্যুর পরে যদি কেহ তাহাকে সেরূপ আদর লইয়া আহ্বান করে, তখন তাহার হইয়া পড়িবে। সন্ধ্যা বৃদ্ধের নিকট যুবকের রূপ পায় নাই, যৌবনের উদ্দাম সোহাগ পায় নাই, তাইতে ত যুবকের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল,—জীবমাত্রই অপ্রাপ্ত জিনিষের আশা পোষণ করে। পাইলেই আনন্দিত হয়।

দ্বিতীয়। কিন্তু তেমন মানুষ কোথায় পাবে ?

প্রথম। মানুষের অভাব কি ?

সহসা যেন আমি শুনিতে পাইলাম,—স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, কে যেন বলিয়া উঠিল—"কেন, আমি আছি।"

আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া গেল। উপাধান হইতে চকিতে মাথা তুলিলাম। উঃ ! কি ভয়াবহ দৃশ্য ! কি মর্ম্মান্তিক ঘটনা !

আসন্নপ্রায় সন্ধ্যার আবিল ছায়ায় নারিকেল বৃক্ষের মাথার উপরে কার্ত্তিকঠাকুরদা দাঁড়াইয়া এক দৃষ্টে উন্মুক্ত বাতায়নপথে আমারই দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

জোর করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সে দিকে চাহিয়া রহিলাম। কি বিকট মূর্ত্তি।

নারিকেল বৃক্ষের উচ্চশীর্ষ পত্রের উপরে পা দিয়া কার্ত্তিক ঠাকুরদা দাঁড়াইয়া আছে! তাহার গায়ে যেন মৃত্যুর কালিমা মাখা.—পরিধানে মৃত্যু-মলিন ছিন্ন বস্ত্র; সর্ব্বাঙ্গ খালি। চক্ষু দুইটী কোটরপ্রবিষ্ট—তথাপি অতি তীক্ষ্ণ। কণ্ঠ দিয়া রুধিরধারা ঝরিতেছে। তাহার বাহুযুগল যেন বাষ্পময়—সেই বাষ্পবাহুর অভ্যন্তরে যেন প্রতিহিংসার ভীষণ অনল প্রচ্ছন্ন ভাবে লুকানো আছে। শ্যাম-সবুজ কোমল নারিকেলপত্র তাহার পদভরে যেন ঈষৎ নড়িতেছে। আশ্রয়পত্র ঈষৎ নড়িতেছে—কার্ত্তিক ঠাকুরদাও ঈষৎ নড়িতেছে। কিন্তু সেই ঈষৎ নড়া যে কি ভীষণ, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য আমার নাই।

সন্ধ্যা শান্ত প্রকৃতি;—উপরে নবোদিত স্নিগ্ধ চন্দ্রকরোজ্জ্বল আকাশ —ধূ ধূ করিতেছে। হু হু করা সন্ধ্যার বায়ু জীবনের বৃহদারণ্যকগাথা গাহিয়া বহিয়া যাইতেছিল। দূরে অতীতের উদ্গীর্ণ কবলের মত পুরাতন মন্দির সর্ব্বাঙ্গে জীর্ণতার রহস্য-কাহিনী মাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আর সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃত্যুগন্ধী নিশ্বাস ফেলিয়া কার্ত্তিক ঠাকুরদা প্রেত-পুরের পূর্ণ স্বরে আবার বলিল,—"আমি আছি।"

আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। হৃদয় ফাটিয়া বুঝি রক্তধারা ছুটিতে লাগিল। আমি চক্ষু মুদিত করিলাম,—তথাপি নিষ্কৃতি নাই।

আবার চাহিলাম, দেখিলাম—কার্ত্তিকঠাকুরদা সেখানে নাই। কোথায় গেল?

আমার কাণে যেন বজ্রনাদে ধ্বনিত হইতে লাগিল—আমি আছি। আমি আছি।

আবার চক্ষু মুদিত করিলাম।

মুদিত চক্ষুতেই যেন দেখিতে পাইলাম, ঊষা কার্ত্তিকঠাকুরদার প্রণয়াসক্ত হইয়াছে,—আমরই সম্মুখে উভয়ে প্রেমের আলাপন—বড় আনন্দে সময় কাটাইতেছে। মুখে মুখে বাহুতে বাহুতে জড়ান—আঁখিতে আঁখিতে মিশান। প্রতিহিংসার আগুনে আমার প্রাণ জ্বলিয়া উঠিল। আর চক্ষু বুঁজিয়া থাকিতে পারিলাম না,—চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম ;—কেহ কোথাও নাই। কিন্তু প্রাণের জ্বালার উপশম হয় নাই।

মনে হইল, এ কি সর্ব্বনাশ ; কার্ত্তিকঠাকুরদা মরিয়া গিয়াছে—ভূত হইয়া ফিরিতেছে। সে ঊষার প্রণয়ী হইবে কি প্রকারে ? বৃথা আমার এ যন্ত্রণা কেন ? স্বপ্ন নহে—স্বপ্ন দেখিলে জাগরণে তাহার জ্বালা যায়। জাগ্রত অবস্থায় আমার এ কি যন্ত্রণা হইতেছে ? কোথাও কিছু নাই—তথাপি এ নরকযন্ত্রণা কেন ?

চাহিয়া দেখিলাম, ঘরে কখন কে আলো রাখিয়া গিয়াছে। কম্পিত, ঘর্ম্মাক্ত ও অবশ কলেবরে আমি উঠিয়া বসিলাম। বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়া আবার সেই নারিকেল বৃক্ষের দিকে চাহিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় দ্বার ঠেলিয়া ঊষা গৃহে প্রবেশ করিল।

দ্বাদশ উল্লাস।

প্রোজ্জ্বল দীপালোকে ঊষার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। ঊষাকে সে দিন বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। শুভ্র বসন্তের জ্যোৎস্নায় বালিকা বনশ্রীর বিধবা সঙ্গিনীর মত তবু সে সৌন্দর্য্যে যেন একটু করুণতার রাগ মাখান ছিল। ঊষার দক্ষিণ হস্তে ঔষধের খল, বাম হস্তে জলের গ্লাস।

উষা আসিয়া আমার শয্যার নিকটে দাঁড়াইল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তুমি উঠিয়াছ? একটু আগে যখন আমি আলো জ্বালিয়া যাই, তখন তুমি ঘুমাইয়াছিলে।"

"ঘুমাই নাই, চুপ করিয়া শুইয়াছিলাম,"—এই কথা বলিয়া উষার মুখের দিকে চাহিলাম। আমার চক্ষুর ভিতর জ্বলিয়া উঠিল। নাসিকা কর্ণ দিয়া আগুনের হল্‌কা ছুটিল,—সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম বাহির হইল,—উষার রক্ত-রাগরঞ্জিত গণ্ডে চুম্বন-চিহ্ন!

অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না। উষা বুঝি আমার সে অবস্থা বুঝিতে পারিল,—সে বিষাদ-কম্পিত স্বরে করুণভাষায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি অমন করিতেছ কেন? তোমার কি অসুখ বাড়িয়াছে?"

আমার স্নায়ুমণ্ডলী শিথিল হইয়া আসিতেছিল। চক্ষুর সম্মুখে আলোকমণ্ডিত গৃহদ্বার প্রভৃতি যেন বর্ত্তুলাকারে ঘুরিতেছিল। অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না। উষা ধীরে ধীরে পালঙ্কে উঠিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া তাহার কবোষ্ণ-মমতায় প্রস্ফুটিত পেলবপ্রসূন-করে আমার বক্ষোদেশ মার্জ্জন করিতে লাগিল। হয়ত সে ভাবিয়াছিল, ব্যাধির তাড়নায় কি প্রকারে আমার দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছে।

আমি নিষেধ করিলাম,—বিরক্তি সহকারে তাহার হাত সরাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"উষা, একটা সত্য কথা বলিবে?"

স্মিত মুখ ঈষৎ উন্নত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া উষা বলিল,—"আমি ত কখনও মিথ্যা বলি না;—বিশেষ, তুমি আমার দেবতা; তোমার সহিত মিথ্যা বলিব কেন?"

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগে হৃদয়জ্বালা উপশমের ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়া দৃঢ়-তার সহিত আমি বলিলাম,—"ও সব কথা ছাড় উষা"—

উষা বিস্ময়াবিষ্ট হইল। আমার কথায় সে কিছু ভীত, কিছু

বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কারণ, তাহার চোখ মুখ দেখিয়া, এবং তাহার গলার কম্পিত স্বর শুনিয়া আমি তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম। উষা বলিল—"কি সব কথা ছাড়িব ?"

আমি। ছলনার কথা।

উষা। ছলনার কথা! আমি তোমার সহিত ছলনা করি,—ছিঃ,—তুমি কেন এধারণা করিতেছ ? তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী,—আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করিব!

আমি। যদি কখনও করিয়া থাক, আ'জ করিও না। আমার আর সময় নাই—মরণ-দেশে যাত্রা করিয়াছি। যাহা সত্য—তাহা লুকাইয়ো না। পৃথিবীর গুপ্তরহস্য—প্রসুপ্ত বিনিময় বৈদিকতত্ত্ব জানিয়া যাইতে সাধ হইয়াছে।

উষা বোধহয় আমার কথা বুঝিতে পারিল না, সে করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমার বুকের মধ্যে তখন যে কি জ্বালা, তাহা বুঝাইয়া বলি, এমন ভাষা আমি জানি না। উষাকে যদিও কখনও ভালবাসি নাই—যদিও কখনও তাহাকে দাম্পত্য প্রেমের বিন্দু দানেও সোহাগ করি নাই, তথাপি সে পবিত্র—সে আমার, এ ধারণা—এ বিশ্বাস ছিল। আমি যতই তাহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করি, যেরূপেই তাহার প্রতি পশু-ব্যবহার করি, সে আমার মুখ চাহিয়া—আমার হইয়া থাকিবে, অথবা থাকিতে বাধ্য, এইরূপ ধারণা দৃঢ়মূল হইয়াছিল। আজ হঠাৎ তাহা লুপ্ত হইল। কে—কোন্ বিদেহী মানব—অথবা কোন দেহী তাহাকে প্রাণের বিনিময়ে বাঁধিয়া লইয়াছে। উষার হৃদয়ে আমার জন্য যে শান্ত স্নিগ্ধ নিবিড় নিরাপদ্ পুণ্য প্রেম-নীড় প্রতিষ্ঠিত ছিল, হয়ত আমারই কর্ম্মের ফলে এতদিনে তাহাতে একটা ক্রূর সর্প মৃত্যুময়—গরলময় বিবর খুঁড়িতে বসিয়াছে। সে হৃদয়ে একটা শ্যামস্নিগ্ধ বিশল্য-

করণী ছিল, মর্ম্মযোড়া শত শক্তিশেলবিদীর্ণ আমার কলুষিত প্রাণও হয়ত একদিন আরোগ্য হইত, কিন্তু তাহা তাহার উষ্ণ বিষদগ্ধ নিশ্বাসে চির-দিনের মত শুকাইয়া গেল। জীবনের গভীরতম স্তর হইতে উষার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অন্তস্তলে যে একটা করুণভাবে ভালবাসার ঊর্ম্মি উঠিত,—যে মহাসাগর আমাকে চাঁদ মনে করিয়া প্রতিদিন নিশীথ-স্বপ্নে জড়াইতে গিয়াছে, তাহা আমার কর্ম্মফলে কোন্ পাপাত্মার ওষ্ঠছাপে—প্রেম আলিঙ্গনে মরুভূমি করিয়া ফেলিয়াছে! দেবতার কি বজ্র নাই?

রুক্ষ—ধূ ধূ—মরুময়—রৌদ্রদগ্ধ কর্ম্মভূমি! তোমার এ কেমন বিচার! আমি পাপী—অনন্ত মহাপাতকে পাতকী—আমার বুকে দধীচির অস্থি-প্রস্তুত বজ্রপাত হউক,—সহস্র রৌরব—সহস্র পূতিগন্ধ নরক আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হউক;—কিন্তু আমার কর্ম্মফলে উষার পতন হইবে কেন?

আমার কপাল দিয়া গল গল করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। বিষণ্ণ চক্ষু মুদিয়া আসিতে লাগিল। আমি বালিসের উপরে ঢলিয়া পড়িতে ছিলাম। উষা ধাঁ করিয়া সরিয়া আসিয়া তাহার ক্রোড়ে আমার মস্তক ধরিল, এবং তালপত্রের ব্যজনী দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল।

উষার স্পর্শ অত্যন্ত কষ্টকর হইল, যতক্ষণ উঠিবার শক্তি ছিল না, ততক্ষণ তাহার ক্রোড়ে মাথা ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম, যাই একটু শক্তি হইল, আর অমনি উঠিয়া বসিলাম। শূন্যক্রোড় উষা যেন কিছু নিরানন্দ—কিছু উদাসভাবযুক্ত হইয়া ব্যাধ-জালধৃতা হরিণী যেমন ব্যাধকর-নিহতোত্তম হরিণের দিকে চাহে, তেমনই ভাবে আমার দিকে চাহিল।

আমি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দমে দমে বলিলাম,—"উষা, তুমি আর আমার নিকটে আসিও না।"

উষার মুখ বিষণ্ণ হইল। দর্পণে হাই দিলে তাহা যেমন ভাবে ঘামিয়া

উঠে, ঊষা তেমনই ঘামিয়া উঠিল। কচি কলাপাতের আগুনের সেক দিলে তাহা যেমন বিবর্ণ হইয়া উঠে, ঊষা তেমনই বিবর্ণ হইয়া উঠিল। করুণ নয়নের উদাস দৃষ্টি আমার মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া ঊষা করুণ স্বরে বলিল,—"কেন, আমি তোমার কাছে আসিব না কেন? চিরজীবন কাছে যাইতে দাও নাই—তখন সুস্থ ছিলে, না যাইতে দিলেও তত অধিক ব্যথা পাই নাই। কিন্তু এখন?—এখন তুমি পীড়িত, এখন রোগ-জীর্ণ—এখন তোমার নিকটে না আসিয়া থাকিতে পারিব না; কেহই পারে না। স্বামীর রোগজীর্ণ দেহের শুশ্রূষা না করিয়া দূরে থাকিতে পারে, এমন মেয়ে মানুষ আজিও জন্মে নাই। কিন্তু একটা কথা—

আমি। কি কথা?

ঊষা। যে অধিকারে আমায় এক দিন স্বর্গসুখ হতে অধিক সুখ দান করিয়াছ, আজ কেন তাহা হইতে হঠাৎ বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? দিদি কি তোমায় নিষেধ করিয়াছে?

আমি। না।

ঊষা। তবে তোমার এরূপ ভাবান্তর হইল কেন? আমাকে সত্য বলিতে প্রতিজ্ঞা করাইতেছিলে কেন?

আমি। হাঁ—কথাটা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। না ভুলিয়া আর কত পারি। একটা ক্ষুদ্র প্রাণ—আর জগতের কতটি প্রাণ তাহাকে দগ্ধ করিতে—নষ্ট করিতে—রৌরবে নিক্ষেপ করিতে সমুদ্যত! সর্ব্বদা ভীত চঞ্চলিত সন্ত্রাসিত প্রাণ লইয়া যে আছি, সে কেবল পরমায়ু ক্ষয় না হওয়ায়—মৃত্যু অভাবে। কিন্তু মৃত্যুর পরে আমার পরিণাম—দূর ছাই; যে কথা হইতেছিল, তুমি যদি মিথ্যা বলিবে না বলিয়া সত্য কর, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

ঊষা। সত্য করিলাম, মিথ্যা বলিব না।

আমি। তোমার গালে কিসের দাগ ?

দ্রুতগমনশীল পথিকের পদতলে বিষধর সর্প পতিত হইলে সে যেমন চমকিয়া উঠে, ঊষা যেন তেমনই চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বামগণ্ডে হস্তার্পণ করিয়া চকিত অথচ মৃদু কম্পিত স্বরে বলিল,—"আমার গালে দাগ !"

ঊষার দক্ষিণগণ্ডে স্পষ্ট চুম্বনচিহ্ন। বিরক্তি ও ঘৃণার সহিত আমি বলিলাম—"বাঁ গালে নয়। দক্ষিণ গালে।"

ঊষা দক্ষিণগণ্ডে হস্তার্পণ করিল। বলিল,—"দূর। আমার গালে আবার কিসের দাগ হইবে !"

গৃহদেওয়ালে দর্পণ লম্বিত ছিল, আমি বলিলাম—"উঠিয়া আয়নার কাছে গিয়া দেখ।"

ঊষা সে কথা গ্রাহ্য করিতেছিল না। আমি যখন পুনঃপুনঃ দেখিতে বলিলাম, তখন সে উঠিয়া গেল। দর্পণে নিজ গণ্ডদেশ দর্শন করিয়া সেও চমকিয়া উঠিল। আমি তাহার দিকেএক দৃষ্টেই চাহিয়াছিলাম, দেখিলাম, বায়ুতাড়িত বেতশীর মত থর থর কাঁপিতেছে। সে যে স্পষ্ট—অতি স্পষ্ট চুম্বনচিহ্ন।

আমি ডাকিলাম,—"ঊষা !"

ঊষা উত্তর দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম, —"এ দিকে এস, আরও কয়টা কথা জিজ্ঞাসার আছে।"

যন্ত্রচালিত পুতুলের মত ঊষা আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মূর্ত্তি তখন বড় বিষণ্ণ—হিমানীপাতসংক্লিষ্ট নলিনীর সহিত উপমেয়।

আমি বলিলাম—"আমার সহিত মিথ্যা বলিয়ো না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মরণ-পথের পথিক আমি, সংসারের আশা ভালবাসা সুখ স্বচ্ছন্দ আর

আকাজ্ক্ষা করি না—কেবল জানিতে ইচ্ছা, কি দিয়া কি ঘটাইয়া বসিয়াছি: ভাল, তোমার গালে কে চুম্বন করিল?"

উষা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"তুমি আমার দেবতা, জীবনে কখনও মিথ্যা বলি নাই, এখনও বলিব না। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কেহই আমাকে স্পর্শ করে নাই।"

আমি। তবে গালে দাগ হইল কেমন করিয়া?

উষা। তা' বলিতে পারি না।

আমি। দাগ হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছ?

উষা। হাঁ, দেখিয়াছি।

আমি। গালে দাগ কি আপনি হয়?

উষা। না।

আমি। তবে?

উষা। তুমি স্বামী—তুমি দেবতা, আমি তোমার পাদস্পর্শ করিয়া বলিতে পারি, আমি কিছুই জানি না। আমার গালে কেহ কোন স্পর্শ করে নাই,—জোরে একটু বাতাসও লাগে নাই, তবে কি প্রকারে যে অমন বিশ্রী দাগ হইল, তাহা বলিতে পারি না।

আমি কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলাম। চিন্তা করিয়া বিশেষ কোনরূপ ফল হইল না,—কোন একটা তত্ত্বে উপনীত হইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল, হয়ত উষা মিথ্যা কথা বলিতেছে। কোন গুপ্ত নায়কের সহিত প্রেম-আলাপন করিয়া কোন্ রমণী তাহা স্বামীর নিকট বলিয়া থাকে। শত দিব্য দিয়া, সহস্র প্রতিজ্ঞা করাইলেও কখনও সেকথা বলে না। উষাও গুপ্তপ্রণয়ীর ওষ্ঠসম্পুটচিহ্ন আমার নিকটে লুকাইয়া যাইতেছে।

কিন্তু উষার ভাবভঙ্গী দেখিয়া চোখ মুখের অবস্থা দেখিয়া মনে

হইতেছিল, এই চিহ্ন দর্শনে তাহার মনে আতঙ্ক হইয়াছে—বিস্ময় হইয়াছে. সে হয়ত এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

তবে কি প্রকারে এ চিহ্ন হইল? কার্ত্তিক ঠাকুরদা নারিকেলপত্রের উপরে দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল আমি আছি। উষার প্রণয়ী আমিই হইব। তবে সেই প্রেতদেহ উষার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া গেল। প্রেতের চুম্বন উষা জানিতে পারে নাই,—অলক্ষ্যে—অদর্শনীয় ভাবে চুম্বন করিয়া গিয়াছে? প্রতিশোধ লইবার জন্য সত্যই কি সে আমার স্ত্রীকে দখল ক'রয়া বসিল? প্রেতগণ কি ইচ্ছা করিয়া এ সকল কাজ করিতে পারে? হায়, তবে কি আমার কর্ম্মফলে—আমার কুকর্ম্মের বিনিময়ে উষাকেও পাপে মজাইব?

আমি বড় কাতর হইয়া পড়িলাম। প্রাণের মধ্যে বাজের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে কাটাইয়া দিলাম।

উষা ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনিমিক্ নয়নে করুণ-উদাস চাহনিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। যখন আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বালিসের উপরে একটু উঠিয়া বসিলাম, তখন বড় কাতর স্বরে—বড় আবেগ কম্পিত কণ্ঠে উষা বলিল,—"তুমি কি আমায় অবিশ্বাস করিলে?"

পুনরপি দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়তাপ বিদূরিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আমি বলিলাম,—"যে মহাপাতক করিয়াছি, তাহার প্রতিফল পাইব না? আমার পত্নী অবিশ্বাসিনা হইবে না? যে আগুনে কার্ত্তিকঠাকুরদার হৃদয় জ্বালাইয়াছি, সে আগুনে আমার হৃদয় জ্বলিবে না?"

উষা দশবার কথা কহিতে গিয়া থামিয়া পড়িয়া অবশেষে বলিল,—"তুমি নিশ্চয় জেনো—তোমার দাসী, তোমার উষা কখনও অবিশ্বাসিনী নয়। অপর শত পাতকে পাতকিনী উষা—স্বামীর নিকটে অবিশ্বাসিনী! স্বামীই তার জীবনের ধ্রুবতারা।"

ঊষার কথায় আমার আরও কষ্ট হইল। মনে হইল, হয় সে মিথ্যার ছলনাজালে আমাকে ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, নয় প্রতিহিংসা-সাধনেচ্ছু কার্ত্তিক ঠাকুরদার প্রেত আত্মা এই সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। হঠাৎ দরোজা নড়িয়া উঠিল। আমার ভগিনী পুঁটী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ঊষা ধাঁ করিয়া নামিয়া পালঙ্কপার্শ্বে দাঁড়াইল।

পুঁটী বলিল,—"দাদা, তন্ত্ররত্ন ঠাকুর এসেছেন।"

আমি। কে তন্ত্ররত্ন ঠাকুর?

পুঁটী। যিনি প্রেততত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। যাঁহাকে আনিবার জন্যে নীলুখুড়ো কাশী গিয়েছিলেন। এইমাত্র নীলুখুড়ো তাঁহাকে লইয়া এসে পঁহুছিলেন। বাবা বৈঠকখানায় তাঁহাদের নিয়ে কথা কহিতেছেন।

ঊষা সে সংবাদে বড়ই হর্ষোৎফুল্ল হইল। কার্ত্তিক ঠাকুরদার আতিবাহিকদেহের অত্যাচারের কথা বাড়ীশুদ্ধ সকলেই শুনিয়াছিল, এবং বহু চিকিৎসাতেও যখন রোগ আরোগ্য হইল না, তখন যে উহা ভৌতিক-ব্যাধি তাহাই সকলের ধারণা হইয়াছিল। দেশের ছোট খাট অনেক ওঝা দেখান হইয়াছিল,— এখন কাশীর তন্ত্ররত্ন মহাশয় আসিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

কপাল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—মাণি কখনই নয়! আমি বলিলাম "আমার স্ত্রী আমার মাণি; তুমি কে? কৈ তোমাতে ত তাহার কিছুই নাই।" বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "নিষ্ঠুর! আমিই

তোমার স্ত্রী মণি, কিন্তু তুমি আমায় ভুলিয়া গিয়াছ! না-না অসম্ভব! তুমি আমায় পরীক্ষা করিতেছ! আর পরীক্ষায় কাজ নাই। আমার জীবন পুড়িয়া গেল, হৃদয় ছারখার হইয়া গেল, আর সহ্য হয় না। এ যে কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা কাহাকে জানাইব, কে বুঝিবে! কতদিন আর এ জ্বালা সহ্য করিব, আপনার দুটী পায়ে ধরি বলুন—বলুন—" সহসা তাহার সেই পদ্মপুষ্পনিভ কোমল করতলে আমার চরণ ধারণে উদ্যতা হইল। আমি বাধা দিয়া বলিলাম—বাস্তবিক তাহার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখভঙ্গী, তাহার আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল—"তোমার কি কষ্ট! আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইতে পারে, বল; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার প্রাণের বিনিময়ে আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। আর আমি যদি তোমার যাতনার কারণ হই, আমা হইতে যদি তোমার কোন অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও বল—সে কার্য্যের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত কি, যতই কঠোর হোক, যতই ভীষণ হোক আমি প্রস্তুত।" "আপনি—আপনার প্রায়শ্চিত্ত, না—না, যার প্রায়শ্চিত্ত হইবার তাহা খুব হইতেছে, সে মর্ম্মে মর্ম্মে প্রাশ্চিত্তের মর্ম্মর দাহন অনুভব করিতেছে। মানবজীবনের মূল্য যে হেলায় হারাইয়াছে সেই জানে; দাঁত থাকিতে লোকে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না" এই বলিয়া সে সুন্দরী, সে অজ্ঞাতা, সে অপূর্ব্বপরিচিতা নিস্তব্ধ হইল। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সবই যেন দারুণ রহস্য, দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পরলোক-অবিশ্বাসী আমাকে শাস্তি দিবার জন্যই যেন পরলোক এক রমণী মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে উপস্থিত। স্বপ্ন এত পরিষ্কার দেখা যায়, এমন অনুভব করা যায়, পূর্ব্বে কখন শুনি নাই, দেখি নাই। তবে কি আমি জাগ্রত আর আমার সম্মুখের ঐ শুভ্রা, শুচিস্মিতা রমণী মূর্ত্তি সত্য, জীয়ন্ত, প্রত্যক্ষ! আমি বলিলাম,

"আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না, সবই যেন আমার কাছে দারুণ প্রহেলিকা, জটিল স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি কি বোধময়ী, না সত্য। যেন তোমাকে কত জন্মের পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে, অথচ তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না; যদি তুমি মাণি নও, কে তুমি? কে তুমি বিষাদক্লিষ্টা, অশ্রুভারাবসন্না রমণী? কি উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসিয়াছ?" রমণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, যেন স্মৃতিপথচ্যুত কি একটা কথা স্মরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। সহসা চমকিতা হইয়া ধীর করুণকণ্ঠে বলিল, "আমি কে, কেন আসিয়াছি, সব ভুলিয়াছেন? না—না মানুষে ভোলে না! জন্মজন্মান্তরের অতিতুচ্ছ স্মৃতিটুকু মানব-মস্তিষ্কের গভীর দেশে লুকাইয়া থাকে। ভোলা কেবল সাময়িক। মানুষ প্রত্যেক জন্মে আপনাকে নূতন জীব বলিয়া মনে করে। মানুষ কিন্তু নূতন নহে। প্রত্যেক জীবের পশ্চাতে তাহার সহস্র জন্মের কোটি কোটি বৎসরের অনন্ত স্মৃতি অনন্ত অতীত বক্ষে ঐ ছায়াপথের মতন বিস্তৃত আছে। মানুষ চেষ্টা করিলেই সব জানিতে পারে। আবার পুরাণ ব্যথা জাগাইয়া আপনাকে বিরক্ত করিব। তাহা না হইলে হ'বে না। আপনার দয়ার উদ্রেক হ'বে না, আপনার ক্ষমার পাত্রী হ'ব না—আমার প্রায়শ্চিত্তের অবসান হ'বে না, আমার এই আত্মগ্লানিময় জীবনের শেষ আসিবে না। তবে এই দেখুন।"—

জ্যোৎস্নামাখা শরতের মেঘখণ্ডের মত রমণী শূন্যে বিলীনা হইয়া গেল। তার পর অন্ধকার—ঘোর অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী যেন ধোঁয়ার মত মিশাইয়া গেল। চারিদিক্ শব্দশূন্য—নীরব নিথর ঘুমন্ত। জগৎ যেন প্রলয়ের ঝড়ে ধূলি ধোঁয়া হইয়া আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। অন্ধকারের কোলে অন্ধকার। অনন্ত শূন্যের মাঝে একা আমি সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীরবৎ দুরতিক্রম্য অন্ধকারের সামনে মুখোমুখী হইয়া শুইয়া

আছি। রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ কিছু নাই—কিছুই নাই। কেবল সংবেদনময়ী এক চিচ্ছক্তি সে দারুণ অন্ধকারে, সেই মহাপ্রলয়ের কোলে আমার বক্ষের মাঝে তালে তালে নৃত্য করিতেছে। সহসা সেই অন্ধকারের কোলে একটী জ্যোতির্বিন্দু ফুটিয়া উঠিল। পরমাণুর মত সেই অত্যুজ্জ্বল শুভ্র কণিকা বিস্তৃত—ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া সে অন্ধকারের খানিকটা আলোকিত করিয়া প্রসারিত হইল। যেমন বায়স্কোপে দেখায়—সেই আলোর মাঝে দেখিলাম, একটী উজ্জ্বল পর্ব্বতমালা অভ্রভেদী শিখররাজি লইয়া ধ্যানমগ্ন-যোগীর মত দণ্ডায়মান। সেই পর্ব্বতের সানুদেশে একখানি তৃণপত্রাচ্ছাদিত পর্ণকুটীর। কুটীরের আশে পাশে শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানী। অদূরে একটী কলনাদিনী নৃত্যময়ী পার্ব্বত্যস্রোতস্বিনী উপলখণ্ডে আছাড় খাইতে খাইতে কুল কুল রবে বহিয়া চলিয়াছে। কোথায় হরিণ হরিণী মনের সুখে পার্ব্বত্য তৃণভক্ষণে নিরত, বৃক্ষে বৃক্ষে বিহগকুল নদীর কলে স্বর মিশাইয়া সেই নীরব নিস্তব্ধ ঘুমন্ত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে একটা অতি মধুর স্বরলহরীর সৃষ্টি করিতেছে! সেখানে রৌদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, অগ্নি নাই, তথাপি কিসের একটী স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় আলোকে সে প্রদেশ উদ্ভাসিত। কুটীরাভ্যন্তরে সৌম্যমূর্ত্তি জটাজূটধারী এক যোগী ধ্যানস্তিমিত লোচনে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ শিলামূর্ত্তিসম পদ্মাসনে উপবিষ্ট। আর অনতিদূরে বৃক্ষবল্কলপরিহিতা শুচিস্মিতা, অপরূপ-রূপলাবণ্যময়ী এক রমণী পার্ব্বত্যকাননসুলভ দিব্যগন্ধী কুসুম চয়নে প্রবৃত্তা। রমণীর মুখমণ্ডল হইতে শান্তি, তৃপ্তি, পুণ্যের জ্বলন্ত জ্যোতি ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে। সহসা রাজপরিচ্ছদধারী এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার উষ্ণীষ-গ্রথিত হীরকখণ্ড জ্বল জ্বল করিতেছে, তাহার কটীতটবিলম্বিত কৃপাণ খানি প্রত্যেক পদক্ষেপে ভূমি চুম্বন করিতেছে। যুবক সহসা সেই

স্ত্রী মূর্ত্তিকে দেখিয়া যেন একটু চমকিত হইল, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "ভদ্রে! আমি মৃগয়ায় পথভ্রান্ত. ক্ষুধিত—তৃষিত; আমার অনুচরগণের সাক্ষাৎ নাই। শীঘ্র আমাকে একটু জলদান করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন।" রমণী আচম্বিতে সেই জনশূন্য কান্তারে মনুষ্যকণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিতা হইয়া ফিরিয়া চাহিল, এবং সহসা রাজবেশে সজ্জিত সেই অতি সুন্দর যুবা পুরুষকে দেখিয়া ভীতা ও উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিল। কিন্তু যেন আতিথ্যধর্ম্মের অনুরোধেই আত্মসম্বরণ কারয়া কহিল, "আপনি অতিথি, আমাদের পূজ-নীয়, আমার সঙ্গে আসুন; কুটীরে আমার স্বামী আছেন।" এই বলিয়া রমণী অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল আর যুবক ক্লান্তদেহে, অবসন্নপদে, আত্মবিস্মৃত ভাবে তাহার অনুসরণ করিল। রমণী চলিতে চলিতে এক একবার কুটিল অপাঙ্গভঙ্গিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া যুবককে দেখিতে লাগিল; সে দৃষ্টির ভিতর হইতে যেন হৃদয়ের কি এক অব্যক্ত, কামনা বাসনার জলন্ত স্পৃহা লেলিহান হইয়া বাহির হইতেছিল। সহসা অন্ধকার হইয়া গেল। আবার সেই নিস্তব্ধতা, সেই গাম্ভীর্য্য, সেই অন্ধকার। কোথা হইতে একটী অশরীরী শব্দ সেই অন্ধকার কম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল "কিছু বুঝিতে পারিলে কি?" আমি চক্ষু দিয়া শুনিলাম কি কর্ণ দিয়া দেখিলাম, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আবার সেই আলো! সঙ্গে সঙ্গে একটী ঐশ্বর্য্যশালী ধনীর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ! প্রাঙ্গণে একটী মৃতদেহ শায়িত, তাহার আপাদ মস্তক একখানি শুভ্র বস্ত্রাবৃত। সে মৃত দেহটি বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি নরনারী হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে! তাহাদের করুণ আর্ত্তনাদ দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া আকাশের কোলে মিশিয়া যাইতেছে। আর একটী ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া উদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী চুল ছিঁড়িয়া,

বক্ষ চাপড়াইয়া ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মাটীতে আছড়াইয়া পড়িতেছে। আর কতজন রমণী তাহাকে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না! চারিদিক্ শোকাচ্ছন্ন, কেবল একটা দারুণ স্বভাব ভীষণ হাহাকার শ্মশান-বায়সের মত খাঁ খাঁ করিতেছে।

সে দৃশ্যপট বদলাইয়া গেল! ঠিক যেন নাট্যরঙ্গভূমে দৃশ্যের পর দৃশ্য আসিতেছে! এবার দেখিলাম,—গঙ্গাতীরস্থ গ্রাম প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর, কুটীরে একটী যুবক শাস্ত্রাধ্যয়নে রত, দৃষ্টি উদাস, ললাটতট কুঞ্চিত, সর্ব্বাঙ্গে স্বেদবারি ঝরিতেছে। সন্দেহ অবিশ্বাস তাহার পঠিত প্রত্যেক বর্ণে প্রত্যেক ছত্রে যেন মর্ম্মে মর্ম্মে ভাসিয়া উঠিতেছে। পার্শ্বে একটী দ্বাদশবর্ষীয়া অনূঢ়া বালিকা তাহাকে তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন করিতেছে! কি আশ্চর্য্য! বালিকার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপ গঠন যেন আমার সেই নবোঢ়া মাণির প্রতিচ্ছবি! যুবকের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী, প্রতি ললাটকুঞ্চনের সঙ্গে বালিকার মুখভাব যেন কি একটা বিষাদমাখা অন্ধকারে ছাইয়া পড়িতেছে! বালিকা যেন তাহার সমস্ত হৃদয় মন দেহ যত্ন প্রাণ দিয়া যুবকের একটু দুঃখ—একটু অশান্তি দূর করিতে চাহে। সহসা বাহিরে খট্ খট্ শব্দ হইল। বালিকা তালবৃন্তখানি হস্তে লইয়া অতি অনিচ্ছাপূর্ব্বক ধীরপদে ছল্ ছল নেত্রে সেখান হইতে উঠিয়া গেল! এমন সময় সৌম্যমূর্ত্তি ত্রিপুণ্ড্রকধারী বিপুল দেহ এক ব্রহ্মচারী কাষ্ঠ-পাদুকার শব্দ করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নয়নদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত ও হাস্যচ্ছটায় বদন প্রোজ্জ্বল করিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন "বৎস চিদানন্দ! সংশয় মিটিল? মনের ধাঁ ধাঁ দূর হইল? হিন্দু-ধর্ম্মের প্রত্যেক কথা জ্বলন্ত সত্য।" যুবক হতাশভাবে উত্তর করিল "না গুরুদেব! যতই পাঠ করিতেছি, ততই যেন সন্দেহের—অবিশ্বাসের গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে নামিয়া যাইতেছি। মনের সংশয়

দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।’ গুরু বলিলেন “শুধু পাঠে হবে না, বৎস! মন নির্ম্মল কর, হৃদয় কামনা বাসনার দাগশূন্য কর! অন্তরঙ্গ থাকিতে মন এ রঙ্গে রাঙ্গিবে না। চেষ্টা কর—খুব চেষ্টা কর—” সহসা নির্ব্বাপিত আলোক গৃহের মত সব অন্ধকার হইয়া গেল। আবার সেই ধ্বনি “কিছু বুঝিতে পারিলে কি?”

বুঝিতে পারিব ছাই। আমার মাথা ঘুরিতেছিল, জ্ঞানলোপ হইয়া যাইতেছিল, আমি যেন মরিয়া যাইতেছিলাম। আমাকে নীরব দেখিয়া, বাক্যহীন অসার শায়িত কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দেখিয়া সেই তরুণী আবার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূতা হইল, যেমন মেঘাবরণ ভেদ করিয়া পূর্ণিমার চাঁদ বাহির হয়। ধীর কোমল কণ্ঠে বলিল “বুঝিতে পারিলেন না। এততেও আপনার স্মৃতিশক্তি জাগরূক হইল না! ঐ হিমালয়-সানুদেশে কুটীরবাসী সন্ন্যাসী—আপনি আর রমণীই এই হতভাগিনী আমি, আপনার স্ত্রী। সংশয়দোলায় আপনাকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে নীত করিতেছে। আজও সে সন্দেহ-রাক্ষস, অবিশ্বাস-শয়তান আপনাকে ছাড়ে নাই, আর ঐ রাজপুত্রকে দেখিয়া আমার মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, কামনা বাসনার করাল ছায়া পতিত হইয়াছিল; সংসার-সুখভোগের জন্য আমার প্রতারক মন আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, সেই বাসনাই জন্মজন্মান্তরে আমাকে ব্যাধতাড়িত হরিণীর মত ধাবিত করাইতেছে, পুনঃ পুনঃ স্বামিবিয়োগ-যন্ত্রণার দারুণ আঘাতে বক্ষপঞ্জর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে। কিন্তু নাথ, হৃদয়েশ্বর, অভাগিনীর সর্ব্বস্বধন, আপনাকে ভুলি নাই। আপনার সে পবিত্র ভালবাসা, সে অপার্থিব স্নেহ করুণা, সে মহান্ চরিত্র, সে শিক্ষা দীক্ষা আমার জীবনের পরতে পরতে মিশাইয়া আছে, পূর্ব্বের কয় জন্ম বড় দুঃখেই কাটিয়াছে। অগো—সে কি যন্ত্রণা, কি আকুল ক্রন্দন, মায়ামরীচিকার পশ্চাতে

তৃষিত, ক্ষুধিত নীরাশা পীড়িত প্রাণের কি নির্ম্মম কঠোর ছুটাছুটি, কিন্তু গুরুদেবের কৃপায় এবার আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে, গুরুদেব যখন দয়া করিয়া আমার চক্ষের অঞ্জন মুছাইয়া দিলেন, তখন বুঝিলাম আমি কি চাই, কেন চাই, কা'কে চাই! সেইদিন হইতে আপনার তপস্যাপূত পবিত্রমূর্ত্তি আমার স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল, সেইদিন হইতে শয়নে স্বপনে আমার হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তি দিয়া আমার ইষ্টদেবের পূজা করিয়াছি; গুরুদেব বলিয়াছিলেন আপনিও বর্ত্তমান সময়ে এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই এই ক্ষুদ্রা রমণী তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যে আপনাকে যে কত অনুসন্ধান করিয়া রাত্রিদিন ফিরিয়াছে তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। যাহা হউক, পূর্ব্বার্জ্জিত বহু পুণ্যের ফলে একবার এ জনমের শোধ আপনার শ্রীচরণ দেখিতে আসিয়াছি, এবার আর আপনাহারা হইয়া হায় হায় করিয়া কামনা-কলুষিত বাসনা-দগ্ধ সংসারে জ্বালাময় উত্তপ্ত প্রাণে ছুটাছুটি করিতে হইবে না।" রমণী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বীণাঝঙ্কৃত কণ্ঠে বলিল।

"কিন্তু স্বামিন্! আপনাকে আমার একটী আর একটী অনুরোধ রাখিতে হইবে! বলুন এই পতিতাকে ক্ষমা করিলেন, এ দাসীর শেষ আশা পূর্ণ করিবেন।" আমি বলিলাম "আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার সাধ্য মত তোমার উপকার করিব, নিশ্চয়ই করিব।" রমণী প্রীতিফুল্ল বদনে বলিল, যেন তাহার হৃদয় হইতে একটী গুরুপ্রস্তরের ভার নামিয়া গেল, "আঃ বাঁচিলাম! জন্ম জন্মান্তরের অত ভালবাসা কি মানুষ ভোলে, না মানুষ ভুলিতে পারে! সংসারের দোষ কি, ভগবানের দোষ কি, মানুষ আপনা খাইয়া আপনার দোষে কামনার মরু ভূমিতে তৃষিত হরিণের মত বক্ষ ফাটিয়া মরিয়া যায়। যাহা হউক, আমার ইহজীবনের ভোগ অবসানপ্রায়, আর বেশী দিন থাকিব না; তবে এ দেহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে

একটী বার মাত্র আপনাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিব, আপনার চরণ ধূলিতে ইষ্ট-নিবেদিত আমার মর দেহটাকে পবিত্র করিয়া লইব। আহা, কতদিন কত যুগ হইল আপনাকে আপন হাতে কিছু খাইতে দিই নাই। একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া, পিপাসা মিটাইয়া সামনে বসাইয়া কিছু খাওয়াইব। তারপর মহাযাত্রার পথে পরলোকে আপনার জন্য অপেক্ষা করিব।" আমি বলিলাম "কেমন করিয়া তোমার সাক্ষাৎ পাইব।" রমণী সহাস্য বদনে উত্তর করিল "সে কথা আপনাকে বলিয়া দিতেছি। কলিকাতার...... ......ব্যানার্জ্জির লেনে ৬৬ নং বাটীতে আগামী ২৫শে আশ্বিন বেলা ১২টা কি ১টার সময় যাইলে আমাকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বা পরে সাক্ষাৎ অসম্ভব, সে চেষ্টা করিবেন না। মনে থাকিবেত ৬৬ নং.........আর সময় নাই, আমি চলিলাম।" তাহার কথার শেষ ঝঙ্কার মিলাইতে না মিলাইতে আমার ভৃত্য তাহার স্বভাবদত্ত গভীর আওয়াজে ডাকিল "বা—ব—হু বহুৎ ভোর হো গিয়া।" আমাকে খুব সকালে জাগাইবার জন্য তাহার প্রতি আদেশ ছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। তখনও গৃহের আলোকটী দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, আমি কোন পরীরাজ্যে নীত হই নাই, সেই ঘরে, সেই বিছানায়। (ক্রমশঃ)

চিদানন্দ

অতীতের এক পৃষ্ঠা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যদি পূর্ব্বে জানিতাম, বুঝিতাম—আমার এই ক্ষুদ্র জীবন-স্মৃতিতে, আমার বিরহে একটি জীবন অকালে নিভিয়া যাইবে; স্বর্গের সুষমা ঝরিয়া পড়িয়া নষ্ট হইবে—তবে হয়তো অন্যপথে চলিতে পারিতাম। কিন্তু হায়!

ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে এত প্রচ্ছন্ন, যে আমরা তাহার কিছুই ভাবিতে পারি না!

বিবাহের পর প্রায় ৮।৯ মাস কাটিয়া গিয়াছে। এ সময় টুকুর কথা বিশেষ করিয়া বলিবার কিছু নাই। শ্রোতৃবর্গ সহজে অনুমান করিতে পারিবেন।

শ্রাবণ মাস। গত বৎসরের শ্রাবণে বাঁকীপুরে, সন্ন্যাস-ধর্ম্মে! আর আজ!—

* * * *

সেদিন সকাল হইতে খুব বৃষ্টি হইতেছে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার বিরাম নাই।

সন্ধ্যার পর আমার শয়নগৃহে বসিয়া বাহিরে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য-কোলাহল দেখিতেছিলাম; হেম আসিয়া সে গুরুত্ব দ্রব করিয়া দিল, সে হার্মোনিয়মে বসিয়া বেশ সুমধুর স্বরে দু তিনখানা গান গাহিল। তখন ৯৷৷৹ টা বাজিয়াছে, বর্ষা-বাদলে অন্য কিছু ভালো লাগছেনা—তাহাকে আরো দু' একখানা গাহিতে বলিলাম, সে অস্বীকার করিল—বড় ঘুম পাচ্ছে।

সে শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, আমি হার্ম্মোনিয়মের চাবিগুলা টিপিয়া অভ্যাস করিতেছিলাম, হঠাৎ আমার দৃষ্টি শার্শির বাহিরে পতিত হইল, আমি বজ্রাহতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলাম। চশমা খানা পরিস্কার করিয়া আবার দেখিলাম। সেই দৃশ্য!

ঘরের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বাহিরে খানিকটা আলোকিত করিয়াছে, সেই আলোকিত পথের উপর দাঁড়াইয়া—সেই ছবি; আমার প্রবাস-বন্ধু—সেই বালিকা সেই মলিন বেশ-ভূষিতা; হাতে একখানা ছবি ও সে' খানা তা'র জননীর সেই আলোকচিত্র! আমি কাঁপিয়া উঠিলাম।

আলোটা আরো জোর করিয়া দিয়া বাহিরে চাহিয়া আবার দেখিলাম; রমণী জানালার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। আমি বিহ্বলকণ্ঠে ডাকিলাম—এ কি মতি—"তুমি এখানে ?"

সে যেন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, কিন্তু কোনো কথা কহিল না।

আমি আবার ডাকিলাম—"মতি, মতি!" সে তাহার অত্যধিক উজ্জ্বল দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থির করিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া—শার্শি খুলিয়া দিলাম। একটা প্রবল বায়ু আসিয়া আলো নিবাইয়া দিল। আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যায় আসিয়া হেমকে জাগাইয়া সব কথা বলিলাম।

* * *

চিন্তাভারগ্রস্ত মনে সকালে চা'য়ের টেবিলে আসিয়া বসিয়াছি—ভৃত্য কতকগুলি চিঠি ও সাময়িক পত্রিকাদি দিয়া গেল। চিঠিগুলি পড়িয়া—পত্রিকাগুলি খুলিতে লাগিলাম। তন্মধ্যে একখানা—"বিহার সংবাদ" ছিল, সে খানা পড়িতে পড়িতে এক যায়গায় দেখিলাম—গত সোমবার দিন,—পার্কের ধারে একটি পূর্ণবয়স্কা বালিকা হৃদ্‌রোগে মারা গিয়াছে, সে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে একখানি ছোট বাড়ী, কয়েকখানা অলঙ্কার ও ২খানি আলোকচিত্র (ফটো) পুলিশের হস্তে রাখিয়া গিয়াছে, একখানি ফটোর নীচে শ্রী——(আমারই নাম) এই নাম লেখা আছে। সে মৃত্যু সময়ে বলিয়া গিয়াছে, ঐ ব্যক্তিকে সে সমস্ত অর্পণ করিয়া গেল, অতএব তিনি বিহার পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের সহিত অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার দ্রব্যাদি পাইতে পারেন।" ——ঝন্ ঝন্ করিয়া হাতের 'কাপ্'টা পড়িয়া গেল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

সতীদাহে আশ্চর্য্য ঘটনা।

যুক্ত প্রদেশের মৈনপুরী জিলার অন্তর্গত যারৌলি গ্রামে রামলাল নামক এক ব্রাহ্মণের গত ২৭শে জুন তারিখে মৃত্যু হয়। রামলালের যুবতী স্ত্রী জয়দেবী স্বেচ্ছায় সতী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বেরা সতীদাহ যে আইন বিরুদ্ধ, ও তাঁহার ন্যায় তরুণী যুবতীর সতীদাহ যে অন্যায়, ইহা অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু জয়দেবীর প্রতিজ্ঞা অটল। স্বামীর দেহের সহিত আত্মদেহ বিসর্জ্জন করিতে দৃঢ়মনা হইয়া জয়দেবী স্বামীর দেহ অনুসরণ করিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। সতীদাহ দেখিবার জন্য যারৌলি গ্রামের ও নিকটস্থ গ্রামসমূহের প্রায় ২০০০ লোক আসিয়াছিল। শ্মশানে যাইবার পথে জয়দেবী ফুল ও সিকি দুয়ানী ইত্যাদি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন। শ্মশানে পৌছিয়া দৃঢ়মনে যেখানে চিতা প্রস্তুত করিতে হইবে, দেখাইয়া দিলেন। চিতার উপর যখন স্বামীর দেহ রাখা হইল, তখন জয়দেবী চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া চিতারোহণ করিয়া, স্বামীর মস্তক আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া বসিলেন। নিজের গহনাপত্র খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। চিতার উপর, ও আপনার দেহে ঘৃত ঢালিয়া, ফুল ও ফল দিয়া চিতা পূজা করিলেন।

ইহার পর জয়দেবী অগ্নি চাহিলেন। কেহই অগ্নি দিতে সম্মত হইল না। উপস্থিত দুইজন লোক বলিল যে "আপনি যদি যথার্থ নিষ্কলঙ্ক হন, চিতা আপনি জ্বলিয়া উঠিবে।" জয়দেবী মৃতস্বামীর কর্ণে মৃদুস্বরে কি বলিলেন ও আকাশের দিকে করজোড়ে কি প্রার্থনা করিলেন। প্রকাশ যে চিতা আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠিল, ও সতী সাধ্বী জয়দেবীর পার্থিব দেহ ভস্মীভূত হইল।

এই সতীদাহে সাহায্য করিবার, কিংবা নিবারণ না করার জন্য ৫ জন ব্রাহ্মণ মৈনপুরের সেসন জজ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছে। সতীদাহ যখন আইন বিরুদ্ধ, তখন তাহাতে সাহায্য করিলে দণ্ড হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেসনজজ সাহেবের রায়ে প্রকাশ যে সাক্ষী ও আসামীরা সকলেই বলে যে চিতা আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিয়া ছিল। সতী কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি যে চিতায় অগ্নি সংযোগ করিয়াছেন, ইহার কোন প্রমাণ নাই। সত্য হইলে বলিতে হইবে যে সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষার ন্যায় জয়দেবী তাঁহার সতীত্বের পরিচয় দিয়াছেন, ও ভগবানের নিকট তাঁহার সতীত্ব প্রমাণের জন্য করজোড়ে প্রার্থনা বিফল হয় নাই।

এই সতীদাহপ্রসঙ্গে সেসনজজ সাহেবের রায়ে আরও অলৌকিক ঘটনা বিবৃত আছে। প্রকাশ যে যখন রামলালের মৃতদেহ তাঁহার বাড়ীতে পড়িয়া ছিল, একটী ছোট বালিকা মৃতদেহের নিকটে খাটের উপর বসিয়াছিল। জয়দেবীর দৃষ্টিপাত মাত্রে বালিকা মূর্চ্ছিত হইয়া আছড়াইতে লাগিল। শেষে বালিকার পিতা জয়দেবীর নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করাতে তাহার জ্ঞান হইল। আরও প্রকাশ যে জয়দেবীর হস্তে একতাল জ্বলন্ত কর্পূর ছিল, তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই। আবার শ্মশানে যাইবার পথে জয়দেবী যে সিকি দুয়ানী ইত্যাদি রাস্তায় ছড়াইয়াছিলেন, সেগুলি ভূমিতে পতিত না হইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
হাজারিবাগ।

গোপেশ্বরের চাকুরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রে বিধুমুখীও স্বপ্ন দেখিল; কিন্তু স্বপ্নকালীন যাহা যাহা দেখিয়াছিল বা অনুভব করিয়াছিল, তাহা ঠিক স্মরণ নাই; যেন একটা পাহাড়—সুদুর বিস্তৃত নির্জন সুনীল ভূধর, দূরে এক বিস্তৃত নদী—তার পর জঙ্গল—গোটা কয়েক হিংস্র জন্তু ছুটাছুটি করিতেছে—তার পর একে-বারে ফাঁকা—নীচে অসীম বিস্তৃত মাঠ, উপরে বিস্তৃত আকাশ; তার আর ভাল স্মরণ নাই। মেঘলা আকাশ ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, হঠাৎ আকাশ ফরসা হইয়া গেল, সেও শূন্যে উড়িতে লাগিল। মোটের উপর জাগ্রত চৈতন্যে স্বপ্নের যে অংশ টুকুর স্পষ্ট ছাপ আছে, তাহা এই যে,—যেন কে বা কাহারা তাহার স্বামীকে বন্ধন করিয়া পীড়ন করিতেছে ও হঠাৎ এক বৈরাগী আসিয়া বন্ধন মোচন করিল। নিদ্রা ভঙ্গে শিহরিয়া উঠিল; হিন্দু রমণী এ সকল বিষয় সহজেই বিশ্বাস করে, তাই স্বামীর অকল্যাণকর স্বপ্নে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

প্রভাতে উভয়েই বিমর্ষ—উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারিল না, পরস্পর একটু দূরে দূরে থাকিল।

ক্ষীরোদ এরূপ স্বপ্নে পূর্ব্বে আদৌ কিছুমাত্র বিচলিত হইত না, কিন্তু ইহা এত স্পষ্ট পরিষ্কার ও সত্যবৎ যে তাহাতে অত্যন্ত বিস্মিত ও কুতূহলী হইতে হইয়াছিল।

সেইজন্য প্রাতে উঠিয়া গোপনে একজন লোক পাঠাইয়া সন্ধান লইল যে, তাহার কামিনী দিব্য খোস-মেজাজে বাহালতবিয়তে সুস্থ দেহে ইহ-পর-

কালের পরম সদগতির জন্য সশরীরে বিরাজমানা। সংবাদে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল;

দ্বারে ভিখারী আসিল, প্রত্যহই আসে,—এমন কত ভিখারীই আসে।

ভিখারী খঞ্জনীতে আঘাত দিয়া চাঁচা গলায় সুর পঞ্চমে তুলিয়া গাহিল—

"হরি যদি ভয়হারী তবে কারে ভয় করি মা।"

গান শুনিয়া ভিখারীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীরোদ স্তম্ভিত—সেই স্বপ্নদৃষ্ট বৈরাগী—তাহাকে পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই—অথচ স্বপ্নে কিরূপে একজন অপরিচিত ব্যক্তির মূর্ত্তি এরূপ সুস্পষ্টভাবে মানসক্ষেত্রে ভাসিয়া উঠিল তাহা কল্পনাতীত।

স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই কৌতূহলা, একজন অপরিচিত লোক আসিলে তাহাকে যেরূপেই হউক দেখিয়া লইবে; সুতরাং তাহার উপর সুললিত সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া ছুটিয়া আসিল—কিন্তু এ কি? ইহাকেই না সে গত রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছে—একটা যুগপৎ বিপদাশঙ্কা ও বিপদ্মুক্তিতে—কাঁপিয়া ও হাসিয়া উঠিল।

ক্ষী। বাবাজী তুমি থাক কোথা?

বা। অম্বিকা কালনায় থাকিতাম—আজ ১০।১২ দিন এখানে এসেছি।

ক্ষী। আচ্ছা কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?

বা। কেন বলুন দেখি?

ক্ষী। না তাই জিজ্ঞাসা করছি?

বা। সমস্ত দিন ভিক্ষার্থ পরিশ্রমে সন্ধ্যার পর একটু ঠাকুরের নাম কীর্ত্তন করে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ি; কালও সেইরূপ শুইয়াছিলাম।

ক্ষীরোদ আর কিছু বলিল না, তবে বড়ই রহস্যময় বোধ হইতে লাগিল।

বিধুমুখীও তদ্রূপ বা ততোধিক বিস্মিত; কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া ভক্তিভরে যথেষ্ট চাউল তরকারী ও পয়সা আনিয়া দিল।

পরে ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ঠাকুর কোন বিপদ্ হবে না ত ?

বাবাজী সহাস্য বদনে বলিল,—ভয় কি মা, বিপদ্তারণ মধুসূদন আছেন, কেন বিপদ্ হবে ; তবে মা তোমাকে—একটা অমূল্য জিনিষ বলিয়া যাইব। বিধুমুখী উদ্গ্রীব হইল।

বা। যখনই কোন বিপদ্ সম্ভাবনা হবে, তখনই কায়মনোবাক্যে বিপদ্হারী মধুসূদনকে ডাকিও, সকলবিপদ্ দূর হইয়া যাইবে।

বিধুমুখী এই ক্ষুদ্র উপদেশটী বিশেষ করিয়া স্মরণ করিয়া রাখিল, কিন্তু ক্ষীরোদের পক্ষে এরূপ অমূল্য জিনিষ শ্রবণে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়িল।

আহারের সময় অল্লাধিক ভূমিকা করিয়া বিধুমুখী বলিল "তোমাকে আজ একটা কথা রাখিতেই হইবে, যদি রাখত বলি!" ক্ষীরোদ সকৌতুকে বিধুমুখীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বড়ই মুস্কিল, কথা টথা রাখা আজ আর হচ্ছে না।"

বিধুমুখী কৌতুক বুঝিতে না পারিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত বলিল, না তোমাকে রাখিতেই হবে।

ক্ষীরোদের অধরপ্রান্তে একটু হাসির রেখা দেখা দিল, বলিল,—তা হচ্ছেনা।

বি। আমি ও শুনব না, তোমাকে আজ শুনতেই হবে।

ক্ষী। আচ্ছা, বলেই ফেল না, কথাটা কি তোমার ?

বিধুমুখী তাহার স্বামীকে চিনিত ও তাহার অন্তঃকরণ জানিত। তাহার স্বামী মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত বটে কিন্তু উদারহৃদয় ও সত্যবাক্—যদি সে একবার কথা দেয়, তাহা হইলে কিছুতেই নড়চড় করিবে না। তাই সে এতটা ভূমিকা করিতেছিল।

(ক্রমশঃ)

"পলাশী-সূচনা," "অশ্রুধারা," ভীষণ প্রতিশোধ" প্রভৃতি
পুস্তক প্রণেতা
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১। বিধি-প্রসাদ।

মনোরম সামাজিক উপন্যাস।

২৬২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তিনখানি সুন্দর চিত্র শোভিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থে জন্মান্তরবাদ, প্রেততত্ত্ব, কর্ম্মফল, পাপ পুণ্যের বিচার, হিন্দু শাস্ত্রসম্মত ঐ সকলের ব্যাখ্যা, আদর্শ হিন্দুর, ভ্রান্ত, অজ্ঞান হিন্দুর, এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষিত, পাশ্চাত্য সভ্যতাদীপ্ত বাঙ্গালী-সাহেবের সমাজ চরিত্র, পাশাপাশি ভাবে প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আর্য্যঋষিগণপ্রবর্ত্তিত সনাতন ধর্ম্মের সরল ব্যাখ্যা আছে, অথচ তাহা একদেশ-দর্শিতাপূর্ণ নহে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন-শাস্ত্র সমন্বয়ে লিখিত এই সকল জটিল বিষয় যাহাতে সুকুমার-মতি বালক, সামান্য শিক্ষিতা মহিলা পর্য্যন্তও সহজে বুঝিতে পারেন, তদ্রূপ ভাষায় ও ভাবে উপন্যাসের বর্ণনাছলে বিবৃত করা হইয়াছে।

এইত গেল শাস্ত্রীয় কথার বিচার, এতদ্ব্যতীত কি কি আছে দেখুন। আনুষ্ঠানিক হিন্দু জীবনের আদর্শ চিত্র, পিশাচ প্রকৃতি মানবের ভীষণ জীঘাংসা, হিন্দু বালিকার প্রবল ধর্ম্মভাব, পরহিত সাধনের অনুপম দৃষ্টান্ত—এ সকলের অভাব পরিদৃষ্ট হইবে না। এক কথায় এমন শাস্ত্রোপদেশ-মূলক, গবেষণাপূর্ণ, সারগর্ভ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস বহুকাল যাবৎ বঙ্গ-সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। যদি ভাবুক হও, ধর্ম্ম পিপাসু হও, জ্ঞানার্জ্জনে যত্নপরায়ণ হও, তাহা হইলে 'বিধি-প্রসাদ' পাঠ করিয়া নিজে পরিতৃপ্ত হও—আত্মীয় স্বজনকে পড়িতে দিয়া নিজের কর্ত্তব্য সাধন ও তাহাদিগের সন্তোষ বিধান কর।

Printed by A. BANERJI, at the METCALFE PRINTING WORKS :
34, Mechuabazar Street, Calcutta.

পঞ্চম ভাগ। অগ্রহায়ণ ১৩২০। ৫ম সংখ্যা।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদিত।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বিএ, বিএল,

সহকারি-সম্পাদক।

বার্ষিক মূল্য ১।০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ⁄০ আনা।

সূচী।

অলৌকিক রহস্যের নিয়মাবলী

১। "অলৌকিক রহস্য" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১লা প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলাদি সমেত সহর, মফঃস্বল সর্ব্বত্র ১॥০ দেড় টাকা মাত্র; ভিঃ পিঃতে পাঠাইলে ৵০ এক আনা অধিক লাগে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴৹ তিন আনা।

৩। কেবল ৴১০ সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা একখণ্ড প্রেরিত হইবে।

৪। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পর-সংখ্যা-প্রকাশের পূর্ব্বে না জানাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনরায় পাঠাইতে দায়ী থাকিব না।

৫। কেহ যদ্যপি পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া রিপ্লাই পোষ্টকার্ড লিখিবেন।

৬। "অলৌকিক রহস্য" সম্বন্ধীয় চিঠি-পত্র, টাকা-পয়সা আমার নামে এবং প্রবন্ধাদি বিনিময়ার্থ পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ইউনিভার্শেল লাইব্রেরী, } শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৬।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, } প্রকাশক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পুনরাগমন সামাজিক উপন্যাস যাহা ধারাবাহিক 'অলৌকিক রহস্যে' বাহির হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

অলৌকিক রহস্য।

৫ম ভাগ] অগ্রহায়ণ, ১৩২০। [৫ম সংখ্যা।

গুহামুখে।

সেখানে খাদ্যের পাত্র সম্মুখে রাখিয়া ললিতমোহন আমার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। যুবতী আমাকে স্থান দেখাইয়াই অন্যত্র চলিয়া গেল।

আমাকে দেখিবামাত্র ললিত বলিল—"অনেকক্ষণ হইতে তোমার জন্য খাবার আগুলিয়া বসিয়া আছি। "তুমি আসিতে এত বিলম্ব করিলে কেন?"

আমি উত্তর করিলাম—"আমার জন্য তুমি অপেক্ষা করিলে কেন?"

"কেন? না করিলে কি আমার মাথা থাকিত?"

"কেন ভাই, কে তোমার মাথা লইত?"

"কে লইত! লইবার লোক এখানে ঢের আছে। তোমার বিলম্বে লুচি ঠাণ্ডা হয় দেখিয়া আমিত খাবার মুখে তুলিতে যাইতেছিলাম। মাঝখান থেকে পিসি বেটী হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। বলে, ব্রাহ্মণ অতিথিকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইবি?' মা বেটী আহ্নিক করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল, এবং আমাকে মূর্খ কাণ্ডজ্ঞানহীন— যা মুখে আসিল, তাই বলিল। কেন ভাই, আমি এখানে খাইব, তুমি ওখানে খাইবে। আমি আগে খাইলে, তোমার পাত উচ্ছিষ্ট হইবে কেন?"

আমি বলিলাম, "ভ্রম—উহাদের সব কথা মানিতে হইলে এ দুনিয়ায় এক পাও বাড়ান চলে না। তুমি স্বচ্ছন্দে আহার কর।"

এতক্ষণ যখন বসিয়াই রহিলাম, তখন আর একটুও বসিতে পারিব। তাহাকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত বুঝিয়া, আমি আহারে বসিতে আর অযথা বিলম্ব করিলাম না।

একটা লোক দেখান আচমন দেখাইতে আমি জল হাতে করিয়া গণ্ডূষ করিতে যাইতেছি, এমন সময় যুবতী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই বলিল—

"আচমন করিবেন না। ও সমস্ত লুচি ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে—আমি গরম লুচি আনিতেছি।"

"দূরছাই, আবার তুই আসিয়া বাধা দিলি; তবে আমি আজ আর আহার করিবই না।"—এই কথা বলিয়াই ললিত মোহন আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার আসন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে যুবতী একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া আমারই সন্নিকটে মূর্চ্ছিতা ও ভূপতিতা হইল।

আমার হাতের গণ্ডূষ হাতেই রহিল, আর মুখে তোলা হইল না। বিস্মিত, স্তম্ভিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আসন ছাড়িয়া উঠিতে যাইতেছি, এমন সময়ে এক অর্দ্ধ' বয়সী বিধবা দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া সাগ্রহে আমাকে আসন ত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন—"ওর হিষ্টিরিয়ার অসুখ আছে। মাঝে মাঝে ও ওইরূপ অজ্ঞান হয়। আপনি উঠিবেন না। মুখের আহার পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থের অকল্যাণ করিবেন না।"

যুবতীর অবস্থায় ললিত মোহন ও কিছু অপ্রতিভ হইল। সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া আসন পরিত্যাগ যে একটা গর্হিত কার্য্য হইয়াছে তাহা সে

বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া বলিল—"ভাই! ক্ষুধার মুখে বারংবার বাধা পাইয়া আমি ক্রোধে আত্মহারা হইয়াছিলাম। তুমি আমার প্রতি দয়া কর। আসন ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়াই সে মহিলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"তোমরাই ত যত নষ্টের মূল। আহার করিবার সময় ওকে এখানে পাঠাইলে কেন? বারংবার তোমরা যদি আমার প্রতি এইরূপ অত্যাচার কর, তাহা হইলে আমি হৃষীকেশের পথ ধরিয়া এমন স্থানে চলিয়া যাইব যে, ইহজন্মে তোমরা আর আমাকে খুঁজিয়া পাইবে না। যাও—এই ভদ্র লোককে যদি খাওয়াইবার ইচ্ছা থাকে, তাহ'লে এখনি ওকে উঠাইয়া লইয়া যাও।"

এইকথা শুনিয়া সেই বিধবা মহিলা অন্তঃপুরাভিমুখে কাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ও বউ! তুইও আয়। চলিবে কেন? আমি একেলা এ বুড়ো মেয়েকে উঠাইতে পারিব কেন?" এই বলিয়া তিনি পতিতা যুবতীর দেহের অনাবৃত অংশ বসনাঞ্চলে ঢাকিয়া দিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে অপর এক বিধবা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল।

উভয়ে যুবতীকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শেষোক্ত বিধবা সরম রক্ষার্থ নিজের বসন লইয়াই সমধিক ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যুবতীকে উঠাইবার পক্ষে তিনি বড় একটা সঙ্গিনীর সাহায্যে আসিতে-ছিলেন না। তাই দেখিয়া প্রথমা মহিলা বলিয়া উঠিলেন—"সরম রাখ্। ভাল করিয়া ধরিতে পারিস্ত ধর্। সরম দেখাইবার ঢের সময় পাইবি। ব্রাহ্মণের ছেলে শ্রাতের অন্ন মুখে তুলিতে পারিতেছে না।"

ললিতমোহন বলিল—"আর লজ্জা করিয়া আমাদের অনাহারে

মারিতে হইবে না। এ আমার ভাই—সহোদর। এখন থেকে ওকেও তোর সংসারের একজন জানিবি।"

এই কথা শুনিয়াই আমি বলিলাম—"মা! আমি ও আপনার এক সন্তান। ললিত ও আমাকে বিভিন্ন মনে করিবেন না।"

আমার বাক্যে ললিতের মা—ললিতের কথায়ও বিধবার সম্বোধনে আমি তাঁহাকে ললিতের গর্ভধারিণীই স্থির করিলাম—অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচিত করিলেন। বসনাঞ্চলে কটিদেশ সুদৃঢ় বন্ধন করিলেন। যুবতী তখনও স্পন্দনহীন মৃতার মত ভূমিতে পড়িয়াছিল। উভয়ে তাহাকে তুলিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল দেখিয়া ললিত বলিল—"পিসিমা! তুই আমাদের অন্তঘরে ঠাঁই করিয়া দে। ও এখানে পড়িয়া থাক্।"

অপর বিধবারও পরিচয় পাইলাম। ললিতের মা অতি মৃদুস্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তাই ভাল ঠাকুরঝী, তুমি ইহাদের অন্তঘরে আহারের উদ্যোগ করিয়া দাও।"

আমরা আসন হইতে উঠিলাম। পিসি সেই আসন লইয়া আমাদের অন্ত গৃহে আহারের ব্যবস্থা করিতে চলিলেন।

ললিতের মা যুবতীর অঙ্গে হস্ত দিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন—"গৌরী!"

অজ্ঞানাবস্থাতেই যুবতী কাঁদিয়া উঠিল। মা আবার ডাকিলেন—"গৌরী!" যুবতী এবারে হাসিল।

ললিত বলিল—"গৌরী গৌরী করিয়া মরিতেছ কেন? গৌরী এখন হয়ত হিমালয়ের কোন গুহার মধ্যে বসিয়া আছে।"

গৌরী খিল্ খিল্ হাসিয়া বলিল—"ঠিক।"

"কেমন ঠিক বলিয়াছি ত?"

গৌরী আবার কাঁদিতে সুরু করিল। মা বলিলেন—"মা গঙ্গা আমাকে এখানে তাঁর গর্ভে স্থান দিলে, আমি বাঁচি।"

"আমি ও বাঁচি। আমি যে তোমাকে হাজার বার বলিয়াছিলাম, ওটাকে সঙ্গে আনিও না। আনিলে, তীর্থবাসের সব সুখ নষ্ট হইবে। আনিলে কেন?"

"ওকে কার কাছে রাখিয়া আসিব?"

"যমের কাছে।"

"দেখ্ ললিত, এরূপ নিষ্ঠুর কথা মুখে আনিস্‌নি। কি অপরাধে বালিকাকে যমের কাছে রাখিয়া আসিব?"

"তবে আমাকে রাখিয়া আসিলে না কেন?"

পুত্রের এ কথায় ললিতের জননী কোনও উত্তর করিলেন না। তৎপরিবর্ত্তে তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ বাবা, তুমিও আমার সন্তান। যদি ভাগ্যবশে ও তোমাকে এরূপ পবিত্র স্থানে পাইয়াছে, তখন তুমি ও গর্দ্দভের যাতে সুবুদ্ধি আসে তাই কর।"

আমি বলিলাম—"মা! ব্যাপার কি আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আর বুঝিবার প্রয়োজন নাই। যদি খাইবার ইচ্ছা থাকে, তা হইলে আমার সঙ্গে এস।" এই বলিয়াই ললিত তাহার পিতৃষ্বসাকে সম্বোধন করিল। তিনি ভিতর হইতে উত্তর করিলেন—"ঠাঁই করিয়াছি। বাবুকে এইঘরে লইয়া এস।"

যে ঘর পরদা দিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে, আমরা সেই গৃহের অপরাংশে আহারে উপবিষ্ট হইলাম।

আজিকালিকার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হিষ্টিরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবে

গৌরীর মূর্চ্ছায় আমি বিশেষ বিস্মিত অথবা ভীত হই নাই। এইজন্য আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া ইহাদিগকে বিপন্ন করিবার আমার কোনও কারণ ছিল না। বিশেষতঃ বাড়ীর কেহই যখন এ ব্যাপারে বিশেষ কোনও ভীতির চিহ্নও দেখাইল না, তখন আমি গৌরীর মূর্চ্ছা একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাই মনে করিয়া লইলাম। বুঝিতে পারিলাম না কেবল মাতা ও পুত্রের কথোপকথন।

তাহাও সময়ান্তরে ললিতের নিকট হইতেই বুঝিতে পারিব ভাবিয়া আমি আহার করিতে আর ইতস্ততঃ করিলাম না।

কিন্তু যেমন গণ্ডূষের পর একখানি লুচি ছিঁড়িয়া আমি মুখের কাছে তুলিয়াছি, অমনি গৃহান্তর হইতে মূর্চ্ছিতা গৌরী বলিয়া উঠিল—"মা—মা—দেখিতেছ—দেখিতেছ।"—আমি হাতের লুচি মুখের কাছে ধরিয়া শুনিতে লাগিলাম। পাছে চর্ব্বণ শব্দে গৌরীর কথা না শুনিতে পাই। মূর্চ্ছিতা গৌরীর কণ্ঠস্বর বুঝি আরও মধুর।

"কি দেখিব গৌরী?"

"ওইযে ওইযে—হরিমোহন—দেখিতেছ না?"

আমার সর্ব্বশরীর স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

"হরিমোহন! কে হরিমোহন?"

"ওইযে গো—ওইযে—আমার ঘোমটা টানিয়া দাও।"

আমার হাত হইতে লুচির খণ্ড আবার পাত্রে পড়িয়া গেল।

ক্ষুধার তাড়নায় ইতিমধ্যে ললিতমোহন পাত্রস্থ অর্দ্ধেক আহার উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। আমার হাত হইতে লুচি পড়িয়া গেল দেখিয়া সে আমাকে বলিল—

"কিহে ভাই, তোমার ও হিষ্টিরিয়া হইল নাকি?"

আমি অপ্রতিভ হইয়া হস্ত-চ্যুত লুচিখানা আবার যেমন তুলিতে

যাইতেছি, অমনি গৌরী বলিয়া উঠিল—"মা! আমায় ধর হরিমোহন আমাকে ধরিতে আসিতেছে। ভণ্ড একজনকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিল। এখন তাকে ছাড়িয়া আমাকে ধরিতে আসিতেছে। ধর—ধর—মা আমায় ধর।"

সঙ্গে সঙ্গে ললিতের মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ঠাকুরঝী! রক্ষা কর। আমাকে বিষম জোরে জড়াইয়া ধরিয়াছে।"

ললিতমোহন আহার ফেলিয়া মাতৃ-সাহায্যার্থে ছুটিয়া গেল। ওদিক হইতে বলাই সেই গৃহাভিমুখে ছুটিয়া আসিল। আমিও আসন ত্যাগ করিয়া বহির্গৃহে প্রস্থান করিলাম। লুচির কণা মুখে তোলা আমার ভাগ্যে ঘটিল না।

এখনও আমার দেহের স্পন্দন তিরোহিত হয় নাই। ঘরের কোন হইতে একটা তাকিয়া লইয়া, কোলে তুলিয়া বুক চাপিয়া বসিয়া রহিলাম। এ কি শুনিলাম!' কখনও কোন স্থানে ত এ যুবতীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। বাল্যকালে খেলার সঙ্গিনীর মধ্যে কোন বালিকাতেও গৌরীর অনুরূপ রূপ দেখি নাই। যৌবনের যাদুকরী করাঙ্গুলিস্পর্শে যদিই বা কোন বালিকার শৈশব সৌন্দর্য্য নূতন আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, কিন্তু কই, তাহাদের মধ্যে একজনের নামও ত গৌরী ছিল না! তবে এ যুবতী আমার নাম কেমন করিয়া জানিল এ হরিমোহন কি আমি? অনেকক্ষণ ধরিয়া মনকে নানা প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। দেশে কত হরিমোহন আছে। তাহাদের মধ্যে হয়ত তাহার একজন পরিচিত হরিমোহনকে লক্ষ্য করিয়া যুবতী কথা কহিতেছে।

তাহাই সম্ভব—সম্ভব কেন, নিশ্চয়ই তাই। নইলে সে কেমন করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে? আমি তাহাকে কখন দেখি

নাই, গৌরী বলিয়া এমন সুন্দরী থাকিতে পারে, তাহার গলা এমন মিষ্ট—ইহা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই।

হয়ত সে হরিমোহন পূর্ব্বে কোনও সুন্দরীকে ভালবাসিয়াছিল। তাহার পর গৌরীকে দেখিয়া, তাহার মিষ্ট কথা শুনিয়া, পূর্ব্ব প্রণয়নীকে ভুলিয়া গৌরীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছে।

ঠিক আমার মত। ঠিক আমার মত? একবার নিজের মনের অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। আমিও ত এক রূপসীকে ভাল বাসিয়াছি। শুধু ভাল বাসিয়াছি বলি কেন, একদিন চন্দ্র-তারাকে সাক্ষী রাখিয়া, তাহার চরণে আমার হৃদয় মন প্রাণ—সমস্তই অঞ্জলি দিয়াছি। তাহাকে পাইব না জানিয়া জীবনটা আমার উদ্দেশ্যহীন হইয়াছে। আমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মত সমস্ত সংসারকে নিকেতন করিয়াছি। সেই আমি কি গৌরীর দর্শনমাত্রই তাহাকে বিস্মৃত হইলাম? আমাকে এত হীন মনে করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমি আমাকে আশ্বস্ত করিলাম। ভূমিতে অঙ্গুলি পীড়ন করিতে করিতে আমার অন্তরাত্মাকে শুনাইয়া বলিলাম—"না—আমি রূপের মোহে আকৃষ্ট হই নাই। যে ভালবাসা স্বর্গীয়, যাহা প্রণয়ের বস্তুর নিকট হইতে কিছুমাত্র প্রতিদান প্রত্যাশা করে না, শুধু সর্ব্বস্ব দিয়া নিশ্চিন্ত হয়, আমিও আমার শৈশব-সহচরী কাদম্বিনীকে সেইরূপ ভালই বাসিয়াছি। ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই, ইহা আমি চিত্তের প্রত্যেক অংশ বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছি। স্বয়ং তিলোত্তমা আমার প্রণয়-প্রার্থিনী হইলে, কাদম্বিনীকে ভুলাইতে পারিবে না।

এই সময় চক্ষু বুজিয়া কাদম্বিনীকে একবার হৃদয়মধ্যে বসাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কি জানি কেন, বুকটা অবিরাম ধড়াস ধড়াস করিতেছিল। পড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিবার ভয়েই যেন কাদম্বিনী সে দুরু দুরু কম্পিত

হৃদয়-সিংহাসনে বসিতে চাহিল না। তা না বসুক, তথাপি আমি নিজের বক্ষে হাত দিয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত—অবশ্য মনে মনে—বলিলাম—"না—সে হরিমোহন আমি নই।"

পার্শ্বের ঘর হইতে মূর্চ্ছিতা গৌরী আমার এই মনের কথার প্রতিবাদ করিয়াই যেন বলিল—"তুমি—তুমি—তুমি।"

আমি বালিশে মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলাই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে ডাকিল। আমি উত্তর দিলাম না। বুঝিলাম সে আহারের জন্য আমাকে ডাকিতেছে। আমার ক্ষুধা এক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়াছে—আমি উঠিয়া কি করিব!

বলাই আবার ডাকিল,—"বাবু! উঠিয়া আসুন।"

যে জেগে ঘুমাইতেছে, তাহাকে জাগায় কে? আমি উত্তর দিলাম না। বালিশে জোরে মুখটা চাপিয়া নাসিকার শব্দ করিতে লাগিলাম।

ভৃত্য ফিরিয়া গেল। তাহার কথা শুনিতে পাইলাম। সে বলিতেছে—'বাবু বোধ হয় ঘুমাইয়াছেন। ডাকিলাম সাড়া পাইলাম না।

এই বারে ললিতের কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে গেল। সে বলিল—"গা ঠেলিয়া ডাক্' বল্, পিসি মা কাঁদিতেছে। তাহাতেও না উঠে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বসা। তারপর যাহা বলিবার আমি গিয়া বলিতেছি। তাহার ও ঘুম নয়। ভিটকিলিমি করিয়া পড়িয়া আছে। এরূপ অবস্থা দেখিয়া কেহ কি এরই মধ্যে এত অগাধে ঘুমাইতে পারে?"

তাহার কথার মর্ম্মার্থ বুঝিয়া আমি আগে হইতেই উঠিয়া বসিলাম। কি জানি, ভৃত্যটা যথার্থই যদি হাত ধরিয়া টানিয়া তুলে। মনে মনে বলিলাম—"আরে ম'ল! সারা হিন্দুস্থান ঘুরিয়া শেষে পাগলাগারদে প্রবেশ করিলাম নাকি!

উঠিবার অব্যবহিত পরেই বলাই ফিরিয়া আসিল। আমাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল—"তাইত বাবু ত ঠিক ধরিয়াছে। আপনি ত ঘুমান নাই।"

"না, আমি ঘুমাই নাই। স্ত্রীলোকটীর অবস্থা দেখিয়া, আমি একরূপ হতভম্ব হইয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুমের কথা কি বলিতেছ? সারারাত্রি পড়িয়া থাকিলেও চক্ষুর পলক ফেলিতে পারি কি না সন্দেহ।"

"কেন কি হইয়াছে! ওরূপ ঘটনা আমার বাড়ীতে প্রায় নিত্যই ঘটিয়া থাকে। আপনি উঠিয়া আসুন—মুখের অন্ন ফেলিয়া আসিয়াছেন। ক্ষুধা থাকুক আর নাই থাকুক, আপনাকে একবার আহারে বসিতেই হইবে। নহিলে মা কিংবা পিসীমা—কেহই জল গণ্ডূষটী পর্য্যন্ত মুখে তুলিতে পারিবেন না।"

অগত্যা আমাকে উঠিতে হইল। উঠিয়াই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —"গৌরীর মূর্চ্ছা কি এখনও ভাঙ্গে নাই?"

"ভাঙ্গিয়াছে"—বলিয়াই ললিতমোহন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তার পর বলিল—"যা পার, একটু মুখে দিয়া আইস।"

কি করি, বলাইয়ের সঙ্গে আর একবার আহারে বসিতে চলিলাম।

আহার করিবার স্থানে প্রবেশ করিয়া দেখি—এ কি! তুমি গৌরী!"

গৌরীর উত্তরের ভাবে বুঝিলাম, ক্ষণপূর্ব্বে তাহার যেন কোন অসুখই হয় নাই।

গৌরী কতকটা বিস্মিতার মতই বলিল—"আমার নাম আপনাকে কে বলিল?"

"তা যে বলুক, তুমি এখন কেমন আছ?"

"আমার কি হইয়াছিল?"

আমি এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে করিলাম না। ভাবিলাম,

যথার্থই যদি যুবতী তাহার পূর্ব্বাবস্থার কথা না জানে, তাহা হইলে স্মরণ করাইয়া তাহাকে ভীত করা উচিত নয়। কিন্তু ইহারা কি—কি নিষ্ঠুর! যুবতীর এমন একটা অসুখের পর তাহাকে পরিচর্য্যা করিতে পাঠাইল। এ রমণী তবে কি ইহাদের কেহ নয়? কেহ হইলে, একটু সামান্য সম্পর্ক থাকিলেও কি তাহারা ইহার প্রতি এত মমতা-হীন হইতে পারিত!"

মনে মনে বলা যেমন শেষ করিয়াছি, অমনি ললিতের পিসি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"হা লো ছুঁড়ী, তুই কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিস্ যে, আমাদের একদণ্ডের জন্যও নিশ্চিন্ত হ'তে দিবি না? তুই কি আমাদেয় সমস্ত পরিবারকে পাগল করিবি?"

"কি করিলে তোমরা নিশ্চিন্ত হও বল?"

"আমাদের মাথায় মুগুর মারিলেই এখন আমরা নিশ্চিন্ত হই।"

গৌরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, আর বলিল—

"ও কষ্টটা আমাকে দেওয়া কেন? তোমরাত আর খুকী নও—মুগুর আনাইয়া নিজে নিজে মাথায় মারিলেইত সকল ল্যাঠা চুকিয়া যায়।"

"আত্মহত্যাই আমাদের বরাতে আছে দেখিতেছি।"

এই বলিয়াই তিনি গৌরীর হাত ধরিলেন; এবং তাহাকে আকর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন—"নে ওঠ্—তোর জন্য ব্রাহ্মণের দু' দুইবার খাবার নষ্ট হইল। হাতের অন্ন মুখে তুলিতে পারিল না।"

"আমার জন্য নষ্ট হইল! কেন, আমি ব্রাহ্মণের কি করিয়াছি!"

"কি করিয়াছিস্,তা আমি আর কি বলিব! ওই ত উনি আসিয়াছেন, উহাকেই জিজ্ঞাসা কর্।"

গৌরী আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি করিয়াছি মহাশয়?"

আমি বিষম ফাঁফরে পড়িলাম। আমি কি উত্তর দিব? বাস্তবিক সে ত আমার কিছু করে নাই।

গৌরী কি করিয়াছে জানিতে জেদ ধরিল। আমার পরিবর্ত্তে ললিতের পিসি বলিল—"বামুনের ছেলে উত্তর দিয়া কি বিপদে পড়িবে। ওই দেখ, সামান্য মিষ্টান্ন ভিন্ন আমরা ব্রাহ্মণ অতিথিকে আর কিছু দিতে পারিলাম না। তাঁহাকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইতে পারিলাম না। দুইবার লুচি তরকারি নষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ গণ্ডূষ করিয়া উঠিয়া গল।"

আমি তাঁহাকে তিরস্কারে নিরস্ত করিতে বলিলাম—"পিসিমা! ওকথা মুখেও আনিবেন না। আমার কিছুমাত্র ক্ষুধা ছিল না। শুধু আপনাদের একান্ত অনুরোধে আহারে বসিয়াছিলাম। এই মিষ্টান্নেই আমার যথেষ্ট হইবে।"

গৌরী তখন ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিল। বুঝিল, বাস্তবিকই আমি অদ্ধাশনে নিশাযাপন করিতে চলিয়াছি। তাহার যে কি দোষ যদিও সে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু এটা সে বুঝিল, যে কোন কারণেই হউক তাহারই জন্য ব্রাহ্মণের আহারে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

সে তখন একটু যেন অপ্রতিভ ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"সত্য সত্যই কি দু'দুইবার আপনি আহার পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন? এইমাত্র জানি, একবার আমি আপনাদের আহার মুখে বাধা দিয়াছিলাম। কিন্তু সে ত আমি এরই আদেশে বলিয়াছিলাম। ইনিই আমাকে বলিয়াছিলেন—'ব্রাহ্মণের আসিবার বিলম্বে লুচি ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। আমি গরম লুচি লইয়া যাইতেছি, তুই তাহাদের আচমন করিতে নিষেধ করিয়া আয়।' বাবু ঠাণ্ডা লুচি মুখে তুলিতে পারেন না। দ্বিতীয়বার আমি কি করিয়াছি জানি না।"

"তুমি কিছুই কর নাই।"

"নিশ্চয় করিয়াছি। পিসিমা কি মিথ্যা কহিতেছেন?"

"পিসিমা বুঝিতে পারেন নাই।"

"নিশ্চয় বুঝিয়াছেন। তিনি না বুঝিয়া কোনও কথা বলেন না। নিশ্চয় আমি আপনার আহারে বিঘ্ন হইয়াছি।"

এই গোটা তিনেক নিশ্চয় যোগে গৌরীর কথাটা কিছু ওজস্বিনী হইয়া পড়িল। পাছে আবার সে মূর্চ্ছা যায়, এই ভয়ে আমি একবার পিসির মুখ-পানে চাহিলাম। দেখিলাম গৌরীর মুখের ভাব দেখিয়া পিসির চোক দুটা কপালের দিকে উঠিতেছে তাই দেখিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম —"পিসিমা! আপনি যান। আমি গৌরীকে বুঝাইয়া জলযোগ করিয়া উঠিতেছি।"

গৌরী বলিল—"না, আপনাকে চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, আহার করিতেই হইবে।"

পিসি বলিলেন—"আহার ত করিতে হইবে। তার জন্য ব্রাহ্মণ কি পিত্তি চোঁয়াইয়া রাত্রি একটা পর্য্যন্ত গণ্ডূষের জল হাতে করিয়া বসিয়া থাকিবেন?"

"আগে কার লুচি তরকারি কি হইল?"

"কেন, ব্রাহ্মণকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতে হইবে নাকি?"

গৌরী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি লুচি তরকারি মুখে তুলিয়া ছিলেন? আমি বলিলাম—"না গৌরী, আমি আচমন করিয়া একখানি লুচির ছিন্নাংশ মুখের কাছে তুলিয়া ছিলাম মাত্র।"

"পিসি, তুমি লুচি আর সেই সঙ্গে কি পঞ্চাশৎ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া-ছিলে লইয়া আইস।"

আসল কথা হরিদ্বারে আমাদের দেশের মত তরকারি পাওয়া যায়না। এখনই দুষ্প্রাপ্য তখনত তরকারির পাট ছিলনা বলিলেই চলে। থাকিবার

মধ্যে ছিল ডাল ও আলু ; মাছ সেখানে স্পর্শ করিতেও কাহারও অধিকার নাই। সুতরাং সে স্থানের ভোজ আর আমাদের দেশের জলযোগ বড় একটা পার্থক্য নাই। এই জন্য গৌরীর রহস্যে আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"অক্ষুধায় পঞ্চাশৎ ব্যঞ্জনের আস্বাদ লইয়া উদরাময়ে ভুগিতে ইচ্ছা করি না। তোমরা যাও, আমি কিছু মিষ্টান্ন মুখে দিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করি। রাত্রি অধিক হইয়াছে। বিলম্ব দেখিলে এখনি আবার ললিত মোহন ছুটিয়া আসিবে।

গৌরী আমার কথায় কান না দিয়াই যেন বলিল—"না পিসি, তুমি লুচি তরকারি লইয়া আইস।"

"ব্রাহ্মণকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইব ?"

"যদি খাওয়াইতে না পারি, তাহা হইলে কালই আমি তোমাদের গৃহ-ত্যাগ করিব। আর আমি তোমাদের, বিশেষতঃ তোমাকে জ্বালাতন করিব না।"

এই কথায় আনন্দিত হইয়াই হউক অথবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াই হউক, ললিতের পিসি আমার পরিত্যক্ত খাদ্য আবার আমাকে আনিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

পিসি চক্ষুর অন্তরাল না হইতেই গৌরী আমাকে বলিল—"নাও ঠাকুর খাও।"

সে যখন আমাকে তুমি বলিল, তখন আমিই বা অবকাশ পাইয়া তাহাকে তুমি বলিতে ছাড়িব কেন ? আমি বলিলাম—"তুমি এ কি করিতেছ গৌরী ?"

"কেন কি অন্যায় করিতেছি ? তুমি কি বামুন ?

আমি কি তবে অব্রাহ্মণ ?

"তা তুমিই বলিতে পার, আমি বলিব কেন ?"

"তুমি যখন প্রশ্ন করিয়াছ তুমিই ইহার উত্তর দাও।"

"ব্রাহ্মণের সন্তান বলিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিতে পারি না। তুমি আহ্নিক কর না। গায়ত্রী কখন উচ্চারণ করিয়াছ কিনা সন্দেহ।"

"তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"তোমার কথাতেই বুঝিয়াছি। তুমি আমাকে দাসী মনে করিয়াছিলে? আমি শিরঃকণ্ডূয়ন করিতে করিতে কতকটা জড়ানো ভাষায় তাহা অস্বীকার করিলাম।

আমার অস্বীকারটা বুঝি গৌরীর মনোমত হইল না। সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ভয় কি, লজ্জা কেন? দাসী মনে করিয়াছিলে, তুমি মিথ্যা মনে কর নাই—দোষ কর নাই। যথার্থই আমি ইহাদের দাসী— শুধু এখন নয়, যত দিন বাঁচিব,ততদিন ইহাদের দাসত্ব করিব। কিন্তু যখন আমি তোমার আহ্নিকের আয়োজন করিতে চাহিয়াছিলাম, তখন তোমার বুঝা উচিত ছিল, আমি শূদ্রাণী নই। যদি তুমি আহ্নিকাদি করিতে, তাহলে তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ-কন্যা ভিন্ন আর কিছু বুঝিতে না।"

আমি নির্ব্বাক্। বিস্ময়ে কেবল গৌরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম গৌরী বুঝি, আমার মনোভাব বুঝিল। ঈষৎ হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন যা বলিতেছি ঠিকত।

"তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমার বহুকাল হইতেই ব্রাহ্মণের নিত্য-ক্রিয়া সকল পরিত্যাগ করিয়াছি। শুধু তাই কেন—

"থাক আর বলিতে হইবে না। তাহ'লে তুমি লুচি খাও।"

"সেটা কি উচিত হয় গৌরী? ইহাদের সম্মুখে তুমি আমাকে অপদস্থ করিতে চাও? ইহাদের ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছি, ইহারা আচারী ব্রাহ্মণ।"

বিলক্ষণ আচারী। বিশেষতঃ ওইযে আধবুড়ী পিসি, ও—উনি আবার আচারীর আচারী।"

"তবে ? আমাকে আচার-ভ্রষ্ট বুঝিলে, আর আমার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকিবে না।"

"তাহাতে আর সন্দেহই নাই। আমার বোধ হয়, অন্তরালে কোন স্থান হইতে তিনি তোমার কার্য্যকলাপ দেখিতেছেন।"

"গৌরী! পরিত্যক্ত খাদ্য আর আমি মুখে তুলিব না।"

"বেশ তুলিয়া কাজ নাই। এই বলিয়া যুবতী লুচির থালা হাতে লইয়া দাঁড়াইল।"

আমিও নাম মাত্র আহার করিতে, মিষ্টান্নের পাত্র হইতে একটা যা হোক কিছু মুখে দিবার জন্য আসনে উপবেশন করিলাম। বসিতে না বসিতে একটা কথার স্মরণে বৃশ্চিক-দষ্টের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন গৌরী আমার দিকে পিছন ফিরিয়া দ্বারের দিকে সবে মাত্র বাম চরণটী বাড়াইয়াছে।

আমি ডাকিলাম—"গৌরী!"

গৌরী মুখ ফিরাইয়া বলিল—"কেন ?"

"কিন্তু তুমি যে পিসিমার কাছে কি বলিলে ?" আমাকে যদি লুচি না খাওয়াইতে পার, তাহা হইলে তুমি এ গৃহত্যাগ করিবে। তোমার কথা শুনিয়া, তোমার সঙ্গে এই এক মুহূর্ত্তের আলাপেই বুঝিলাম, তুমি রহস্য করিয়া এ কথা বল নাই।"

"না রহস্য কাহার সঙ্গে করিব ?"

"তাহ'লে তুমি এ গৃহ ত্যাগ করিবে ?"

"নিশ্চয়।"

আমি উচ্ছিষ্ট পুনর্ভোজনের জন্য, তাহাকে পাত্র লইয়া ফিরিতে অনুরোধ করিলাম। "গৌরী! তুমি লুচি ফিরাইয়া আন। আমি চির-

অনাচারী—একদিন আচারের ভান দেখাইয়া তোমার মতন নারী রত্নকে পথে নিক্ষিপ্ত করিব?"

"তাহ'ক ধর্ম্মের ভানও ভাল। আর আচারেই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে।"

আমি একথা কানেও তুলিলাম না। খাদ্য গ্রহণে হাত বাড়াইলাম গৌরী চঞ্চল পদে গৃহত্যাগ করিতে চেষ্টা করিল। নিরুপায় আমি তাহার বাম হস্ত ধারণ করিলাম। খাদ্য পাত্র তাহার দক্ষিণ হস্তে রক্ষিত ছিল। গৌরী সেই পাত্র দূরে গৃহবহির্ভাগে যেখানে সমস্ত উচ্ছিষ্ট রক্ষিত হইয়াছিল—সেই স্থানে নিক্ষেপ করিল।

একটা বিষম শব্দে সমস্ত ঘরটা পুরিয়া গেল। আমার মনে হইল যেন, ভূমিকম্প আমাদের ভূমিসাৎ করিবার জন্য হরিদ্বারের এই গৃহে তাহার স্পন্দনের কিয়দংশ লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সে আমার দুর্ব্বুদ্ধিতায় এই গৃহ চূর্ণ করিবার অবসর পাইয়াছে। ক্রমশঃ—

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ শর্ম্মা।

কপাল।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সেদিন ২০শে আশ্বিন, রবিবার। আমার যেন জ্ঞান-শক্তি লোপ পাইয়া গেল। একি স্বপ্ন—না সত্য ঘটনা? আমার স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহের বশে কিছুতেই ঘটনাটীকে সত্য বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না! বিজ্ঞানে ত এরূপ কথা কিছু নাই। পাঁচ জন শিক্ষিত লোকে আমাকে পাগল বলিবে যে। স্বপ্ন—স্বপ্ন—অঘটন-পটীয়সী স্বপ্নের খেলা, মস্তিষ্কের চঞ্চলতাবশতঃ যাহার উৎপত্তি! কিন্তু ২৫শে আশ্বিন, ৬৬

নং ঠিক মনে আছে। যাহা হউক, মনে ভারি আনন্দ হইল—এইবার প্রেততত্ত্ববিদ্‌দিগের, পরলোক আত্মবিশ্বাসী ধর্ম্মের মূলচ্ছেদ করিয়া দিব! স্বপ্নের ঘটনা এতদূর হয়! তথাপি আহারে, শয়নে, ভ্রমণে, কর্ম্মক্ষেত্রে, কেবল স্বপ্নে নহে, সেই শুচিস্মিতা স্বর্গীয় প্রতিমাখানি আমার মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠিত! যেন সে তাহার করুণাপূর্ণ চাহনিতে, তাহার সরলতা-পবিত্রতা-মাখা দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গীতে আমাকে আমার প্রতিজ্ঞা-পূরণের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

আমার সন্দেহ-সংশয় বিচার-বিতর্কের মধ্যে দেখিতে দেখিতে ২৪শে আশ্বিন কালের চক্রে ঘুরিয়া আসিল। অনেক ওজর-আপত্তির পর আবেদন-নিবেদনের ফলে ২৫শে আশ্বিন ছুটী পাইলাম এবং ২৪শে রাত্রির ট্রেণে কলিকাতা গিয়া কোন এক বন্ধুর বাসায়, সে কৌতূহলক্লিষ্ট বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিলাম। পরদিন বন্ধুর নিতান্ত আগ্রহাতিশয়বশতঃ স্নান এবং যৎসামান্য আহার করিয়া আমার সেই স্বপ্নদৃষ্টার সন্ধানে বাহির হইলাম, কিন্তু আমার উদ্বেগ এবং উদ্দেশ্য এ জগতের কাহাকে ঘূণাক্ষরেও জানিতে দিই নাই। বন্ধুবর আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া হউক, অথবা অন্য কোন কারণে, আমার কলিকাতা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি একটা ওজর-আপত্তি করিয়া, একটু হাসিয়া, তাহার সে কথাটিকে একবারে চাপা দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিয়াছিলাম না। সে রমণী-কথিত গলিটি এত দিন কলিকাতা বাস করিয়াও একদিনও তাহার নাম পর্য্যন্ত আমার কর্ণে পৌঁছিয়াছিল না। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া যখন সেই গলিটীর ভিতর উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলাম, তখন বেলা প্রায় ১২টা। শরতের সূর্য্য আকাশ হইতে সহস্র রশ্মি-সম্পাতে ধরণী বিশেষতঃ কলিকাতাকে বেশ উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। পিপাসা ও ক্লান্তিতে আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল, অত্যধিক মানসিক

বিক্ষোভে মস্তক ঘুরিতেছিল। যখন সেই ৬৬ নং বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, সমস্ত তৃষ্ণা ক্লান্তি এমন কি অনুভব পর্য্যন্ত ক্ষণিকের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। কি একটা অজ্ঞানিত ভয়ে, বিস্ময়ে, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনের যেন কতদিনকার সেই হারান ছিন্ন ভিন্ন তাল-পাকান স্মৃতি ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। সেই দরজা, সেই লৌহ-প্রেক-বিদ্ধ কপাট, সেই উভয়পার্শ্বস্থিত জীর্ণ থাম দুটী যেন আমার কতদিনকার পরিচিত, দৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া মনে হইতে লাগিল! আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একটী ঝি সেই বাটী হইতে বাহির হইয়া যেন কত পরিচিতের মত বলিল, "বাবু, মা-ঠাকুরাণী ডাকিতেছেন, ভিতরে আসুন।"

আমি যন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার মত তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তখন আমার কোন জ্ঞানই ছিল না! যেখানে উপস্থিত হইলাম, সেটি বাহির বাটীর প্রাঙ্গণ; সম্মুখে একটি বৈঠকখানা, একপাশে একটি চৌবাচ্চা তাহার শূন্য হৃদয় মস্তকস্থিত বারিধারাবর্ষী উদ্যত নলের নিকট অনাবৃত করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কেবল দক্ষিণ ছাড়া চারিদিকেই সারি সারি দ্বিতল ও নিম্নতল গৃহগুলি! আর উঠিবার জন্য বাহির থেকে একটি দারুময় সিঁড়ি তাহার বিস্তৃত বক্ষ পাতিয়া দিয়া প্রাঙ্গণে বর্ত্তমান! আমি সেই ঝিএর সঙ্গে সঙ্গে সেই সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলস্থ একটী গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম! সে আমাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া, ফিরিয়া নামিয়া গেল। দেখিলাম, ঘরটীর কোন রূপ সাজসজ্জা নাই। উপরে অযত্নরক্ষিত কয়েকখানি হিন্দুদেবদেবীর ছবি! মেঝের এক কোণে কতকগুলি সদ্য ত্যক্ত পূজা-ব্যবহৃত ফুলের রাশি, আর কোসাকুসি প্রভৃতি পূজার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অবিন্যস্তভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! আর ঠিক মধ্যস্থলে একখানি কুশাসন বিস্তৃত, যেন

কাহার উপবেশনের জন্য উদ্বিগ্নহৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছে। অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্য করিলাম, সে গৃহ হইতে অপর গৃহে যাইবার জন্য যে দরজা আছে, তাহার সন্নিকটে একটি বর্ষীয়সী রমণী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে দণ্ডায়মানা! তাঁহার মুখ হইতে দয়া-করুণা সমবেদনায় ভাস্বর জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল! রমণী আমার এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখিয়া যেন ভয়ার্ত্তের কাণে, দীনের প্রাণে—আশ্বাসবাণীর মত স্নেহমাখা-স্বরে বলিলেন,—"বাবা, এসেছ! আমরা তোমার আশা-পথ চাহিয়া বসিয়া আছি! আহা! বড় কষ্ট হ'য়েছে, রৌদ্রে মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে। মা হ'য়ে তোমাদের কষ্ট আর দেখিতে পারি না। তা' বস। দাঁড়িয়ে রইলে যে—মেয়ের অবস্থা দেখিলে পাষাণও বুঝি ফাটিয়া যায়! ভগবান্ কত দিনে যে মুখ তুলে চাইবেন! ও কপাল! উঠে আয়, তিনি এসেছেন।" অপেক্ষাকৃত উচ্চৈস্বরে এই কথা বলিয়া, আমার বা কাহারও কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, তিনি সেই দ্বার দিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল—আমি নীরবে স্পন্দহীন দেহে প্রস্তর-পুত্তলিকার মত দণ্ডায়মান! কাহার অতি মৃদু কোমল পদধ্বনি শুনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই স্বপ্নদৃষ্টা রমণীমূর্ত্তি ধীরে—অতি ধীরে সে দরজার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল! সে বৈধব্যসাজে সজ্জিতা মূর্ত্তি কি সুন্দর, কি মনোহর! তাহার কাছে মনুষ্যকল্পিত মূর্ত্তি অতি নীচে—বুঝি তার একটী পদাঙ্গুলিরও যোগ্য নহে। তাহার রুক্ষ আলুলায়িত কুন্তল বাতাসে মৃদু মৃদু দুলিতেছে, ব্রহ্মচর্য্য সংযমের পবিত্র জ্বলন্ত জ্যোতিঃ তাহার মুখ হইতে দেব-মহিমার মত চারিদিকে প্রসারিত! তাহার সুগঠিত প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে ব্রত-আরাধনা-পূত লাবণ্যধারা যেন উছলিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে! পরিহিত শুভ্র বসনখানি নিষ্কলঙ্ক যশের

মত তাহার দেহলতা বেষ্টন করিয়া আছে! তাহার সেই আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নে দীনতা, হীনতা, আকুলতার প্রীতিধারা খেলা করিতেছে! তাহার ক্ষুদ্র ললাটতট, সুপুষ্ট রক্তিমাভ গণ্ডস্থল যেন জ্যোৎস্না-স্নাত ঘুমন্ত গোলাপদলে আবৃত! আমাকে দেখিয়া রমণীর মুখে জ্যোৎস্না-লোকে সমুদ্রবক্ষের মত একটা হাসি-হাসি-ভাব জাগিয়া উঠিল। অতি দীনকাতর কম্পিতকণ্ঠে রমণী বলিল,—"আসিয়াছেন, এ দাসীর কথা রাখিয়াছেন! ক্ষমা করিবেন, আপনাকে কত কষ্ট দিলাম। কিন্তু আজ আমার জন্মান্তরব্যাপী ব্রতের উদ্‌যাপন, আমার সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান। আজ আমার জীবনের মুক্তি—মুক্তি—চির আনন্দের দিন।" এইকথা বলিতে বলিতে তরুণী বাতাহত কদলীর মত ভূলুণ্ঠিতা হইয়া আমার চরণদ্বয় ধারণ করিল এবং চির-পিপাসিতের মত আমার চরণ-ধূলি লইয়া মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে বলিল,—"আঃ বাঁচিলাম। গুরু এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিলেন!" আমার বাক্‌শক্তি রোধ হইয়া গেল, সহস্র চেষ্টা করিয়া একটী কথাও মুখ হইতে বাহির হইল না! সত্যই যেন আমি পুত্তলিকা! আমার নয়ন আছে, যেন দর্শন শক্তি নাই; কর্ণ আছে, শুনিতে পাইতেছি না; জিহ্বা আছে, কথা কহিবার শক্তি নাই; কেবল যেন একটী মধুর শীতল প্রাণারাম পবিত্রস্পর্শ আমার সমস্ত অঙ্গ ব্যাপিয়া আমার ইন্দ্রিয়গুলির মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে; আমার মনে সঞ্চারিত হইয়া আমার সমস্ত মনোবৃত্তিগুলি লোপ করিয়া দিয়াছে। রমণী উঠিল, আমার হস্ত ধরিয়া সেই কুশাসনখানির উপরে আমাকে বসাইয়া পার্শ্বে বসিল! আবার বলিল,—"স্বামিন্, অভাগিনীর তপস্যালব্ধ ধন, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন ত?" অতি কষ্টে জড়িত জিহ্বায় আমার মুখ হইতে বাহির হইল—"তোমার অপরাধ? মনে হইতেছে তোমার ও পবিত্র স্পর্শে আমি মোহশূন্য পাপশূন্য হইলাম,

আমার সমস্ত সন্দেহ, সমস্ত অন্ধকার তোমার ও স্পর্শের শীতল অগ্নিতে পুঞ্জীভূত তৃণগুচ্ছের মত জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।” “জানিবেন, আমি আপনারই কপাল, আর কাহার নহি, আর কিছুরই নহি, জানিনা, কেন পিতামাতা এ জনমে আমার নাম কপালকুণ্ডলা রেখেছিলেন— আমি আপনারই কপাল, আপনার অদৃষ্টের মত আপনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত মিশ্রিত। যাক্—আজ আমি ধন্যা—সার্থককর্ম্মা—আর আপনাকে হারাইব না” এই বলিতে বলিতে রমণী অনুচ্চস্বরে ডাকিল— “মা!” কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম, সেই পূর্ব্বদৃষ্টা মূর্ত্তিমতী মাতৃস্নেহরূপা রমণী নানাবিধ ফল ও মিষ্টান্নে সজ্জিত একখানি থালা লইয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেলেন। তরুণীর আগ্রহাতিশয্যেও কাতরোক্তিতে অতিকষ্টে তাহার কিছু কিছু গলাধঃকরণ করিলাম। কপাল তখন উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র হইতে কিছু ভোজনাবশেষ তুলিয়া লইয়া মস্তকে গাত্রে মাখিতে মাখিতে বলিল,—“আজ আমার বহুদিনকার সাধ মিটিল, আজ আমি পবিত্র হইলাম।—ওঃ বহুদিনের বিরহ-বিচ্ছেদের আয়তনে আজ জলধারা পড়িল!” কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রমণী আবার বলিল,—“আপনি উতলা হইবেন না, অবিশ্বাসে আর নিজেকে অধঃপতিত হইতে দিবেন না,—পরলোক সত্য, কর্ম্মফল সত্য, গুরুদেবের কৃপায় সব জানিয়াছি; আরও জানিয়াছি—আগামী পূর্ণিমার দিন, আমার এবারকার মত মর্ত্ত্যলীলার অবসান। সেই দিন আমার এ দেহ ত্যাগ হইবে। এ জনমে আর দেখা হইবে না। কিন্তু গুরুদেব বলিয়াছেন,—পরজন্মে আমাদের মিলন অবশ্যম্ভাবী বিধির বিধান! কিন্তু দাসীর একটী অনুরোধ রাখিতে হইবে। আমার সম্বন্ধে আর কোনরূপ অনুসন্ধান করিবেন না। গুরুদেবের কৃপায় আমার এ জীবনরহস্য মা জানেন, আর আমি জানি। আপনি এই মরদেহটার জন্য, এই এইবারকার নিষ্ফল জীবনটার জন্য

কৌতূহল প্রযুক্ত হইয়া কোনরূপ সন্ধান লইবেন না। আমার বাক্য সত্য, গুরুদেবের বাক্য সত্য, ইহা স্বপ্ন নহে, ভ্রম নহে, মস্তিষ্কবিকৃতি নহে—এ মরজগতের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটনা। দেখিবেন, দাসীর শেষ অনুরোধটী রাখিবেন।" এই বলিয়া কপাল আবার পদধূলি গ্রহণ করিল, সযত্নে মস্তকে রাখিল, তার পর ডাকিল—"ঝি!"—সেই ঝি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলে, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া আমার সেই কপাল, আমার সেই জন্মজন্মান্তের হারান রতন ছলছল নয়নে, বাষ্পবেগরুদ্ধ ভরা আওয়াজে বলিল,—"ঝি!—বাবুকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।" আমার উঠিবার সামর্থ্য ছিল না, নড়িবার শক্তি ছিল না। প্রাণপণ চেষ্টায় উঠিলাম, কম্পিত-পদে, ঘূর্ণিত-মস্তকে মাতালের মত টলিতে টলিতে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

আমার প্রতিশ্রুতিমত আমি তাহার কোন সন্ধান লই নাই। তার পর কয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই আশ্বিন মাস আসিলেই সেই সমস্ত স্মৃতিগুলি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীবন্তভাবে আমার মস্তিষ্কে নৃত্য করিতে থাকে। সেই দিন অবধি আমি কর্ম্মফলে বিশ্বাসী, পরলোকে আস্থাবান, আমি হিন্দু হইয়াছি। সেই দিন হইতে আমি চিদানন্দ, সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী, গৃহস্থ হইয়াও উদাসীন। আর সেই দিন হইতে আমার বুকের অমানুষিক যন্ত্রণা সারিয়া গিয়াছে। এখন সময়ে সময়ে কি জানি কেন আমার মনে একটী আনন্দের সমুদ্র যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠে; আমি পাগলের মত আপন মনে হাসি, আবার কি এক অদম্য পুলকে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া, আমি আত্ম-হারা হইয়া যেন কিসের সঙ্গে মিশিয়া যাই!

আমার শিক্ষিতাভিমানী পাঠকদের অনেকে আমার এ জীবন-মরণের কাহিনীকে বোধ হয় একটী আষাঢ়ে গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিবেন।

যাঁহারা বলিবেন,—"সায়ান্স ত এ কথার সমর্থন করে না। জীবন ত ক্ষণিক বিজ্ঞানপ্রবাহ মাত্র, আত্মা আবার কোথায়?" তাহাদিগকে বুঝাইবার আমার আর কিছু নাই। তবে কবি বাক্যে বলি,—

"There are more thing in heaven and earth,
Horatio! than are dreamt of in your philosophy.

চিদানন্দ।

গোপেশ্বরের চাকুরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ক্ষীরোদ যখন শুনিতে চাহিল, তখন সে বলিল—সমস্ত দিন আমার শরীরটা অত্যন্ত খারাপ আছে—এবং রাত্রে অমঙ্গলকর স্বপ্ন দেখিয়াই মনটা এরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছে।

ক্ষীরোদ ভাবিল এ আবার কি? যাহা হউক সে শীঘ্রই আসিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া কাছারী চলিয়া গেল।

বিধুমুখী দিবা ভাগে নানা কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলেও বেলা ৫ টার পর অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—বহির্দ্দেশে প্রতি শব্দে প্রতি পাদক্ষেপে স্বামীর আগমন অনুভব, বার বার অধৈর্য্য ভাবে সদরদরজায় ছুটিয়া আসা এবং বাটীর মধ্যে থাকিলেও সমগ্র মনটী সদরদ্বারে ফেলিয়া রাখিয়াও যখন ছয়টা বাজিয়া গেল, তখন এক অজানা আশঙ্কায় রৌরুদ্যমানা হইয়া পড়িল।

চাকর লক্ষণ আশ্বাস দিয়া বলিল—ভয় কি মা, আমি এখনি বাবুর খবর এনে দিচ্ছি।

কিন্তু সন্ধ্যার পর লক্ষণ যে সংবাদ আনিয়া দিল তাহাতে অতি বড় দৃঢ় চিত্ত পুরুষও বসিয়া পড়ে।

সে বলিল যে বাবু খাবারের সঙ্গে গোরাদের বিষ দিয়াছিল বলিয়া ফাটক হইয়াছে কাল সকালে ফাঁসি হইবে।

সমুহ বিপদেও ধৈর্য্য বাঁধিয়া লক্ষণকে সঙ্গে লইয়া উকিল অবিনাশ বাবুর বাটীতে প্রতিকারের আশায় উপস্থিত হইল—অবিনাশ বাবুর স্ত্রী বিপদ শুনিয়া একান্ত দুঃখিত ও সহানভূতি প্রকাশ করিলেন কিন্তু অবিনাশ বাবু বিশেষ ভরসা দিতে পারিলে না, বলিলেন ওখানে পল্টনের আইনে চলে আমাদের আইনের এক্তেয়ার নাই, তা ছাড়া রাত্রে পল্টনের সাহেবদের সঙ্গে দেখা ত হবেই না, তা ছাড়া কাল কাছারী না খুলিলে ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা জজ ইহাদের কাহারো নিকট হইতে প্রতীকারের উপায় হইবে না। কাছারী খুলিলে প্রতীকার হইতে পারে বটে কিন্তু তার পুর্ব্বেই যে সব শেষ!

বাধ্য হইয়া, বিধুমুখী একে একে সমস্ত নামজাদা উকীল ও দেশী হাকিমগণের দ্বারস্থ হইল, কিন্তু সকলেরই এক কথা—রাত্রে কিছুই করা যাইতে পারে না।

অবশেষে একবার বিপিনের সঙ্গেও দেখা করা উচিত মনে করিল—বিপিন গ্রামসম্পর্কে দেবর, এখানকার জুনিয়ার উকীল—বাসাভাড়া যুটে না। বিপিন বলিল,—"বৌদিদি, আমার মত সামান্য লোকের দ্বারা যে কোন উপকার হয়, তা ত মনে হয় না, উমেশ কি কালী বাবুর মত কোন বড় উকীল চেষ্টা কর্‌লে কিছু না কিছু নিশ্চয়ই হোতো।"

বি। চেষ্টা ত কর্‌লুম্ ঠাকুরপো কিন্তু তাঁরা ত কেউ গা কর্‌লেন না—এখন অদৃষ্ট—দে'খ যদি তোমার দ্বারাই কিছু হয়।

বিপিন ছুটিল। পল্টনের কর্ণেল সাহেব ভদ্রতাসূচক ব্যবহার করিয়া

বলিলেন,—"বাবু আমি বড় দুঃখিত—ক্ষীরোদকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতাম ও ভালবাসিতাম, কিন্তু আমার কোন হাত নাই, সামরিক বিধানে অদ্যই বিচার হইয়াছে।"

বি। সাহেব! আসামী কি দোষ স্বীকার করিয়াছে?

সা। না।

বি। অন্য কোন প্রমাণ আছে?

সা। চাক্ষুষ প্রমাণ নাই—তবে বিচারে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, সে দোষী।

বি। হইতে পারে সে নির্দ্দোষী, এবং আনুমানিক বিচারে সম্ভবতঃ ভুলও হইতে পারে।

সা। কিন্তু ইহার আপীল বা পুনর্বিচারের ত কোনই কারণ নাই।

উপায় নাই দেখিয়া কালেক্টার সাহেবের বাঙ্গালায় যাত্রা করিল—বাঙ্গালার কক্ষগুলি তখন উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত—পিয়ানোর মৃদুমন্দঝঙ্কৃত সুর ও কলকণ্ঠের উচ্চ হাস্যে মুখরিত।

আরদালি জনুমিয়া ঘাড় নোয়াইয়া ও দন্তপংক্তিদ্বয় যথাসাধ্য বিকাশ করিয়া, বিপিনের নিকট হইতে কার্ড লইয়া ভিতরে দিয়া আসিল।

আধ ঘণ্টা পরে হুকুম আসিল যে, সাহেবের এখন ফুরসৎ নাই, বিশেষ আবশ্যক হইলে প্রাতে ছোট হাজরীর পর দেখা হইতে পারে—নহিলে কাছারীতে আবেদন দিতে হইবে।

হতাশ হইয়া জজ সাহেবের বাঙ্গালায় শেষ চেষ্টার জন্য দৌড়িল।

জজ সাহেব বলিলেন,—"বাবু এখানে বিশেষ আইনের গোলযোগ রহিয়াছে; সুতরাং আমার এজলাসে এ মামলা চলিতে পারে কি না, তাহাই বিবেচ্য। তবে যদি তুমি কাল কাছারীতে যথেষ্ট প্রমাণ

প্রয়োগে দরখাস্ত দাখিল করিতে পার ত সে বিষয়ে আনন্দের সহিত বিবেচনা করিব।”

বিফল প্রয়াসে ম্লানমুখে হতাশভাবে ফিরিয়া আসিল।

বিধুমুখীর মাথায় আর একবার বজ্রাঘাত হইল।

বিপিন বলিল,—“পূর্ব্বেই ত বলিয়াছিলাম—আমার মত সামান্য উকীলের কথায় কেহই শুনিবেন না। যদি কোন সাহেব বা বড় উকিল দাঁড়াইত, তাহা হইলে হয়ত এতক্ষণেই একটা কিছু কিনারা হইত।

বিধুমুখী ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল,—“শুনিয়াছিলাম যে, এখানকার ডাক্তার সাহেব নাকি তোমার দাদার বিশেষ মুরুব্বি—তাঁকে একবার ধরিলে হয় না?”

বিপিন। একথা মন্দ নয়, সাহেব জাতের প্রাণ আছে—যদি একবার মনে লাগে ত প্রাণপণে চেষ্টা করবে।

একখানা পাল্কী করিয়া এবং বিপিন ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া বিধুমুখী ডাক্তার সাহেবের বাসায় যাত্রা করিল।

তখন এদেশে পাল্কীর যথেষ্ট প্রচলন ছিল। ডাক্তার সাহেব তখন নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন—সংবাদ পাইয়া ঢিলা ইজের, সার্ট ও চটি জুতা পরিয়াই বাহিরে আসিলেন। প্রথমে মনে হইয়াছিল, বুঝি বা কোন রোগীর জন্য কল্ আসিয়াছে; কিন্তু বিপিনের মুখে ক্ষীরোদ বাবুর বিপদ শুনিয়াই পার্শ্বস্থ কক্ষের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন,—“সারা—সারা?

মেম সাহেব উত্তর করিলেন,—“কি পল্ তোমাকে একটু ব্যস্ত বোধ হইতেছে কেন?”

সা। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের পল্টনের ক্ষীরোদ বাবুকে জানিয়া থাকিবে—সেই তোমার জন্মদিনে অতি সুন্দর ফুল উপহার দিয়াছিল।

ক্ষীরোদের অত্যন্ত বিপদ, কর্ণেল কারসনের বিচারে জেল হইয়াছে—হয়ত প্রাণদণ্ডও হ'তে পারে।

মেম। এত বড় আশ্চর্য্য কথা—আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, এ বিষয়ে তুমি কি কিছু করিতে চাও?

ডা। হাঁ, সারা; কিন্তু তুমি কি এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করিবে?

মেম। নিশ্চয় পল্—আমি ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত করিব।

ডা। ক্ষীরোদ বাবুর স্ত্রী এখানে আসিয়াছে—তুমি নিশ্চয়ই জান যে, হিন্দু স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত না হইলে বাহিরে আসিতে সাহস করে না, আরো তুমি জান যে, তাহারা অন্য পুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা কহে না।

সারা উচ্চ হাস্য তুলিয়া বলিল,—"হাঁ, জানি, এ বিষয়ে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত ভীরু ও কুসংস্কারাপন্ন। মেম সাহেব পাল্কীর নিকটে আসিয়া ও বিধুমুখীর নিকট সমস্ত শুনিয়া, স্বামীর কথামত আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, মাঝি, তুমি চুপ থাক—তোমার কোন ডর্ নেই, আমার স্বামী পল্ হয় আজই রাত্রে একান্ত কাল সকালে ক্ষীরোদ বাবুকে নিশ্চয়ই খালাস করিয়া লইয়া আনিবে, তুমি নিশ্চিন্ত ভাবে চলিয়া যাও।"

ডাক্তার সাহেব তখনি নৈশ পরিচ্ছদ পরিয়া সগাঢ় সপ্রেম চুম্বনে পত্নীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। মেমসাহেবও প্রত্যুত্তর দিয়া বলিলেন,—"পল্, আশা করি, তুমি শীঘ্রই কার্য্যোদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিবে—আমি তোমার প্রতীক্ষায় উৎসুকচিত্তে জাগিয়া থাকিব।

ডাক্তার সাহেব অতরাত্রে ক্ষীরোদবাবুর মুক্তির সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া গোরা ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

গোরা ডাক্তার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পল্টনের হাঁসপাতালে পীড়িত গোরাদ্বয়ের অবস্থা বিষাক্ত ভক্ষ্যদ্রব্য ও বমন পদার্থ দেখাইয়া বলিলেন,—

"এ যাত্রায় বহুকষ্টে বমন করাইয়া রোগীদের রক্ষা করিয়াছি—যদিও এখন আর প্রাণের আশঙ্কা নাই, তথাপি সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই—এখনো স্বর বদ্ধ—গাল গলা ফুলিয়া আছে।"

ডাক্তার সাহেব রোগীদের অবস্থা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, বিষাক্ত ভক্ষ্যদ্রব্যের নমুনা ও বমন পদার্থের কিছু অংশ শিশিতে ভরিয়া গোরা ডাক্তারের সমক্ষে শীলমোহর করিয়া লইয়া, টুপিটী মাথায় তুলিয়া, ঈষৎ সহাস্যবদনে বলিলেন,—"শুভ বিদায়, ডাক্তার—তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনারা একজন নিরীহ ব্যক্তিকে দণ্ড দিতেছেন—আশা করি, কাল প্রাতে আমি আপনাদের ভ্রম দেখাইয়া দিতে পারিব।"

গোরা ডাক্তার একটু অবাক্ হইয়া ডাক্তার সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ফিরিবার মুখে ক্ষীরোদের বাটীর নিকট থামিয়া খবর দিয়া গেলেন যে, কল্য প্রাতে নিশ্চয়ই ক্ষীরোদ বাবুকে মুক্তি করিয়া আনিবেন, এবং সদর দারোগাকে বলিয়া গেলেন যে, রাত্রে ক্ষীরোদ বাবুর বাটীতে যেন একজন কনেষ্টবল পাহারার জন্য মোতায়েন থাকে।

বিধুমুখীর অত্যন্ত আশা ছিল যে, ডাক্তার সাহেব ক্ষীরোদকে নিশ্চয়ই রাত্রেই খালাস করিয়া লইয়া আসিবেন—তাহা হইল না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িল; হঠাৎ গত রাত্রের স্বপ্ন, প্রাতঃকালের বৈরাগী ও তাহার উপদেশের কথা মনে পড়িল। তখন আঁচলটি কাঁধের উপর বেড়িয়া, ভূমিতে লুটাইয়া, রমণীর মানসক্ষেত্রে মধুসূদনের যে কল্পিত মূর্ত্তি জাগিল, তাঁহারই চরণপ্রান্তে আপনার সমস্ত আবেদন ও প্রার্থনা প্রাণ ভরিয়া ঢালিয়া দিল। কে বলিতে পারে যে, এই সাধ্বী স্ত্রীর সকরুণ প্রার্থনা সত্যকার শ্রীমধুসূদনের চরণপ্রান্তে পৌঁছিতেছিল না।

ক্ষীরোদ বন্দী—সত্যই বন্দী—এ কল্য রাত্রের নিশার স্বপন-সম

কাল্পনিক অনুভূতি নহে। ভাবিল—কিন্তু এ কি ? কি আশ্চর্য্য ঘটনা সমস্যা—এত শীঘ্র এরূপ ভাবে তাহারি জীবনের উপর দিয়া কল্পনার খেলা যে এতদূর বাস্তব সত্যে পরিণত হইতে পারে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য !

আজ কিন্তু সে বিশেষ কাতর হয় নাই, বরং কতকটা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। মনে হইল—আচ্ছা, এটাও ত স্বপ্ন নয় ?—ভগবান্ করুন যেন সত্য বাস্তবিকই স্বপ্ন হয়—কিন্তু বহুবিধ পরীক্ষার পর নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, সত্য—কঠোর সত্য। ইহার কবল হইতে—এই কঠোর ইংরাজের আইন সাময়িক বিধান হইতে মুক্তির কোন আশাই নাই।

জীবন তিক্ত, বিষাক্ত ও মরুময় হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই সেই প্রহেলিকাতুল্য বৈরাগী ও তার "অমূল্য" উপদেশ মনে জাগিল।

ভাবিল—বুকভাঙ্গা ভাবনা লইয়া আকাশ পাতাল ভাবিয়া কি হইবে ? দেখা যাক্, বৈরাগীর উপদেশের কোন সার্থকতা আছে কি না ?

কল্য রাত্রে স্বপ্নে ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিল—বোধ হয়, তাহাতে কতকটা অভ্যস্তও হইয়াছিল—তাই আজ প্রাণ ভরিয়া আকুল আবেগে মধুসূদনকে মুক্তির প্রার্থনায় ডাকিল।

তন্ময় ভাবে কিরূপে তাহার দুঃখনিশার সুদীর্ঘ ঘণ্টাগুলি কাটিয়া গিয়াছে তাহা ঠিক স্মরণ নাই—যখন বাহিরের দিকে চাহিল, তখন ঊষার আলোকে চতুর্দ্দিক্ ফরসা হইয়া উঠিতেছে। আশঙ্কা জাগিল—বুঝি বা তার সুখের বা দুঃখের সব শেষ হইবার বিলম্ব নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার সাহেব প্রত্যূষে উঠিয়াই ব্যারাকে কর্ণেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—"প্রিয় কর্ণেল, আমার বিবেচনায়, আপনারা একজন নিরীহ ব্যক্তিকে বিনা দোষে দণ্ডিত করিতেছেন—অতএব আমার অনুরোধ যে, আপনি ইতস্ততঃ বা কালবিলম্ব না করিয়াই আপনার ভ্রম সংশোধন করুন।"

কর্ণেল ঈষৎ চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন যে, অবশ্য আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এখনি এবং আনন্দের সহিত আমার ত্রুটির সংশোধন করিব কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনার প্রমাণ করা উচিত যে, আমাদের ভুল হইয়াছে।

এই কথাগুলি বলিয়া পল্টনের ডাক্তার সাহেবকে ডাকাইলেন।

ডাক্তার বলিলেন,—'নিশ্চয়; আমি কাল রাত্রে আসিয়া বিশেষ পরীক্ষায় জানিয়াছি যে, আপনাদের ভুল।"

কর্ণেল বলিলেন,—"কিরূপে? আমাদের ডাক্তার বলিতেছেন যে, ভক্ষ্য দ্রব্য অত্যন্ত বিষাক্ত—বহু কষ্টে তাহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। এখনও মুখ ও গলা বিষম ফুলিয়া আছে এবং স্বর বদ্ধ; তা ছাড়া রোগীরা সাক্ষ্য দিয়াছে যে, গোমস্তা বাবু তাহাদের প্রতি পূর্ব্ব আক্রোশ বশতঃ খাইতে দিয়াছিল।"

ডা। কিন্তু ইহা কি ক্ষীরোদ বাবু স্বীকার করিয়াছে?

ক। না; তবে রোগীদের কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন হেতুই দেখিতেছি না—তাহারা সখ্ করিয়া কেন প্রাণান্তকর বস্তু ভক্ষণ করিবে। ধরিয়া লইলাম যে, আমাদের গোমস্তা ইচ্ছা করিয়া দেয় নাই, হয়ত ভুলক্রমে দিয়াছিল, কিন্তু এরূপ সাংঘাতিক ভুলও ত মার্জ্জনীয় নয়!

ডা। আমার প্রথম বক্তব্য যে, ভক্ষ্য দ্রব্য আদৌ বিষাক্ত নয়!

কর্ণেল গোরা ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিলেন। পল্টনের ডাক্তার দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—'কখনই না, চিকিৎসা-কালে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সমস্ত বিষক্রিয়া বিদ্যমান।

ডা। ভুল বুঝিয়াছেন ডাক্তার—আমি এদেশে বহুদিন আছি; ভক্ষ্য-দ্রব্যের দেশী নাম কচু, ইহা আলুর ন্যায় সুখাদ্য ও পুষ্টিকর দ্রব্য; দোষের মধ্যে অশোধিত বা অসিদ্ধ অবস্থায় ভক্ষণ করিলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ আনয়ন করে—ইহা কোন অবস্থাতেই মৃত্যুকারক নহে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গুরুতর প্রদাহ দেখিয়া আপনি ইহাকে বিষক্রিয়া অনুমান করিয়াছেন—আমি ইহার নমুনা শীলমোহর করিয়া রাখিয়াছি এবং আপনারা যদি নিরীহ বন্দীকে এখনই সসম্মানে না মুক্তি দেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে সরকারী ভাবে আমি বিষম আন্দোলন করিব।

ক। তবে ক্ষীরোদ বাবুর উহা খাইতে দিবার উদ্দেশ্য কি?

ডা। এখানেও আপনারা বিষম ভুল করিয়াছেন, যে ইহার ব্যবহার জানে, সে কখনই কাঁচা খাইতে দিবে না।—আমার দৃঢ় বিশ্বাস—কাণ্ডজ্ঞান বিহীন মূর্খ গোরারা কোন প্রকার সুখাদ্য মনে করিয়া চুরি করিয়া খাইয়াছিল, তাহার পর শাস্তির ভয়ে গোমস্তা বাবুর ঘাড়ে দোষ চাপাইয়াছে।

কর্ণেল উঠিয়া হাসপাতালে গোরাদের বলিলেন,—"দোহাই ভগবানের, তোমাদের এক কথায় হয়ত একজন নিরীহ ব্যক্তির দণ্ড হইতেছে—ধর্ম্মের, সভ্যতার, বীরত্বের ও মনুষ্যত্বের খাতিরে তোমরা এখনো স্বীকার কর যে, গোমস্তা বাবু তোমাদের খাইতে দিয়াছিলেন বা তোমরা নিজেরা খাইয়াছিলে?"

একজন রোগী জড়িত কণ্ঠে বলিল,—দোহাই ঈশ্বরের, এ অবস্থায়

মিথ্যা বলিব না, বাবুর কোন দোষ নাই—"আমরা চুরি করিয়া খাইয়াছিলাম।"

তৎক্ষণাৎ তাহাদের বন্ধনের আদেশ দিয়া, কর্ণেল সাহেব ক্ষীরোদ বাবুকে মুক্তি দিয়া বলিলেন,—"বাবু আমার ভ্রমের জন্য আমি দুঃখিত ও অনুতপ্ত এবং এজন্য যে অকারণ কষ্ট পাইয়াছ, আশা করি, তাহা তুমি বিস্মৃত হইবে ও ক্ষমা করিবে।' পরে ডাক্তার সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ডাক্তার! আমার এই ভ্রম প্রদর্শনের জন্য তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ ও তোমার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।'

গোরা ডাক্তার ক্ষীরোদের করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন,—"বাবু আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য আমি দুঃখিত এবং আশা করি তুমি অকপট চিত্তে মার্জ্জনা করিবে।" হতভাগ্য বন্দীদ্বয় ও নিরীহ ব্যক্তির মুক্তিতে দূর হইতে নীরবে সহানুভূতি জানাইল।

পরদিন প্রাতে উকিল অবিনাশ বাবুর চায়ের আড্ডায় যথারীতি বহু উকিল মক্কেল ও দালালের সমাবেশ এবং খোস গল্প ও পরচর্চ্চা।

অবিনাশ বাবু বড় উকিল কাজেই অনেকে জুনিয়ার থাকিবার প্রত্যাশায় নিয়মিত হাজিরা দিতে তোষামোদ করিতে শুভাগমন করেন। অবিনাশ বাবু হাসিয়া বলিলেন আরে শুনেছ আমাদের ক্ষীরোদ খালাস পেয়েছে—বড়ই সুখের কথা—শুনে প্রাণটা এতই আনন্দিত হল তা আর বলতে পারছি না।

সকলে। নিশ্চয়ই, বড়ই সুখের কথা।

অবি। কাল যখন তার স্ত্রী এল তখনই জানতাম যে ও বেআইনী আটক নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবে স্ত্রীলোক ত তা বুঝে না, সে পীড়াপীড়ি করে ধরলে যে যেতেই হবে।

কথায় প্রকাশ পাইল যে অন্যান্য উকীলেরা সকলেই জানিতেন যে বেআইনী আটক সকালে নিশ্চয়ই খালাস পাবে।

অবি। আর দেখলে বিপনে ছোঁড়াটা কালকের উকীল গোঁফের রেখা উঠেনি—সে ছোড়াটা মিছেমিছি ছুটোছুটি করে মরলো।

উমেশ। ফলও তেমনি সকল যায়গাতেই অর্দ্ধচন্দ্র।

হরিশ। তা আর হবে না ওদের পোঁদে কে?

অবি। আরে আমি যদি হোতুম ত দেখতে ওই কালেক্টর সাহেব উঠে এসে সেকহাণ্ড করতো।

রাম। ভেবেছিল বুঝি যদি ফাঁকতালে নাম ডাক ও পশার হয়ে যায়—আরে বাবা একি ছেলের হাতে মোয়া যে ঝাঁ করে পশার হবে—পেটে বিদ্যে থাকা চাই।

অবি। সে আর বুঝতে পারিনি—এই কাজ করে গোঁপ পাকালুম। তারিণী দাসের যে মামলায় আমার পশার জমে গেল তাতে খাটতে হয়েছিল কত? সাত রাত্রি না ঘুমিয়ে নজীর দেখেছিলুম বক্তৃতা শুনে জজ সাহেবকেও তারিফ দিতে হয়েছিল। উকিল সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে বিপনে ছোড়াটা কেবল ফাঁকি দিয়ে পশারের মতলবেই মিছে ছুটাছুটি করেছিল—আইনে একটু দখল থাকলে আর এ কর্ম্মভোগ হত না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

———

অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়।

ভগবানের রাজ্যে কতই ঘটনা হইতেছে, তাহা আলোচনা করিয়া ভালমন্দ স্থির করা আমাদের সাধ্য নাই। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষই বলিতে পারেন যে, ইহার মধ্যে কি রহস্য আছে।

তাই আজ আমাদের বাটীর একটি ঘটনা দিতেছি—

সে আজ ২০ বৎসরের কথা; আমার মাসীমাতা কৃষ্ণনগরের একটি কক্ষে বসিয়া সন্ধ্যাপূজা করিতেছিলেন। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে; গৃহে গৃহে পুরনারীগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া রাত্রি-আগমনের বারতা জানাইয়া দিতেছে; শীতকালে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যে যাহার কক্ষে আশ্রয় লইয়াছে; তাঁহার সন্তানাদিও তাঁহারি সন্নিকটে বসিয়া এক আত্মীয়ার কাছে গল্প শুনিতেছে।

মাসীমাতা জপে বসিয়াছেন বটে, কিন্তু কিছুতেই মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না; একটা আলোক তাঁহার চক্ষের সাম্‌নে ঘুরিয়া বড়ই উত্ত্যক্ত করিতেছিল; কিন্তু যতবারই চাহিয়া দেখেন, আর দেখিতে পান না। তখন তিনি মনকে দৃঢ় করিয়া চক্ষু বুজিতেই দেখিলেন, আলোক অগ্নিরূপে পরিণত হইয়া ধু ধু শব্দে জ্বলিতে লাগিল; তাহার ভিতর একটি মেয়ে পুড়িতেছে। তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"বৌদি দেখ দেখ, কে মেয়ে প্রদীপে পুড়িয়া যায়"অবিরত চীৎকারে ও ভয়ে তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। আত্মীয়া তখন উঠিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন; দেখিলেন, কোথায়ও কিছু নাই। তখন ছুটিয়া গিয়া মাসীমাতার মুখে জল দিলেন এবং বলিলেন,—"মেজদি! উঠ, ভয় নাই! ছেলে মেয়েরা ত তোমার

সাম্‌নে রহিয়াছে।" তখন তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইলেন, কিন্তু মন ঠিক করিতে পারিলেন না।

রাত্রিতে আহারাদির পর তিনি শয়ন করিয়াছেন, সবেমাত্র তন্দ্রাবেশ হইয়াছে, এমন সময় দেখিলেন, তাঁহার মেজ ভাসুরঝি বলিতেছে,—"কাকীমা! আমি আসিয়াছি" তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"মোহিত! তুমি এখানে কি ক'রে এলে মা!" সে বলিল,—"তুমি জান না কাকীমা? আমি আজ সন্ধ্যাবেলা পুড়িয়া গিয়াছি। আমি তোমাকে বড় ভালবাসি, আমি তোমার নিকট আসিব, কিন্তু তোমাকে জ্বলিয়ে পুড়িয়ে তবে যাব।" মাসীমা তখন চীৎকার করিয়া মেসো মহাশয়কে ডাকিলেন এবং সমস্ত বলিলেন। তখন তিনি বলিলেন,—"সন্ধ্যা হইতে ঐ বিষয় চিন্তা করায় ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ। যাহ'ক অতি উৎকণ্ঠায় সে রাত্রি কাটিল।

পরদিন সকালে মেসো মহাশয় কাজে বাহির হইয়াছেন, ছেলেরা প্রাতর্ভোজন করিয়া কেহ বা পড়িতেছে, কেহবা খেলিতেছে; মাসীমাতা ছোট পুত্রটী লইয়া সেইখানে বসিয়া আছেন; এমন সময় তারযোগে সংবাদ আসিল,—মোহিতবালা গত সন্ধ্যায় অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা পড়িয়াছে। মাসীমাতা কাঁদিতে লাগিলেন। ভগবানের মায়া বোঝা ভার। তিনি সেই মাসেই অন্তঃসত্বা হইলেন। পরে পূর্ণগর্ভাবস্থায় দাদা মহাশয় তাঁহাকে লইয়া আসিলেন। প্রসব-সময় উপস্থিত; পূর্ব্ব ঘটনায় সকলেই উদ্বিগ্নচিত্ত; অধিকাংশই সকলেই আঁতুড় ঘরে; এমন সময় একটী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল। মেয়েটী সর্ব্বাঙ্গে পোড়া পোড়া দাগ। সে আজ ১৯ বৎসরের কথা। এখনও তাহার গায়ে বোধ হয় ছ একটা দাগ আছে। দিদিমা ভীত হইয়া গণনাদি করাইলেন। শুনা গেল,—৮ বৎসর পর্য্যন্ত অগ্নিতে ভয়। সেই পর্য্যন্ত তাহাকে চোখে চোখে রাখা হইত। কিন্তু

এমনি সংস্কার,—মেয়েটী আগুন দেখিলেই মহানন্দে হাত দিতে যাইত। মেয়েটীর নাম হিরণ, যাহ'ক আট বৎসর ত কাটিয়া গেল।

ক্রমে অতীত স্মৃতি একে একে সবার মন হইতে দূর হইতে লাগিল। হিরণ বয়স্থা হইলে তাহার বিবাহ হইল। স্বামী ওভারসীয়ার, কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিয়া হিরণকে লইয়া থাকেন। তাহার দুই মেয়ে এক ছেলে। আমাদের বাটী সে খুব কম আসে। তাহার বিষয়ে সকলে নিশ্চিন্ত। কিন্তু সহসা কালের কঠোর শাসনে সে স্বামী হারাইল। সব সাধের খেলা ফুরাইল। ১৯ বৎসর বয়সে পতিহীনা অনাথ বালক বালিকার সহিত মাতার আশ্রয়ে আসিল।

এখন হিরণ মরিয়া মাসীমাকে জ্বালায়নি বটে, কিন্তু জীবিত থাকিয়া সে যে অগ্নিশেল মাসীমার বুকে দিল, তাহাতে সে নিজেও জ্বলিবে ও মাসীমাতা যতদিন বাঁচিবেন. তাঁহাকেও জ্বালাইবে।

এখন ধীরে ধীরে সেই ২০ বৎসরের কথা সকলের মনে উদয় হইয়া মুর্ত্তিমান্ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সকলকেই দগ্ধ করিতেছে।

শ্রীমতী———পাঠিকা।

অন্তর্দ্ধান।

সে আজ অনেক দিনের কথা; তখন আমি মাদারিপুর হাই স্কুলে পড়িতাম। বিধুভূষণ ঘোষ নামক একটী বালক আমাদের সঙ্গে পড়িত। বিধুভূষণ লেখাপড়ায় যেমন, ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি ক্রীড়ায়ও তার সেইরূপ প্রশংসা ছিল। আমাদের স্কুলে প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজা উপলক্ষে থিয়েটার হইত; থিয়েটারেও বিধুভূষণের বেশ নামডাক ছিল;

নায়কের চরিত্র প্রায় সেই অভিনয় করিত। সে বৎসরও থিয়েটার বাদ গেল না—বিধু প্রধান অংশ অভিনয় করিবে। কিন্তু এই সময়ে তার জীবনরঙ্গভূমির অসময়ে যবনিকা পড়িয়া গেল—বিধু কলেরায় আক্রান্ত হইল। কত ডাক্তার, কত বৈদ্য দেখিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—সেই দিনই তার মৃত্যু হইল।

ক্রমে থিয়েটারের দিন আসিল—স্কুলের প্রাঙ্গণে ষ্টেজ বাঁধা হইল—নির্দ্দিষ্ট সময়ে অভিনয় আরম্ভ হইল—সুমধুর ঐকতানে গৃহ ভরিয়া ফেলিল।

ক্রমে তৃতীয় অঙ্ক শেষ হইয়া গেল; আমার এক বন্ধু—নরেন্দ্রনাথ সরকার সেই অবসরে বাহিরে জল পান করিতে গেল। সে দেখিল, বিধুভূষণ দরজার ধারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নরেন বিধুর মৃত্যুসংবাদ শুনে নাই; সে উৎসাহের সহিত বলিল,—"কি, বিধু যে—এখানে কেন, ভিতরে যা না!" কিন্তু বিধুভূষণ নিশ্চল নিথর—কোন উত্তর করিল না।

নরেন ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল,—"ভাই! বিধু দরজায় দাঁড়িয়ে; ভিতরে আস্‌তে বল্‌লেম, কিন্তু এল না।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"সে কি! বিধু ত মরিয়া গিয়াছে! সে আবার আস্‌বে কেমন ক'রে?" নরেন অবজ্ঞায় হাসিয়া হাসিয়া আমায় দেখাইতে লইয়া গেল। ঠিকই ত! দরজার পাশে দাঁড়াইয়া—বিধুভূষণ! সেই আকৃতি—সেই সব! কে বলিবে মরিয়াছে! আমি "বিধু, বিধু" বলিয়া ডাকিলাম; কিন্তু কোথায় বিধু? চক্ষের পলক ফেলিতে দেখি, সে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সপত্নী-বিদ্বেষ।

গত ১লা ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত এঁড়িয়াদহ-গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে একটি অলৌকিক ঘটনা হইয়া গিয়াছে। "ক" বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রাতঃক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময় অকস্মাৎ একটা অশ্রুতপূর্ব্ব অস্ফুট স্বর সেই রন্ধনগৃহ হইতে উত্থিত হওয়াতে, সকলের মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হইল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, বালিকা-বধূটি মেঝের উপর পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে! তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইল এবং মূর্চ্ছাগত হইয়াছে ভাবিয়া, প্রতিবিধানোপায় অবলম্বন করিবার জন্য সকলেই শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই ভূতাবেশের সমস্ত লক্ষণ পরিণতি প্রাপ্ত হইল। তখন তাহাকে ধরিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল—দেহে যেন সহস্র অসুরের বল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমে এই অদ্ভুত সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং তৎসঙ্গে গৃহমধ্যে জনতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে একজন স্থানীয় ওঝা তথায় উপস্থিত হইল। তদ্দৃষ্টে আবিষ্টা বালিকা রোষকষায়িত-লোচনে কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল,—"উহাকে তাড়াইয়া দাও।" তচ্ছ্রবণে উপস্থিত নরনারী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; বিশেষতঃ ভূতাবেশ বলিয়া যাহারা প্রথমে স্বীকার করে নাই, তাহাদের সে সংস্কার ক্রমশঃ অপনোদন হইল।

ওঝাটি প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলে পর, নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল।

তুই এখনই চ'লে যা—"আমি যা'ব না।"

তুই কে?—"সতীন।"

কেন এসেচিস্?—"আমার খুসি।"

কি ক'রে এলি?—"কেন, আমি যেখানে থাকি, সেখানে পানের পিচ্ ফেলেছিল যখন, সেই সময় ধ'রেছি।"

তুই কোথায় থাকিস্?—"পাইখানার নিকট ঐ গাছটায়।"

এ তোর কি ক'রেচে যে একে কষ্ট দিচ্ছিস?—"কেন একে আমার সব গহনাগাটি কাপড়চোপড় পরায়; আমার ছোট মেয়ে আছে, তার জন্য কেন সে সব রেখে দেয় নি। আমার জিনিষ আমার মেয়ে ব্যবহার ক'র্‌বে। কেন, সে কি ভেসে এসেচে! আমার সাতনর বিক্রি ক'রে 'কলের গান' কেনা হ'য়েচে—আমার গহনাগাটি এই রকম ক'রে সব নষ্ট করা হ'চ্ছে। আমি কিছুতেই ছাড়্‌ব না।"

বধূমাতার উন্মাদ ভাব দর্শনে "ক" বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এতক্ষণ নিজ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে উক্ত প্রকার অদ্ভুত কথোপকথনে বিস্মিত হইয়া কৌতূহল নিবারণার্থ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বালিকা অভিবাদনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—"বাবা, আপনি কেন এখানে কষ্ট করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন? কেন, আমি ত আপনাকে দু'দিন দেখা দিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার স্মরণ হইল, বাস্তবিক দু'রাত্রি তিনি কনিষ্ঠ-ভ্রাতার মৃত পত্নীকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু দৃষ্টিভ্রম বিবেচনা করিয়া, সে বিষয় লইয়া আর কোন আন্দোলন করেন নাই। এক্ষণে তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতৃবধূকেই দেখিয়াছিলেন। তার পর তিনি তাহাকে উদ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার অভিপ্রায় কি এবং কেন সে এই বালিকাকে কষ্ট দিতেছে। তাহাতে সে বলিল যে, যদি

ইহাকে বাপের বাড়ী পাঠান হয়, তাহা হইলে আর কোন অত্যাচার করিবে না; কিন্তু এখানে রাখিলে, তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না! শেষে ওঝার কঠোর উৎপীড়নে স্বীকার করিল যে, বালিকাকে ছাড়িয়া দিবে। ইহার প্রমাণস্বরূপ ওঝা প্রস্তাব করিল যে, ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় জলপূর্ণ একটি বৃহৎ কলসী দাঁতে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। তাহাতে সে সম্মত হইল, এবং উপস্থিত নরনারীর সমক্ষে একটি বৃহৎ জলপূর্ণ কলস দাঁতে করিয়া তুলিয়া, আবিষ্টা বালিকা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া বাড়ীর বাহিরে গিয়া ফেলিয়া দিল। সেই সঙ্গে নিজেও অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। তখনই তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীর ভিতর আনা হইল। খানিক পরে বালিকা স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইল।

ক-বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী একটি শিশু কন্যা রাখিয়া সূতিকাগৃহে মারা যান। মৃত্যুর কিছু দিন পরে, তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। বিবাহের পর, ক-বাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহার মৃতা ভ্রাতৃবধূকে দুই দিন দেখিতে পাইয়াছিলেন। দৃষ্টিভ্রম বিবেচনা করিয়া সে বিষয় লইয়া তিনি আর বিশেষ কিছু আন্দোলন করেন নাই। বোধ হয়, তাহার কন্যার সম্বন্ধে কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে, ভাসুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে বিফল-মনোরথ হইয়া সপত্নীকে আক্রমণ করিয়াছিল। কারণ, এইরূপ করিলে, সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবে এবং তৎসঙ্গে নিজের উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে। এতদভি-প্রায়ে সে সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। কিম্বা, নানারূপ অসন্তোষের ব্যবহার অর্থাৎ তাহার অলঙ্কারাদি বিক্রয় এবং তাহার মূল্য-বান্ পোষাক পরিচ্ছদ সপত্নীকে পরিধান করান ইত্যাদি ব্যাপারে রুষ্ট হইয়া, এই সকল অনিষ্ট ও অসন্তোষের একমাত্র মূল বালিকা সপত্নীকে আক্রমণ করিতে যত্নবতী হইয়াছিল। পরে, তাহার প্রতি বিদ্বেষজ্ঞাপক

এই নিষ্ঠুর আদেশ হইল যে, সে শ্বশুরালয়ে থাকিতে পারিবে না ; বাপের বাড়ী যদি তাহাকে পাঠান হয়, তাহা হইলে আর কোন অত্যাচরে করিবে না। এই বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সেই দিবস অপরাহ্নে পুনরায় তাহাকে আক্রমণ করিল! সকালে দাঁতে ঘড়া লইয়া যখন চলিয়া গেল, তখন সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, একেবারেই গেল, আর আসিবে না। কিন্তু অপরাহ্নে পুনরাক্রমণের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সকলেই বিস্মিত হইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেই সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ওঝাটিও আসিয়া হাজির হইল। বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, বালিকাকে সেই দিবসই পিত্রালয়ে প্রেরণ করা হয় নাই বলিয়া পুনরাক্রমণ করিয়াছে। উপস্থিত নরনারী ইহাও বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, এ যে সে ওঝার কর্ম্ম নহে! তাহাতে ওঝাটি কিছু অপ্রতিভ হইয়া দ্বিগুণ উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিল। এমন সময় এক ব্যক্তি আত্মিককে উদ্দেশ করিয়া বিদ্রূপসূচক কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাহাতে আত্মিকটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আবিষ্টা বালিকার মুখ হইতে ভীতিপ্রদ এই কয়েকটি কথা ব্যক্ত করিল,—"তুমিই না শ্মশানঘাটে বাঁশ দিয়ে আমার মাথার খুলি ভেঙ্গেছিলে, তোমায় দেখ্‌বো।" পরে শোনা গেল, বাস্তবিক সেই ব্যক্তিই ঐ কাজ করিয়াছিল। উপস্থিত নরনারী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং সাবধানতার সহিত গতিবিধি করিতে লাগিলেন। অনেকে ভয়ে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এখনও সেই এক কথা,—যদি তাহার সতীন্‌কে বাপের বাড়ী রাখা হয়, তাহা হইলে, আর কোন অনিষ্ট করিবে না ; নচেৎ তাহাকে কেহই তাড়াইতে পারিবে না। আর তাহার মেয়ের উপর যেন কোন রকমের অযত্ন না হয়। এবারেও যা'বার সময় পূর্ব্বের ন্যায় জলপূর্ণ একটি বৃহৎ কলস দাঁতে করিয়া লইয়া গেল।

পরদিন প্রাতে বালিকাকে তাহার পিতাঠাকুর আসিয়া লইয়া গেলেন। পরে শোনা গেল যে, বালিকা পিত্রালয়ে নির্ব্বিঘ্নে কালাতিপাত করিতেছে।

উক্ত ঘটনাটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে হইয়াছিল, সেইজন্য নাম ধাম ও অন্যান্য বিষয় গোপন রাখিতে বাধ্য হইলাম। এইরূপ ঘটনা আজকাল খুব বেশী বেশী হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও আমাদের চৈতন্য উদয় হইতেছে না। ম'রে গেলে যেন ছাই মাটির সঙ্গে আমাদের সকল সম্বন্ধ ঘুচে গেল,—এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা কিছুতেই দূর হইতেছে না। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়!

শ্রীঅমৃতলাল দাস।

কর্ম্মানুসারে জীবের গতি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অভ্যাস মানব-জীবনের একটী গুরুতর প্রয়োজনীয় অংশ। অভ্যাসই মানুষকে নির্ম্মাণ করে। স্বভাব ও অভ্যাস এই দুইটী লইয়া মনুষ্য জীবনের ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম শুভাশুভ দৃষ্ট হয়। শিশু মানব স্বভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত নূতন নূতন ব্যবহার ও চিন্তা-প্রণালী শিক্ষা করে। অভ্যাস আমরা এ পৃথিবীতে সঞ্চয় করি; স্বভাব আমরা জন্মগ্রহণের সহিত পাইয়া থাকি। সুতরাং স্বভাব আর পূর্ব্বজন্মের সংস্কার একই জিনিস। তাহার কারণ, সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই আমরা মৃত্যুর পর লইয়া যাইতে পারি না। এই সংস্কার আবার পূর্ব্বজন্মের কতকগুলি ভালমন্দ অভ্যাসের ফল। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসই

সংস্কাররূপে ইহজন্মের স্বভাবে পরিণত হয়। এই পৃথিবীতে জন্ম লইয়া যে স্বভাব পাই, তাহা পূর্ব্বজন্মের অভ্যাস ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং এই জন্মে আমাদের স্বভাবের উপর আবার কতকগুলি নূতন নূতন অভ্যাস সংগ্রহ করিতে হয়। অতএব স্বভাব ও অভ্যাস লইয়াই মানব-জীবন।

অভ্যাস aguired বা সঞ্চিত, স্বভাব innate বা প্রাক্তন। মন্দ স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিলে, মন্দ অভ্যাস দিনে দিনে নূতন নূতন সহস্র পথে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং মন্দ স্বভাব হইতে নানা রকম মন্দ অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। আবার ইহ জন্মের মন্দ স্বভাব গতজন্মের মন্দ স্বভাবের ফল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অভ্যাসই মানুষকে মানুষ বা পশু করে এবং স্বর্গের সুখ বা নরকের দুঃখ দান করে।

কিন্তু স্বভাব ও অভ্যাসের মধ্যে এইটুকু বিশেষত্ব যে, স্বভাব পরিবর্ত্তন করা যায় না অথচ অভ্যাস ইচ্ছামত পরিবর্ত্তিত করা যায়। কথায় আছে, "স্বভাব না যায় ম'লে" অর্থাৎ না মরিলে স্বভাব যায় না।

অভ্যাসই মানব-জীবনের ভবিষ্যৎ সূচনা করে। ভাল অভ্যাস হইতে সুখ এবং মন্দ অভ্যাস হইতে দুঃখ জন্মায়।

স্বভাব অভ্যাস অপেক্ষা শক্তিমান্ বটে কিন্তু অভ্যাসে স্বভাবকে নিয়মিত করা যায়। মন্দ স্বভাবই একেবারে নষ্ট করা যায় না; তবে ভাল অভ্যাস-সাহায্যে মন্দ স্বভাবের কার্য্য বন্ধ করা যায়। কারণ, অভ্যাসই কালক্রমে স্বভাবের ন্যায় শক্তিমান্ হইয়া উঠে। ইংরাজীতেও একটী প্রবাদ আছে,—Habit is the second Nature. অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব মাত্র।

রত্নাকর দস্যু মন্দস্বভাবসম্পন্ন লোক ছিল। কারণ, সে দস্যুকুলে জন্ম লইয়াছিল; পরে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, নানা রকম কদভ্যাস শিক্ষা করিয়াছিল। সেই রত্নাকর দস্যু 'মরা' 'মরা' জপ করিতে আরম্ভ

করিয়া নূতন অথচ সুন্দর অভ্যাস আরও করিল, এবং তাহাতেই তাহার কলঙ্কময় গত জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল,—রত্নাকর দস্যু বাল্মীকি মুনি হইলেন, সচ্চিন্তায় ও ঈশ্বর-সাধনায় শুদ্ধচিত্ত হইতে অকস্মাৎ দেবভাষায় জীবে প্রেম ঘোষণা করিলেন—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম" ইত্যাদি।

রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকি মুনিতে পরিবর্ত্তন বড়ই বিস্ময়কর। এই উপাখ্যানটী পড়িলে মনে হয়, সৎ অভ্যাসের ফল কিরূপ মহৎ; মন্দ স্বভাবও অভ্যাসগুণে পরিবর্ত্তিত হয়।

কিন্তু স্বভাবের শক্তি এত বেশী যে, সময় সময় অভ্যাসের শক্তিতেও তাহাকে দমন করিতে পারে না। সংস্কৃত হিতোপদেশে এই সারবাণ উপদেশটী আছে,—

"স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে"—অর্থাৎ স্বভাবই প্রধান।

নীলবর্ণ শৃগালের গল্পে এই—সত্যটী বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই গল্পটী সকলেরই জানা আছে, তথাপি সংক্ষেপে বলিতে হইল। এক শৃগাল দৈবাৎ এক নীলভাণ্ডে পড়িয়া গিয়া নীলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। বনের সকল পশু তাহাকে এক নূতন পশু মনে করিয়া, তাহাদের রাজা করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। নীলবর্ণ শৃগাল অত্যন্ত ধূর্ত্ততার সহিত সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতির উপর রাজত্ব করিতে লাগিল এবং নিজে যে শৃগাল, কোনরূপে ইহা কাহাকেও জানিতে দিল না। পাছে অপর শৃগাল তাহাকে চিনিতে পারে, এইজন্য সে বনের সকল পশুকে শৃগালজাতির উপর বিশেষ নজর রাখিতে আদেশ করিল ও আপন সভায় শৃগালের স্থান দিল না। শৃগাল হইয়াও অতি সাবধানেতে থাকিতে লাগিল। পাছে শৃগালের অভ্যাস দেখিয়া কেহ সন্দেহ করে, এই ভয়ে সে শৃগালের

বৃত্তির যতদূর সম্ভব সঙ্কোচ করিল। একদিন সন্ধ্যাকালে নীলবর্ণ শৃগাল সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি বলবান জন্তুদিগকে লইয়া সভা করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময়ে দূরে শৃগালের উচ্চরব শুনিয়া, বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া গিয়া মনের আনন্দে স্বজাতিপ্রীতিতে আত্মহারা হইয়া, নিজে শৃগালের স্বাভাবিক উচ্চরব না করিয়া থাকিতে পারিল না। শৃগালের স্বর শুনিয়া অপর সকল জন্তু তাহাকে শৃগাল বলিয়া চিনিতে পারিল এবং কিছুক্ষণ সকলে অধোবদনে থাকিয়া পরে নীলবর্ণ শৃগালকে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। নীলবর্ণ শৃগালের স্বভাব অতি সাবধানে থাকিয়াও বাহির হইয়া পড়িল। স্বভাবই প্রধান হইয়া পড়ে।

হিতোপদেশে স্বভাবের প্রাধান্য সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। বনের জন্তু যতই ধর্ম্মশাস্ত্র পড়ুক না কেন, যতই উপদেশ পাউক না কেন, তাহার হিংস্র স্বভাব কিছুতেই যায় না ; যেমন গরুর দুধ স্বভাবতই মধুর। গরু ঘাস পাতা প্রভৃতি অনেক জিনিস খায়, কিন্তু গরুর দুধের প্রকৃতিতে মধুরতা আপনিই আসে।

স্বভাব তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর জিনিস ; কিন্তু অভ্যাসের শক্তিও বড় সামান্য নয়। অনেক সময়ে অভ্যাসের গুণে স্বভাবের শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই সম্বন্ধে আমরা একটী গল্প বলিব—

কোন বনে একটী ভীষণ বিষধর বাস করিত। তাহার প্রতাপে নিকট-বর্ত্তী গ্রামের লোকেরা সর্ব্বদাই আকুল হইয়া থাকিত। রাখালেরা সেই বনের ধারে গরু চরাইতে আসিত না। সেই বনের ধার দিয়া যে পথ চলিয়া গিয়াছে সে পথ দিয়া পর্য্যন্ত সর্পের ভয়ে কেহ যাতায়াত করিত না। একদিন এক সন্ন্যাসী সেই বনের পথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে রাখালেরা আসিয়া, বারণ করিয়া বলিল,—ওপথে যাইবেন না, একটা

ভয়ানক সর্প আছে।” সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিলেন,—“আচ্ছা দেখা যাক।”

পরে সন্ন্যাসী বনের ধারে আসিলে সর্পটা হিংস্রস্বভাববশতঃ যেমন তাড়া করিয়া আসিল, অমনি সন্ন্যাসী মন্ত্রবলে তাহাকে শক্তিহীন করিলেন, এবং অবশেষে তাহাকে বুঝাইলেন “হিংসা ছাড়িয়া ঈশ্বর উপাসনা করিলেই সর্পজন্মের পর ভাল জন্ম হইবে।

সর্পটা সন্ন্যাসীর শিষ্য হইল। ক্রমে সে সর্পটি একেবারে ভালমানুষ হইয়া পড়িল। রাখালেরা তাহাকে একদিন প্রহার করিয়া আধমরা করিলে, তবুও সে কিছু করে না; কারণ গুরুর উপদেশ ‘হিংসা করিও না।’

অবশেষে সে রাখালগণের ভয়ে দিবার পরিবর্ত্তে রাত্রিতে বাহির হইয়া আহার খুঁজিত এবং হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া গিয়া, একেবারে ক্ষমাপ্রধান যোগীর ন্যায় জীবন জাপন করিতে লাগিল। সে ক্রমে এত ধার্ম্মিক হইল যে, তাহার গুরুদেব পর্য্যন্তও বিস্মিত হইয়া তাহাকে অল্পবিস্তর ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। অভ্যাসের শক্তি বিপুল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।
বি, এ, বি, এল্।

ক্রটি-স্বীকার

গত কার্ত্তিক সংখ্যায় "কর্ম্মানুসারে জীবের গতি" নামে যে প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে, উহা "প্রেতত্ব ও তাহার মোচনোপায়"হইবে, ছাপাখানার ভুল বশতঃ ইহা হইয়াছে। এইরূপ প্রায়ই ভুল হইত বলিয়া, আমরা পূর্ব্ব ছাপাখানা হইতে অলৌকিকরহস্য উঠাইয়া লইয়াছি; আশা করি, পুনরায় এরূপ ভুল আর হইবে না। ইতি অঃ রঃ সঃ

"পলাশী-সূচনা," "অশ্রুধারা," ভীষণ প্রতিশোধ" প্রভৃতি
পুস্তক প্রণেতা
শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত

১। বিধি-প্রসাদ।

মনোরম সামাজিক উপন্যাস।

২৬২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তিনখানি সুন্দর চিত্র শোভিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থে জন্মান্তরবাদ, প্রেততত্ত্ব, কর্ম্মফল, পাপ পুণ্যের বিচার, হিন্দু শাস্ত্রসম্মত ঐ সকলের ব্যাখ্যা, আদর্শ হিন্দুর, ভ্রান্ত, অজ্ঞান হিন্দুর, এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষিত, পাশ্চাত্য সভ্যতাদীপ্ত বাঙ্গালী-সাহেবের সমাজ চরিত্র, পাশাপাশি ভাবে প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আর্য্যঋষিগণপ্রবর্ত্তিত সনাতন ধর্ম্মের সরল ব্যাখ্যা আছে, অথচ তাহা একদেশ-দর্শিতাপূর্ণ নহে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দর্শন-শাস্ত্র সমন্বয়ে লিখিত এই সকল জটিল বিষয় যাহাতে সুকুমার-মতি বালক, সামান্য শিক্ষিতা মহিলা পর্য্যন্তও সহজে বুঝিতে পারেন, তদ্রূপ ভাষায় ও ভাবে উপন্যাসের বর্ণনাছলে বিবৃত করা হইয়াছে।

এইত গেল শাস্ত্রীয় কথার বিচার, এতদ্ব্যতীত কি কি আছে দেখুন। আনুষ্ঠানিক হিন্দু জীবনের আদর্শ চিত্র, পিশাচ প্রকৃতি মানবের ভীষণ জীঘাংসা, হিন্দু বালিকার প্রবল ধর্ম্মভাব, পরহিত সাধনের অনুপম দৃষ্টান্ত—এ সকলের অভাব পরিদৃষ্ট হইবে না। এক কথায় এমন শাস্ত্রোপদেশ-মূলক, গবেষণাপূর্ণ, সারগর্ভ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস বহুকাল যাবৎ বঙ্গ-সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। যদি ভাবুক হও, ধর্ম্ম পিপাসু হও, জ্ঞানার্জ্জনে যত্নপরায়ণ হও, তাহা হইলে 'বিধি-প্রসাদ' পাঠ করিয়া নিজে পরিতৃপ্ত হও—আত্মীয় স্বজনকে পড়িতে দিয়া কর্ত্তব্য সাধন ও তাহাদিগের সন্তোষ বিধান কর।

Cover printed by A. BANERJI, at the METCALFE PRINTING WORKS :
34, Mechuabazar Street, Calcutta.

সূচী।

"অলৌকিক রহস্যের নিয়মাবলী

১। "অলৌকিক রহস্য" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলাদি সমেত সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র; ভিঃ পিঃতে পাঠাইতে ৵০ এক আনা অধিক লাগে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ তিন আনা।

৩। কেবল ৶১০ সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা একখণ্ড প্রেরিত হইবে।

৪। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পর-সংখ্যা-প্রকাশের পূর্ব্বে না জানাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনরায় পাঠাইতে দায়ী থাকিব না।

৫। কেহ যদ্যপি পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া রিপ্লাই পোষ্টকার্ড লিখিবেন।

৬। "অলৌকিক রহস্য"-সম্বন্ধীয় চিঠি-পত্র, টাকা-পয়সা আমার নামে এবং প্রবন্ধাদি বিনিময়ার্থ পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ইউনিভার্শেল লাইব্রেরী, } শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৩।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, } প্রকাশক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পুনরাগমন সামাজিক উপন্যাস যাহা ধারাবাহিক 'অলৌকিক রহস্যে' বাহির হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

অলৌকিক রহস্য।

৫ম ভাগ। পৌষ, ১৩২০। ৬ সংখ্যা।

গোপেশ্বরের চাকরী।

এরূপ অবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঘটিল অর্থাৎ বিধুমুখী জিদ করিয়া বসিল যে, এমন চাকরী আর ক'রে কাজ নেই। অবশ্য বিধুমুখীর তরফ হইতে একেবারেই যে যুক্তি ছিল না, তা নয়; যেখানে ছুট্ বল্‌তেই জেল, হাতকড়া, ফাঁসি এবং বিনা বিচারে হঠাৎ দ্বীপান্ত থেকে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ও হ'তে পারে, সে স্থলে একটার বেশী দুটো কাঁচা মাথা যার নেই, সেরূপ পুরুষ মানুষের কখনই যাওয়া উচিত নয় ইত্যাদি; তা ছাড়া অপমান উদ্বেগ ও লাঞ্ছনা প্রভৃতিগুলাও যে নিতান্ত ফাউ বা লঘুপাক নয়, তাহাও যুক্তির সহিত দেখাইয়া দিল।

কথাগুলা যে একদম অকারণ আশঙ্কা বা অহৈতুকী ভীতিমূলক, তা শুধু ক্ষীরোদ কেন, নীরদ, বিনোদ ও কুমোদ প্রভৃতিও স্বীকার করিতে বাধ্য। তবে এমন স্থলে বিনা আপত্তিতে একতরফা কবুল ডিক্রী স্বীকার করাটা যে স্ত্রৈণতামূলক, এ তথ্য নিশ্চয়ই ক্ষীরোদ অবগত ছিল; তাই সে চিন্তাকুলচিত্তে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে আপনার স্বপক্ষীয় যুক্তিবাণগুলি শাণিত অস্ত্রের ন্যায় বিধুমুখীর ব্রহ্মাস্ত্রের মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

এই চাকরী ছাড়া না ছাড়া সমস্যায় উভয়ের মধ্যে যে গম্ভীর বাগ্‌যুদ্ধ হইল, তাহা কতকটা এইরূপ :—

বি। তুমি যাই বলনা কেন, আমি আর ও চাকরী তোমায় ক'র্ত্তে দিচ্ছি না। তুমি আজই ইস্তফা দিয়ে এস।

ক্ষী। আহাহা! তুমি যে বুঝ্‌ছ না। আমারও কি সাধ যে, ওই চাকরী আবার করি? আমাকে কি এখুনি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে ক'র্‌ছে না? তবে কি জান, হঠাৎ তৈরি অন্নটা ছেড়ে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ? দু' চা'র দিন একটু ভাবতেই দাওনা?

বি। না, দু' চা'র দিন আর ভেবে কাজ নেই, ঢের হ'য়েছে। সেদিন যদি ডাক্তার সাহেব না গিয়ে প'ড়্‌ত ত তৈরি অন্ন কে খেত? এতোতেও আক্কেল হ'লো না? ছি!

ক্ষী। ফাঁড়াটা তো কেটে গেছে; এখন আজকেই একটা যে হেস্ত নেস্ত ক'রে ফেল্‌তে হবে, তারই বা মানে কি?

বি। না, আর আমি ও জায়গায় যেতে দেবো না। আজকেই ইস্তফা না দিলে, আর কখনই তুমি পার্‌বে না। যেখানে বিচার নেই, সেখানে আবার কাজ করে?

ক্ষী। (হাসিয়া) বিচার নেই ব'লো না; বিচার আছে ব'লেই ত ফাঁসীকাঠ থেকে নেমে এলাম। দেখ, হঠাৎ একটা আয় ছাড়া কিছু নয়।

বি। কেন? দেশে কি আমরা সত্যিই হাঁড়ি চড়িয়ে ব'সে আছি যে, দু' ছ'মাস চাকরী গেলে আর চ'ল্‌বে না? আর যদি একান্তই চাকরী ক'র্‌তে হয় ত, সত্যিই কি কোন চাকরী জুট্‌বে না? মুখ্‌খু নয়ত আর তুমি?

কোন স্বামীই স্ত্রীর নিকট মূর্খ হইতে চায় না। সুতরাং ক্ষীরোদ

বলিল,—"কি জান, চাকরীটা ভাল; এতে মান সম্ভ্রমও আছে, নগদ দু' পয়সাও আছে। এই চাকরীর জোরেই ত এতদিন আমরা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ও সচ্ছল অবস্থায় কাটিয়ে এসেছি।"

বিধুমুখীকে আরও একটু কাহিল করিবার মতলবে তার স্ত্রীজনোচিত দুর্ব্বলতায় ঘা দিয়া বলিল,—"এই যে তোমার গহনা গাঁটী প্রায়ই হ'চ্ছে; সে ত এই চাকরীরই দৌলতে ?"

অবশ্য সুখে স্বচ্ছন্দ ও অত্যধিক সচ্ছলতায় থাকাটা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় হ'লেও কাঁচা পয়সাটাকে বিধুমুখী নানা কারণে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না; তাই বলিল,—"সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল; না হয় তোমার কতকগুলা বাবুগিরি কিম্বা মাতলামি চল্‌বে না। না হ'লে কিছু উপোস ক'রে থাকতে হবে না। আর যেখানে আমার হাতের নোয়া নিয়ে টানাটানি প'ড়েছিল, সেখান থেকে আর গয়না গাঁটী চাই না।"

ইহার উপরে আর কথা চলে না; কিন্তু তা বলিয়াই যে দপ্‌ ক'রে আলো নিভিয়া যাওয়ার মতন তর্কটা হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল, একথা আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি না।

অবশ্য কিছু না কিছু তর্কের ঢেউ উঠিয়াছিল; কিন্তু বিধুমুখীর ধনুর্ভঙ্গ পণ, কাঁচা সুন্দর মুখের কাতর দৃষ্টি, বড় বড় চোখের ছল ছল চাহনী, অর্দ্ধাঙ্গিনীর আব্‌দার এবং তরুণী ভার্য্যার অনুনাসিক অভিযোগ প্রভৃতিতে ঠিক থাকা যে কত দুরূহ, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। অগত্যা ইহা বলা বাহুল্য যে, ক্ষীরোদেরই পরাজয় হইল। ফলতঃ এরূপ স্থলে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে এবং হওয়া উচিত, তাহারই বা ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন ? পরদিবস যথাসময়ে আপিসে হাজির হইলে, কর্ণেল সাহেব কতকটা লজ্জিতভাবে অথচ সাদরে গ্রহণ করিলে, ক্ষীরোদ তাঁহার হস্তে ইস্তফাপত্রখানি সমর্পণ করিল।

অকস্মাৎ আক্রমণে মানুষ যেমন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, কর্ণেলও সেইরূপ এই অভাবনীয় ব্যাপারে ঈষৎ বিচলিত হইয়া পড়িয়া বলিলেন,—"বাবু! আমারই ভ্রমে তোমার এই লাঞ্ছনা ও মতি-পরিবর্ত্তন। যাহা হউক, যখন আশা করা উচিত যে, বিষম ভ্রম কোন মানুষ দুইবার করে না, তখন আমার মতে কেন তুমি তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করিবে? আমি তোমাকে ভরসা দিতেছি যে, শীঘ্রই তোমার পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিব। সুতরাং আমার বিবেচনায় তুমি এ বিষয় আরো একটু চিন্তা করিয়া দেখ।"

ক্ষীরোদ দৃঢ়ভাবে বলিল,—"না সাহেব, আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমার আর কিছু ভাবিবার বা বলিবার নাই।" সাহেব অগত্যা একখানি বিশেষভাবে প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিয়া বলিলেন,—"বাবু, তোমার যদি পুনরায় চাকরী করিবার ইচ্ছা হয়, কিম্বা যদি কোন কারণে সাহায্যের কোন প্রয়োজন হয় ত দ্বিধা না করিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও।"

ইহার কিছুদিন পরেই ছোটলাট মফঃস্বলে আসিলেন। মামুলী প্রথায় যথারীতি নাচগান, তামাসা, আতসবাজী, দরবার সনদ ও খেলাৎ প্রদান, খানাদানা, পান, আতর ও বাঁধা অভিনন্দনপত্রের সাধা জবাব ইত্যাদি শেষ হইলে, একদিন যখন বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীদের লইয়া স্থানীয় অবস্থা রীতিনীতি ও চিহ্নিত ব্যক্তিবর্গের চরিত্র বিষয়ে আলোচনা করিতে-ছিলেন, তখন সুযোগ বুঝিয়া ডাক্তার সাহেব ক্ষীরোদের প্রসঙ্গ উত্থাপন-পূর্ব্বক জানাইলেন যে, বিষমভ্রমে একজন বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারীকে অকারণে লাঞ্ছনাভোগ ও পদত্যাগ-ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে সুতরাং এ বিষয়ে কিছু প্রতিবিধান করা উচিত।

লাটসাহেব সমস্ত শুনিয়া বলিলেন যে এবিষয়ে তিনি বিবেচনা করিয়া

দেখিবেন এবং তাঁহার খাস মুক্তির পকেট-বহিতে ক্ষীরোদের পুরা নাম ও ঠিকানা টুকিয়া লইলেন।

এই ঘটনার মাসখানেক পরেই, লাটসাহেবের দপ্তর হইতে লম্বা সরকারী খামে, সরকারী ফারমে তাহার নামে নিয়োগপত্র আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে লিখিত আছে যে, তাহাকে মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে যশোরে নিম্নশ্রেণীর মুন্সেফ করিয়া বাহাল করা হইল এবং পত্রপ্রাপ্তির পনেরো দিবসের মধ্যেই যাত্রা করিতে হইবে। যাত্রার দিবস হইতেই তাহাকে সরকারী কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং তাহার গমনের খরচ যথানির্দ্দিষ্ট হারে বিল করিয়া, যশোরের খাজাঞ্চিখানা হইতে লওয়া চলিবে।

সেকালে ডেপুটী মুন্সেফ প্রভৃতি পদের জন্য এখনকার মত এত পাশের প্রয়োজন ও কড়াকড়ি ছিল না।

ক্ষীরোদ ইহার পূর্ব্বরহস্য কিছুই অবগত ছিল না; সুতরাং অপ্রত্যাশিত পত্রে ও সম্ভাবনায় সে বিহ্বল ও বিস্মিত হইয়া পড়িল। সন্দেহ হইল যে, বোধ হয় কোন লোক তাহার সঙ্গে চাতুরী করিয়াছে; কিন্তু সরকারী খামে ও ফারমে কি করিয়া এরূপ চাতুরী চলিবে, তাহা কিছুতেই বোধগম্য হইল না। কাছারীতে গিয়া গেজেট খুলিয়া যখন দেখিল যে, তাহাতেও ঐ কথা ঘোষণা করা হইয়াছে, তখন মনে হইল, বুঝি বা কোন প্রকারে নামের ভুল হইয়াছে; কেননা, অপর কোন ক্ষীরোদ গোপাল চাটুয্যে থাকিতেও পারে।

সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান ক্ষীরোদ পত্রখানি লইয়া ডাক্তার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। ডাক্তার সাহেব তাহার সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনিই এইজন্য লাটসাহেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ডাক্তার সাহেবকে হৃদয়ের অকপট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, সে

তিন লম্ফে জজকোর্টের সেরেস্তাদার শ্যামাচরণ বাবুর নিকট উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ শ্যামাচরণ বাবু নাকের উপর দড়িবাঁধা চসমাখানা লাগাইয়া নিয়োগপত্রখানি আগাগোড়া পড়িলেন এবং বালকোচিত অস্থির উৎসাহ ও উত্তেজনার আবেগে ক্ষীরোদের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—"বাহবা কি বাহবা! আর ভয় কি? ভগবান্ তোমার লাঞ্ছনার পুরস্কার দিয়াছেন।

শ্যামাচরণ বাবু ক্ষীরোদকে কনিষ্ঠসহোদরতুল্য ভাল বাসিতেন।

ক্ষীরোদ বলিল। দাদা—আমি ত অকূল পাথারে প'ড়েছি; আইন কানুন কিছু জানি না; মুন্সেফির কাজ চালাব কি ক'রে?

শ্যামাচরণ বাবু পূর্ব্ববৎ সোৎসাহে বলিলেন,—"কুচ পরোয়া নেই ভায়া! কোম্পানীকো কাম আপসে চলা যাগা—কিছু ভয় নেই, সেখানে পেস্কার সেরেস্তেদার আছে; তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে নিও যে, তারা মাথা নাড়্লেই বুঝে নেবে যে, ডিক্রি দেবে কি ডিস্‌মস্ ক'র্‌বে। তার পর রাত্রিতে রায়টা তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গুছিয়ে লিখলেই হবে এখন।

"উকিলগুলো যতই বকুক না কেন, কোন দিকে কাণ না দিয়ে, খুব গম্ভীরভাবে ব'সে থাকবে আর পেস্কার কি ইশারা করে, সেই দিকে আড়ে আড়ে লক্ষ্য রাখ্‌বে।

"তার পর 'কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ', তুমি চালাক ছোকরা আছ দুদিনেই সব শিখে নেবে। আর এখনো ত পনেরো দিন সময় আছে; তুমি রোজ আমার কাছে এসে নথিপত্র দেখ্‌বে ও শ্রীরামপুরের ছাপা পাদ্রীদের বাঙ্গলা আইনের বই মুখস্থ ক'র্‌বে। দেখনা তোমাকে একদিনে কেমন তালিম ক'রে নিই। কিন্তু ভোজ চাই ভায়া, ভোজ চাই—নহিলে কিছুতেই কিছু হবে না।"

ক্ষীরোদ বিদ্যালয়ের বালকের ন্যায় মহোৎসাহে ও গম্ভীর-ভাবে আইনের কেতাব ও নথীপত্র দুরস্ত করিয়া শুভদিন দেখিয়া কর্ম্মস্থানে যাত্রা করিল।

একে সেকালের হাকিম, তার উপর তাহার এই আকস্মিক ভাগ্য-বিপর্য্যয় ও পরিবর্ত্তনে সে শীঘ্রই সর্ব্বজনপরিচিত হইয়া উঠিল। কেবল বনিল না ডেপুটী হরিমাধব বাবুর সঙ্গে।

তার কতকগুলি কারণও ছিল। হরিমাধব বাবুর ধারণা যে, তিনি খাঁটী হাকিম; তার উপর নিজে লেখাপড়া-জানা ও বনেদি-বংশসম্ভূত; সুতরাং এই সব সুপারিসের বলে মূর্খ হাকিম গুলার সঙ্গে মেলা মেশা তিনি বড় একটা পছন্দ করিতেন না।

ক্ষীরোদ বাবুর বাসা পূর্ব্বকথিত বদু মোক্তারের বাসার ঠিক পার্শ্বেই।

তৃতীয় অধ্যায়

মোক্তার গৃহিণী যখন দেখিলেন যে, রাধারাণীকে তাঁদের আশ্রয়ে রাখা চলে না, তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বিধুমুখীর নিকট লইয়া গেলেন। ভরসা যে, বিধুমুখীর যেরূপ সরল ও মহৎ অন্তঃকরণ এবং তাঁর স্বামীর

উপর যেরূপ ক্ষমতা, তাহাতে বোধ হয় তাঁহার দ্বারা কিছু না কিছু সুবিধা হইতে পারে।

মোক্তার-গৃহিণীকে খুব বেশী অনুরোধ করিতে হইল না। বুদ্ধিমতী বিধুমুখী বিরসবদনা মলিনবস্ত্রা শিশুক্রোড়ে রাধাকে চকিতদৃষ্টিতে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিয়া লইলেন যে, এ রমণী প্রকৃতই বিপন্না। তিনি নিজে ভুক্তভোগী; স্বামীর অকল্যাণ-আশঙ্কায় ঘর ছাড়িয়া তাঁহাকে কিরূপ উদ্বেগে লজ্জাহীনার ন্যায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইয়াছিল, তাহা স্মৃতিপথ হইতে কখনই মুছিবার নয়. কাজেই ভুক্তভোগীতে বিপন্নের প্রতি যেরূপ আন্তরিক সহানুভূতি করিবে, এরূপ অপরে কখনই করিবে না; সুতরাং রাধারাণীকে আশ্রয় ও সাহায্যদান তিনি তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলেন।

অধিকন্তু মধ্যাহ্নকালে তাঁহার একটী সঙ্গিনী জুটিল এবং তাহার ছোট ছেলেটিও নিজ শিশু পুত্র ননীগোপালের সঙ্গী হইতে পারিবে। কাছারী হইতে ক্ষীরোদগোপাল অপরাহ্নে বাসায় ফিরিলে, জল-যোগান্তে বিধুমুখী রাধারাণীর কথা তুলিলেন।

ক্ষীরোদ বাবু সমস্ত শুনিয়া কৌতুক করিয়া বলিলেন,—"আর একটী সতীন জুটাইবার সখ্ হ'য়েছে দেখ্‌ছি।"

বি। বালাই আর কি? তোমার যেমন কথার শ্রী! সতীন জুটাতে যাব কেন? সে বেচারা কোথা থেকে বিপদে প'ড়ে এসেছে, আর তোমার ঠাট্টা করবার সুবিধা হ'লো।

ক্ষীরোদ বাবু এ কথায় কাণ না দিয়া, পুনরায় কৌতুক করিয়া বলিলেন যে, নিকে ক'র্‌তে হ'লে আগে তোমাকে তালাক দিতে হবে, সে কথা কিছু ভেবে দেখেছ কি? বিধুমুখীর ধৈর্য্য ধারণ করা দুরূহ হ'য়ে উঠ্‌ল; বলিলেন—"নাও নাও ঠাট্টা রাখো, যাতে ওর

স্বামী রক্ষে পায়, তার জন্যে তোমাকে বিশেষ ক'রে চেষ্টা ক'রতে হবে।"

ক্ষী। আগে কি রকম লোক, কি ব্যাপার, ওদের স্বভাব ও রীতি নীতি জানা যাক্, তার পর যা হয় একটা করা যাবে।

বি। দেখ আমরা মেয়ে মানুষ, তোমাদের মত অত বোকা নই; আমরা এক আঁচড়ে লোকের ভিতর পর্য্যন্ত দেখতে পাই। মেয়ে লোকটি একেবারে সরল ও পাঁড়াগেয়ে; ওর ভিতর ছল কপট কিছু নেই।

ক্ষী। শুধু তাই নয়; যুবতী স্ত্রীলোক ঘর দোর ছেড়ে একলা এতদূর এসেছে, সুতরাং ওর স্বভাব চরিত্র ভাল রকম না জেনে কোন কিছুতে হাত দেওয়াটা ঠিক কি?

বি। (বিদ্রূপ করিয়া) ইস্ ভারি সতী লক্ষ্মী দেখ্ছি। আর আপনার পরিবার যখন ঘর দোর ছেড়ে রাত্তিরে সাহেবের কাছে গিয়াছিল তখন স্বভাব চরিত্র ছিল কোথায়?

বিধুমুখী ভাবিলেন,—এইবার স্বামীর বিদ্রূপের যথেষ্ট উত্তর দেওয়া হইল।

রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয় মনে করিয়া ক্ষীরোদ বাবু বলিলেন,—"তা এখন হুকুম কি; কি ক'রতে হবে এখন?"

বি। তোমাকে বিশেষ কিছুই ক'রতে হবে না; কেবল একটু চেষ্টা তদ্বির ক'রে বেচারীকে খালাস দিয়ে দাও।

ক্ষী। ইহাই বুঝি বিশেষ কিছু নয়? তুমি কি আমাকে উকিল পেলে নাকি?

বি। কেন এটুকুও ক'রতে পা'রবে না? তবে হাকিমী ফলাও কেন?

ক্ষী। বুঝ্‌ছ না, এ হ'চ্ছে সরকারী মামলা, আর আমি হ'চ্ছি সরকারি চাকর, এ মামলায় তদ্বির ক'র্‌বো কি ক'রে?

বিধুমুখী বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"যাও যাও, তোমার মুরোদ বুঝা গেছে. তোমাকে কিছু ক'র্‌তে হবে না—যা ক'র্‌বার, আমিই করব—তুমি এখন মুখে পান দিয়ে বেড়াতে যাও!"

ক্ষীরোদবাবু অবাক্ হইয়া বলিলেন,—"তুমি মেয়ে মানুষ, তুমি এবিষয়ে কি ক'র্‌বে বল?"

বি। তা হোক্; তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি আছে—তুমিই না হয় সরকারী চাকর—আমিত আর সরকারের চাকর নই যে আমার হাত পা বাঁধা থাক্‌বে?

"যা ভাল বোঝ" তাই কর, বলিয়া ক্ষীরোদবাবু ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেলেন।

বিধুমুখী তখন আরদালী রামকান্তকে ডাকাইয়া বলিলেন,—"দেখ্‌ এই মেয়ে লোকটার দেশের লোকেরা ডাকাতির হাঙ্গামায় প'ড়েছে, তুই এই মামলা তদ্বির ক'র্‌বি—আর পেস্কার বাবু কোর্ট বাবু প্রভৃতিকে ব'লে ও একজন ভাল মোক্তার দিয়ে মোকদ্দমা চালাবি; এতে যদি দু একশ টাকা খরচ হয় ত সে আমি দিব; বুঝ্‌লি ত?"

একগাল হাসিয়া রামকান্ত বলিল,—"মা ঠাকরুণ যখন হুকুম দিচ্ছেন, তখন আর ব'ল্‌তে হবে কেন? যখন যেটা দরকার হবে, ঠিক সেই রকম খাড়া ক'র্‌ব। যখন খরচ ক'র্‌বেন ব'লেছেন, তখন মামলা আর যায় কোথায়!"

বিধুমুখী বিশেষ জানিয়াছিলেন যে, তাঁর স্বামী নামক বুদ্ধিজীবী হাকিমের দল হইতে এই শ্রেণীর ধড়িবাজ প্রসন্ন দালালের দ্বারা অনেক বেশী কাজ হইতে পারে।

রামকান্ত চলিয়া যায় দেখিয়া বিধুমুখী পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ্, তোকে বক্‌সিস্ দিব—তা ব'লে তুই যেন গলাকাটার মতন আমারো কাছ থেকে দালালি মারিস্ নি।"

রামকান্ত চক্ষুদ্বয় গোলাকার করিয়া ও জিহ্বার অৰ্দ্ধকাংশ বিকসিত দন্তপংক্তিদ্বয়ের মধ্য হইতে বাহির করিয়া বলিল,—"বাপ রে—বলেন কি মা ঠাকরুণ? আমি কি এমনই নিমকহারাম?—আপনার এক পয়সা যদি ছুঁই ত সে গোরক্ত; তবে কি জানেন মা ঠাকরুণ, তরকারীতে যেমন যত গুড় দেওয়া যায় ততই মিষ্ট হয়, ফৌজদারী মামলাও সেই রকম টাকার খেলা; যত খরচ ক'র্‌বেন, ততই সুরাহা হবে।"

পরিশ্রমী সুশীলা রাধারাণী ইহারই মধ্যে এ সংসারে নিজেকে আপনার করিয়া লইয়াছে। তাই খরচের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"মা ঠাকরুণ, আমি দেশ থেকে আস্‌বার সময় কিছু যোগাড় ক'রে এনেছি; তাতে কুলাবে কি না, জানি না।"

দরিদ্রার সৰ্ব্বস্ব পুঁজির উপর হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নয় ব'লিয়া, তাহার প্রস্তাব প্রকারান্তরে প্রত্যাখান করিয়া বলিলেন,—"থাক্ বাছা, আগে ত ওরা খালাস হ'য়ে আসুক; তার পর খরচের কথা দেখা যাবে।"

রাধারাণী ভাবিল সেই ভাল।

ঘটনাচক্রে মামলা যখন হরিমাধব বাবু ডেপুটীর এজলাসে উঠিল, তখন বিধুমুখীকে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইতে হইল—এখানে তাঁহার স্বামীর দ্বারা সাহায্যের কোন উপায় নাই; তার উপর কড়া হাকিম ও সরকারের যথার্থ খয়ের খাঁ বলিয়া বাজারে হরিমাধব বাবুর যথেষ্ট সুনাম আছে—সুতরাং এ ক্ষেত্রে দায়রায় না গিয়া যে একেবারে গোড়াতেই ফাঁসিয়া যাইবে, সে আশা দুরাশামাত্র। যাহা হউক, মামলা শেষ হইবার সময়ে বিধুমুখী

ক্ষীরোদবাবুকে জিদ্ করিয়া ধরিয়া বসিলেন যে,—"তোমাকে একবার হরিমাধব বাবুকে সুপারিস্ ক'র্‌তে হবে।"

এ এক মহা সমস্যা; ক্ষীরোদবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন,—"বড়ই মুস্কিল দেখ্‌ছি; আমার সঙ্গে তার কিরূপ সদ্ভাব, তা জানই ত; বরঞ্চ আমি কিছু ব'ল্‌তে গেলেই হিতে বিপরীত হ'য়ে উল্টে সাজা বেড়ে যাবে।

"আর যখন একজন সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে বিচার ক'র্‌ছে, তখন সে নিজে যা ভাল বুঝ্‌বে, তাই ক'র্‌বে—এরকম স্থলে কোন রকম সুপারিস ক'র্‌তে যাওয়াটা অত্যন্ত অন্যায়। আমাকে যদি কেহ সুপারিস্ ক'র্‌তে আসে ত আমি তার উপর হাড়ে চ'টে যাই।"

বিধুমুখী কিন্তু কোন কথাই শুনিবেন না—তিনি বলিলেন,—"যা আছে, তা ত হবেই; তা বলিয়া তুমি চেষ্টা করিবে না কেন?"

ক্ষী। মিছে চেষ্টা—সে সাজা দেবেই—তার ভবিষ্যতে আশা ও উন্নতি আছে। এখানকার প্রায় সকল হাকিমই ফার্ষ্ট বুকের ছোট বানান প'ড়ে এসেছে; কিন্তু হরিমাধবের বড় বানান শুদ্ধ মুখস্থ, সুতরাং সে আমার কথা শুন্‌বে কেন?

ক্ষীরোদের যুক্তির কোন ফলই হইল না বিধুমুখীর পীড়াপীড়িতে, একটু রাত্রি অধিক হইলে, হরিমাধব বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন।

হরিমাধব বাবু তাঁহাকে দেখিয়াই বিশেষ মৌখিক সৌজন্য সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"আসুন আসুন—পরম সৌভাগ্য আমার—হঠাৎ ক্ষীরোদবাবু এ গরীবের কুটীরে পদার্পণ কেন বলুন দখি? ওরে কে আছিস্, শীঘ্র তামাক দে।"

ক্ষীরোদবাবুও যথোচিত কাষ্ঠ-সৌজন্যে বলিলেন,—"সে কি? আপনি

মহাশয় ব্যক্তি ; আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া ত সৌভাগ্যের কথা। তার পর ও কাগজ কলম নিয়ে কি করছেন ?

হ। আরে ভাই, দুঃখের কথা কেন বল ? সেই ডাকাতি মোকদ্দমা-টার জন্য রাত জেগে রায় লিখ্ছি। দিনের বেলা ত আর সময় হয় না !

ক্ষী। (বিস্মিত হইয়া) বলেন কি ! এরি মধ্যে রায়। এখনো যে উকিলদের বক্তৃতা বাকী আছে !

হ। হ্যাঁ। আপনি ত সবই জানেন, উকিলের বক্তৃতা শুনে রায় লিখ্তে গেলে ত আর প্রাণে বাঁচা চলে না। উকিলরা যা বল্বে, তাত একরকম জানাই আছে।

ক্ষী। তা বেশ মামলা যখন ডিস্মিস্ই হয়ে যাবে, তখন আর অত মাথাব্যথার প্রয়োজন কি ?

হ। ডিস্মিস্ ! বলেন কি ? আমি ত দায়রায় দিচ্ছি !

ক্ষী। দায়রা !—বলেন কি ? একেবারে সাজান মোকদ্দমা ! কতকগুলা নিরীহ লোককে আর লাঞ্ছনা দিবেন না, দোহাই আপনার।

হ। লাঞ্ছনা !—বলেন কি ? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। আর দেখুন ক্ষীরোদ বাবু, আমি সব জানি ; আমি কিছু আর ঘাসে মুখ দিয়া চরি না মুক্ত আসামীর স্ত্রী আপনার আস্তানাতেই আছে ; এর জন্যে পাঁচ জনে পাঁচ কথাও বল্ছে। আপনারাও গোপনে মামলা তদ্বির কর্ছেন।

আরো উত্তেজিত হইয়া হরিমাধব বাবু বলিতে লাগিলেন,—"দেখুন, কিছুতে কিছু হ'লো না দেখে, আপনি শেষে আমাকেও সুপারিস পর্য্যন্ত কর্তে এসেছেন। এবার ক্ষমা কর্লাম, কিন্তু পুনরায় যদি এরূপ অনুরোধ করেন, তা হ'লে রায়ে পর্য্যন্ত আপনার ব্যবহারের উল্লেখ করিব। উত্তেজনার মুখে ক্ষীরোদ বাবু একটা মুখের মত জবাব দিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু কি ভাবিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—

মাফ ক'র্‌বেন হরিমাধব বাবু! ডেপুটী হ'য়েছেন ব'লে যে একটা লেজ গজাইয়াছে, তা মনে ক'র্‌বেন না। আমিও ভদ্রলোকের ছেলে; ঈশ্বরেচ্ছায় আমরাও পদমর্য্যাদা ও আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান প্রায় আপনারই সমান। আপনার কাছে আমি অপমান হ'তে আসিনি। রায় লিখেছেন ব'লেই কথায় কথায় কথাটা উঠলো; আর বন্ধুভাবেই আমি আপনার কাছে সরল সত্য কথা ব'লেছিলাম।"

আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়াই ক্ষুব্ধ ক্ষীরোদ বাবু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"ইহাকেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। এত ক'রে বুঝালাম—আমি গেলে কোন ফল হবে না, তবু কেমন জিদ্, কিছুতেই শুন্‌লে না। এখন এমন হ'লো যে, আপীলের সুবিধাটুকু পর্য্যন্ত মেরে দেবে। লাভের মধ্যে খামকা অপমানিত হ'তে হ'ল।" সে রাত্রে আর বিধুমুখীর সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিলেন না।

আজ রায় প্রকাশের দিন। রায়ের ফল যে কি হইবে, তা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছে; বাকী কেবল একবার স্বকর্ণে শুনিয়া আসা। কিন্তু হরিমাধব বাবুর এত জিদ্ ও দৃঢ়তা সমস্তই ব্যর্থ হইল; নদীপথাক্রান্ত একচক্ষু হরিণের ন্যায় বিপদ্ অপর দিক্ হইতে অতর্কিতভাবে আসিয়া পড়িল।

টিফিনের পর হরিমাধব বাবু যখন রায় পড়িবার জন্য এজলাসে উঠিতে গেলেন, তখন তাঁর মাথাটা হঠাৎ এমন ঘুরিয়া গেল যে, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ চেষ্টার পরও যখন চোখে কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না, তখন সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন।

ঘরশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত—চাপরাসীরা তাড়াতাড়ি মুখে চোখে জল

দিয়া পাখা করিতে লাগিল—উকীল মোক্তার আমলা ও বাজে লোক ছুটিয়া আসিল, একটা উদ্বেগ আশঙ্কা ও কোলাহল যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া ব্যস্ততার সহিত চারিদিক মথিত করিয়া তুলিল।

হরিমাধববাবু অল্পক্ষণ পরেই সুস্থ হইলেন বটে কিন্তু গোলেমালে এজলাস ভাঙ্গিয়া গেল সেদিন আর রায় দেওয়া হইল না।

ব্যাপারটা কিন্তু তখনি মিটিল না, বরঞ্চ শত রসনায় পল্লবিত ও বৰ্দ্ধিত হইয়া মুখে মুখে ছুটিতে লাগিল—অনেকে অনেকরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিল, কেহ বলিল তিনি সেদিন একজন ব্রাহ্মণকে অপমান করিয়াছিলেন কেহ বলিলেন তা নয় সকালে একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ এরূপও বলিলেন,—ইহা ভগবানের মার; উনি কতকগুলি নিরীহ লোককে ফাঁসি-কাঠে লট্‌কাইতেছিলেন, কিন্তু মাথার উপর একজন অন্তর্য্যামী আছেন ত, তিনি সহ্য করিবেন কেন? শেষোক্ত মতটাই অনেকের নিকট প্রামাণ্য ও সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। মুখর লোকেরা স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাবে দূর হইতে হরিমাধব বাবুকে শুনাইতেও ছাড়িল না।

হরিমাধব বাবু নিজেও বিস্মিত। হঠাৎ এরূপ কেন হইল? তাঁর ত কখন ফিট্ হিষ্টিরিয়া ও মাথার অসুখ ছিল না, তবে এ কি? মানব-জীবনে চেষ্টা সত্ত্বেও বহু সমস্যার সমাধান হয় না; সুতরাং এ সমস্যারও কোনই মীমাংসা পাইলেন না।

অনেকেই গভীর রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির করিয়াছিল যে, এবার নিশ্চয়ই রায়ের পরিবর্ত্তন হইবে।

বরষার নদী আকস্মিক পরিপূর্ণতায় যেমন বন্যার সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেইরূপ জনসাধারণের ঔৎসুক্যও অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়,

কেহ কেহ বাটীর চাকর-বাকরের নিকট পর্য্যন্ত সন্ধান লইয়া জানিল যে, রায়ের কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই।

হরিমাধব বাবুও যে ঐ সকল মন্তব্য কিছু কিছু না শুনিয়া ছিলেন, এমন নয়; তবে তিনি অচল অটল সমুদ্রকল্প গম্ভীর; বরঞ্চ খেলো হইবার ভয়ে জিদ্ আরো বাড়িয়া উঠিয়াছে।

পরদিন এজলাসে বসিয়া দু একটা সই করিবার পরই পুনরায় মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলেন;—শরীরের নানা স্থানে আঘাত লাগিল। বহু কষ্টে ও যত্নের পর যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন সমস্ত দেহ মন নিরতিশয় দুর্ব্বল ও ক্লান্তি-অবসাদ-যুক্ত।

পূর্ব্ব দিনের ধারণা আরো ব্যাপক ও বদ্ধমূল হইল। সকলেরই বিশ্বাস যে,—ইহা নিশ্চয়ই দৈবের মার, বেচারাদের কপালে নিশ্চয়ই মুক্তি।

চতুর্দ্দিকে নীরব তিরস্কার ও অস্পষ্ট বিদ্রূপের মধ্য দিয়া যখন পাল্কী আরোহণে বাটী ফিরিতেছিলেন, তখন নিজেরই মনে হইতেছিল যে, বোধ হয়, কোথাও একটা ত্রুটি হ'য়ে গেছে; এটা তাঁরই দোষ—নিজ-কৃত অবিমৃষ্যকারিতার দল।

আজ তাঁর ঘরে বাহিরে লাঞ্ছনা; বাটীতে আসিয়াও নিস্তার নাই। গৃহিণীও পরিজনবর্গের কাতর অনুযোগ এবং বাহিরে বৈঠকখানায় স্বাস্থ্যও কুশলবার্ত্তা-জিজ্ঞাসু বন্ধুবর্গের অযাচিত উপদেশ। ধৈর্য্যের বাঁধ ক্ষণভঙ্গুর হইয়া উঠিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রায়ের আমূল পরিবর্ত্তন করিলেন এবং সে বার্ত্তা বিশ্বস্ত বন্ধুবান্ধবগণকেও জানাইলেন। প্রকৃত উদ্দেশ্য যে, হয়ত ইহাতেই তাঁর জয়-ঘোষণা হইবে; কেননা, পরদিবসও মূর্চ্ছা আসিলে, বুক ফুলাইয়া ও চোখে আঙুল দিয়া মূর্খদের বলিয়া দিবেন যে, দেখ্, তোরা যে আমায় বৃথা কলঙ্ক দিতেছিলি, তা নয়;

এটা দৈবের মার নয়। কল্পনায় ভবিষ্যতে মনে মনে তৃপ্তিলাভ করিলেন।

পরদিন নূতন রায় পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কৈ, তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মূর্চ্ছা ত আসল না। শত চেষ্টা উদ্বেগ ও কামনা সত্ত্বেও মস্তিষ্ক স্থির রহিল। পড়িতে পড়িতে আবার কামনা করিলেন যে, হয় হোক্ মাথার স্থায়ী রোগ, কিন্তু যেন মুখ রক্ষা ও জিদ্ বজায় হয়! মামলা ডিস্মিস্ হইল শুনিয়া, যখন বাদিপক্ষের বড় মোক্তার আন্তরিক গুপ্ত প্রসন্নতা কিছুতেই লুকাইতে পারিতেছিলেন না, এবং প্রতিবাদিপক্ষের বৃদ্ধ উমেশ মোক্তার সজলনয়নে হরিমাধব বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে উঠিলেন, তখন বন্দীর দল আনন্দাতিশয্যে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; কেবল জমিদারপক্ষের ম্যানেজার, আমমোক্তার ও আমলা প্রভৃতি ঋষ্যমূকপর্ব্বতশিখরবাসের ন্যায় বিরস বদনেই বসিয়া রহিলেন। জমিদার হরকান্ত বাবুও অত্যধিক উৎকণ্ঠা-প্রযুক্ত সহরে আসিয়াছিলেন; কিন্তু এ পরাজয়-সংবাদ যখন তাঁহার কর্ণে পৌছিল, তখন তাঁর সে বিকৃত মুখভাব বর্ণিত হওয়া অপেক্ষা অনুমেয় ও উপভোগযোগ্য।

বৃদ্ধ উমেশ বাবুকে ঘেরিয়া আসামীর দল যখন মহাকলরব করিতে করিতে ও পথিপার্শ্বস্থ নিষ্কর্ম্মা লোকের অযাচিত সহানুভূতি ও অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তাঁহার বাসায় পৌছিল, তখন সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, সন্ধ্যায় সময় পাঁটা বলির সহিত কালীবাড়ীতে পূজা দিয়া রাত্রিতে আমোদ আহ্লাদ করিয়া, পরদিন গ্রামে যাত্রা করা হইবে। চতুর রামকান্ত আর্দ্দালী রাধারাণীর আগমন, ক্ষীরোদবাবুর সহানুভূতি ও মোক্তার নিয়োগ প্রভৃতি আবশ্যকীয় সংবাদগুলি গোপীনাথকে বহুপূর্ব্বেই জানাইয়া রাখিল।

ঠিক ঐ দিনই হারু জেলে সহর হইতে রামচন্দ্র পুরে পৌছিল।

হারু সহরে তার তালুই মশায়ের নিকট গিয়াছিল। হারু একজন খলিফা ও ধড়িবাজ লোক বলিয়া প্রখ্যাত থাকায়, তার উপর গ্রাম হইতে ভার পড়িয়াছিল যে, সে যেন আসিবার সময় সর্দ্দারদের সমস্ত অবস্থা ও মোকদ্দমার খবর সঠিক জানিয়া আইসে।

হারু ফিরিবামাত্রই তাহার উপর গ্রামশুদ্ধ আবালবৃদ্ধবনিতা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন—অজস্র প্রশ্নজালে ঘেরিয়া ফেলিল।

হারু যাহা বলিল, তার মর্ম্মার্থ এই যে, সে কাছারীতে সর্দ্দারদের ঠিক পাশে যাইয়া ইশারায় অনেক কথা শুনিয়াছে ও বলিয়াছে। এমন কি, প্রায় হাকিমের নিকট পর্য্যন্তও একদিন যাইতে পারিয়াছিল; কিন্তু যে দিন তাহাদের দ্বীপান্তরে লইয়া যাওয়া হয়, সেইদিন এত অসম্ভব ভিড় যে, দেখা করা অত্যন্ত দুরূহ।

সে প্রথম দিনের গোলযোগে ও অসংখ্য-রসনা-রটিত জনরবের দ্বারা কাছারীর নিকট হইতেই এই মূল্যবান্ তথ্যটী সংগ্রহ করিয়াছিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে কি হারু যাবার দিন তাদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে পার্‌লে না?

হারু বুক ফুলাইয়া সগর্ব্বে উত্তর করিল যে, আমাকে কি তেমনি মেছুড়ে পেয়েছেন দাদাঠাকুর? এত লোকের ভিড়, যেন ঠিক দীঘিতে গাঁদি লেগে গেছে; রুই কাতলা থেকে চুনা পুঁটি পর্য্যন্ত সকল দরের লোকই ঝাঁকে ঝাঁকে জ'মে গেছে; ভেতরে যায় কার সাধ্যি?

সকলে। (সোৎসুকে) তার পর, তার পর;

হারু। তার পর একটা বুদ্ধি ঠাউরে আমি বরাবর কৈ কানিয়ে কৈ কানিয়ে, তার ভিতর দিয়ে চ'ল্‌তে লাগ্‌লাম; শেষে সুবিধা বুঝে এক জায়গায় মৌরল ভাসান দিয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়্‌লাম।

সকলে। (অধিকতর ঔৎসুক্যে) তার পর, তার পর?

হারু। তার পর যেই মৌরল ভাসান দিয়েছি, অমনি কোথা থেকে এক সিপুই একগাছা সপ্‌টির বাড়ি মাথার উপর চেতোল পটকান প'টকে দিলে। যেই চেতোল পটকান দেওয়া, অমনি আর ক্ষণবিলম্ব না ক'রে সেই খান থেকেই একেবারে পাঁকাল সটকান দিয়ে লম্বা।

হারুর বক্তৃতা ও সংবাদ হইতে কুতূহলী ও বুদ্ধিমান মাতব্বরেরা বুঝিয়া লইল যে, প্রত্যেক আসামীরই ছয় মাস ফাঁসী ও চা'র্ মাস জরিমানা হইয়া গিয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

সপ্তম অধ্যায়।

স্বপ্ন-বিভাস।

(১) সদ্-দর্শন। প্রকৃত পক্ষে ইহা ঠিক স্বপ্ন নয়। জীবাত্মা বা কারণ-শরীরাভিমানী আত্মা বা প্রাজ্ঞ * নিদ্রাকালে সৎ, অর্থাৎ, জগৎকারণ

---

* অস্য ব্যষ্টিরহঙ্কারকারণত্বেন কারণম্।
বপুস্তত্রাভিমান্যাত্মা প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
(সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ—৩২২)

[পণ্ডিতগণ অহঙ্কারের কারণ বলিয়া জীবের ব্যষ্টি অজ্ঞানকে কারণ-শরীর" এবং সেই কারণ-শরীরে অভিমানী আত্মাকে "প্রাজ্ঞ" বলিয়া অভিহিত করেন।]

ব্রহ্মে লীন থাকেন। * এই স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থায়, এই সমগ্‌ জ্ঞান-রবি-বিভাসিত অবস্থায়, জাগতিক রূপ সকল স্বতন্ত্ররূপে অবস্থান করিতে পারে না; সর্ব্বরূপ ব্রহ্মেরই রূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; সকলেই ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃত পক্ষে, তখন, "সকল" ভাবই থাকে না, পার্থক্য-বুদ্ধিরূপ ভ্রমের বিলোপ হয়। ইহাই প্রকৃত সদ্‌দর্শন। তুরীয় অবস্থায় এই অনুভূতির জন্য, এই একত্ব বা অবিশিষ্টতা-সুধা-পানের জন্যই, সেই অবিশিষ্টতারূপ মহাসম্মিলনের অতি ক্ষীণ অভিনয়, জাগ্রত, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি চৈতন্যের মানবের এই প্রেম বা একীকরণেচ্ছা। কিন্তু, আমরা এখানে সদ্‌-দর্শন অর্থে কেবল ইহাকেই বুঝিব না।

সুষুপ্তি অবস্থায় চৈতন্যের যে ক্রিয়া হয়, বা কারণ-শরীরাভিমানী জীবাত্মার যে "দর্শন," প্রাজ্ঞ-চৈতন্যের বা অধিদৈবের যে প্রত্যয় বা অনুভূতি, তাহাও আমরা এই "সদ্‌-দর্শন" বিভাগের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিব। সুষুপ্তিকালে যে শরীরে চৈতন্যের ক্রিয়া নিবদ্ধ থাকে, আমরা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার নাম কারণ-শরীর; বা আর একভাবে বলিলে, যে মায়াবরণ এই সময়ে চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেই ব্যষ্টি অজ্ঞানরূপ উপাধিকে আনন্দময় কোশ এই নামে অভিহিত করা হয়। † এই আনন্দময় কোশ নাম নিরর্থক নহে, উহা সার্থক। যে

---

* "যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি-নাম সৎ সৌম্য, সম্পন্নো ভবতি, স্বপীতো ভবতি, তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বংহ্যপীতো ভবতি।"

[হে সৌম্য! সুপ্তিকালে এই পুরুষের স্বপিতি নাম হয়। তখন তিনি সৎসম্পন্ন হয়েন, "স্ব"তে (আত্মাতে) অপীত (লীন) হয়েন, অতএব ইহাকে "স্বপিতি" নামে আখ্যাত করা যায়; কারণ-লীন হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েন।]

† স্বরূপাচ্ছাদকত্বেনাপ্যানন্দপ্রচুরত্বতঃ।
কারণং বপুরানন্দময়ঃ কোশ ইতীর্য্যতে॥

কারণ-শরীরও জীবস্বরূপকে আচ্ছাদন করে, ইহাতে প্রচুর আনন্দ উপভোগ হয় বলিয়া, ইহাকে আনন্দময় কোশও বলা হয়।

যে ভাগ্যবান্ কখনও এই আনন্দ-অনুভূতি জাগ্রৎ চৈতন্যে আনিতে পারিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন যে, কি মধুর, কি গভীর, কি হৃদয়-মনোহারী ও পবিত্র স্বর্গীয় এই আনন্দ-প্রবাহ। যিনি তাহা একবার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার জীবন এই সর্ব্ব-পাপ-হন্ত্রী ভোগবতী-সংস্পর্শে বিগত-সংসার-কল্মষ-পঙ্ক হইয়াছে। কিন্তু, সাধারণ মানবে এই মহান্ অনুভব হয় না, তাঁহাদিগের সুষুপ্তির আনন্দ অনুভূতির কেবল ক্ষীণ স্মৃতিটুকু থাকে। তাঁহারা বলেন,—"এষোঽহং সুখমস্বাপ্সং ন তু কিঞ্চিদবেদিষম্—আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সুখের পরিচয় বোধগম্য হইতেছে না।"

সাধক ভক্তদিগের জাগ্রৎ চৈতন্যেও এই অপার্থিব আনন্দ-প্রবাহ আসিয়া প্রতিঘাত করে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার বিষয় অবগত আছেন। একটি দৃশ্য, একটি সঙ্গীত, একভাবের একটি কথা তাঁহাকে এই আনন্দে নিমজ্জিত করিতে যথেষ্ট হইত। ভক্ত মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনেও তাহাই হইত। আমি তাঁহার জীবনের ঘটনা হইতে দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি ; * কারণ, জনসাধারণ তাঁহার বিষয় বিশেষভাবে জ্ঞাত নয়। "তিনি একদিন দ্বার-ভাঙ্গার পথে বেড়াইতেছিলেন। দেখিলেন পথিপার্শ্বে পলাশবৃক্ষে পলাশফুল ফুটিয়া রহিয়াছে ; ভাবে বিভোর হইলেন এবং মানুষকে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া গেলে যেরূপ হয়, সেইভাবে গিয়া কিছুক্ষণ অজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলেন,—'পলাশবৃক্ষের ভিতর হইতে মা উঁকি দিতেছিলেন।'"

"একবার একটি মুটে মোট নিয়া আসিয়াছে ; তিনি তাহার মধ্যে যেন

---

* শ্রীবঙ্কবিহারী কর-রচিত "মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী"।

কাহাকে দেখিয়া অধীর হইলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পায়ে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। মুটেও বাবা বাবা বলিয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিল। সে দৃশ্য যাহারা দেখিল, তাহারাও চক্ষুর জল রাখিতে পারিল না।"

"একদিন গেণ্ডারিয়া আশ্রমে প্রাতে পায়খানার পথে তাঁহাকে অতি সঙ্কোচে পদক্ষেপ করিতে দেখা গেল। এইরূপ করিতে করিতে মুহূর্ত্ত-মধ্যে অজ্ঞান হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। তখন তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলে, পুনরায় জ্ঞান হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলেন,— 'দূর্ব্বাঘাসে শিশিরবিন্দুতে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, আমি আত্ম-সংবরণ করিতে পারি নাই'।"

এইরূপ তাঁহারও জীবনে অনেক ঘটনা আছে। কখনও আহার করিতে করিতে অজ্ঞান হইতেন, কখনও চা পান করিতে করিতে বাটী হাতে করিয়া বেহুঁস্ হইয়া থাকিতেন; কখনও ফুলগাছে ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। সুষুপ্তি-চৈতন্যের আনন্দপ্রবাহ তাঁহার জাগ্রৎ-চৈতন্যে আসিত বলিয়াই তাঁহার এইরূপ হইত। তাই তিনি ভগবান্ সম্বন্ধে বলিতে পারিতেন,—তিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা, ইহা কল্পনা নয়। তাঁকে দেখা যায়, ধরা যায়, আস্বাদন করা যায়, শোনা যায়,—এ কথার কথা নয়, আমি স্বয়ং পরীক্ষা ক'রে ব'ল্‌ছি। অধ্যাপক জেম্‌স্ (professor James) সাহেবের Varieties of Religious Experiences নামক পুস্তকে ইহার অনেক উদাহরণ আছে। একটি দৃশ্য দেখিয়া একজন নাস্তিকেরও কিরূপ ঈশ্বরবুদ্ধি ফুটিয়া উঠে! ইহা এই সুষুপ্তির আনন্দ-তরঙ্গের জাগ্রৎ-চৈতন্যের প্রতিঘাত মাত্র। ইংরাজ বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে "conversion" বলেন।

সুষুপ্তি-অবস্থায় অনেক ‍সার সত্যের অনুভূতি হয়, অনেক জটিল

রহস্যের মীমাংসা হয়। জ্ঞানী ভক্ত কর্ম্মীর, কবির, দার্শনিকের, বৈজ্ঞানিকের যে ভাব বা যে প্রতিভালোক, তাহা এই অনুভূতিরই প্রতিফলন মাত্র। কখনও কখনও আবার মহাপুরুষগণ, ভ্রান্ত, বিপন্ন, অন্ধ আমাদিগের কল্যাণের জন্য, সেই বিপদের ভীষণ ছায়া আমাদিগের মানসে অঙ্কিত করিয়া দিয়া, আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। এইরূপ অনুভূতি লেখকের জীবনে দুই চারি বার হইয়াছিল এবং মহাপুরুষদিগের ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া, মহা মহা বিপদে লেখক বহুবার উত্তীর্ণ হইয়াছে। কখনও বা কর্ম্মী ও ভগবদ্ভক্ত ত্যাগী মানবগণকে উৎসাহ দান করিতে, নিরাশ মনে আশার সঞ্চার করিতে, বিষণ্ণ তাঁহাদিগের চিত্তের অবসাদ দূর করিতে,তাঁহারা অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের বা মানব-ইতিহাসের এক প্রান্তের যবনিকা উত্তোলন করেন ; বা শান্তিময় আনন্দ-পূরিত সাধকের আদর্শানুযায়ী চিত্তাকর্ষক মনোহর দৃশ্য দেখাইয়া, মহাপুরুষগণ ভক্তের আনন্দ বর্দ্ধন করেন ; কখনও বা আবার নানা রূপক দ্বারা অতি জটিল দুর্ব্বোধ রহস্যের বা সাধনার সাধক-চিত্তোপযোগী পন্থা দেখাইয়া দেন। সাধক-প্রবর জিনরাজাদাস সুললিত তাঁহার Flowers and Gardens * নামক পুস্তকে অতি মনোহর আধ্যাত্মিকতা-পরিপূর্ণ এইরূপ কয়েকটি স্বপ্ন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার গুরুদেব জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ কুতহুমী কিরূপ জটিল নানা তত্ত্ব স্বপ্নে মনোহর চিত্রাবলির সাহায্যে তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার কয়েকটি লেখক তাঁহার এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। :

অনেকের জীবনেও অল্পাধিক এইরূপ সত্যানুভূতি হয় ; অনেক অতি দুরূহ সমস্যা, যাহার কিছুতেই মীমাংসা হইতেছে না, সহসা নিদ্রাবসানে

* Flowers and Gardens by C. Jinarajadasa—(board)—
price as. 12.

দেখা গেল যে, তাহার কি সুন্দর ব্যাখ্যা হইয়াছে! কোথা হইতে কোন জ্ঞানজ্যোতিঃস্পর্শে যেন সেই ঘোর তিমির নষ্ট হইল! কাঁহার যেন কৃপা-পবন-সংঘাতে সেই অজ্ঞানতা-মেঘ দূর হইল। আমি নিজের জীবনে ইহা জানি, তাই বলিতেছি। সেই ব্যাখ্যা কোথাও পূর্ব্বে শ্রবণ করি নাই, এমন দুই একটি শ্লোক বা শাস্ত্রোক্তি জাগরিত হইবামাত্র মানসে উদিত হইল, যাহা পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই। আমি পরে পুস্তক অনুসন্ধান করিয়া, বা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি যে, সেইগুলি প্রায় ঠিক। এইরূপ কি করিয়া হয়? হয়ত কোনও মহাপুরুষ কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে শিখাইয়া দিলেন! হয়ত আমার যিনি হৃদয়রথী, তিনিই আমার সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিলেন!

প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রে সদ্-দর্শনের উদাহরণের অভাব নাই। ইতিহাস আত্মত্যাগী ধর্ম্মবীর বা কর্ম্মবীর মানবগণের জীবনকাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া, অনেক স্থলে সদ্দর্শনের কথাও উল্লেখ করিয়াছে। এই সমস্ত উদাহরণ এখানে আহরণ করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সমস্ত অবগত আছেন। আমরা আর অধিক ইহার বিষয় আলোচনা করিব না। যাঁহারা এতৎসম্বন্ধে সম্যক্ জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তবে পাঠকদিগের নিকট আমার নিবেদন যে, তাঁহারা যেন এই সমস্তকে স্বপ্ন বলিয়া মনে না করেন। যে অবস্থায় এইরূপ দর্শন হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, স্বপ্নাবস্থার অতীত।

ক্রমশঃ।

শ্রী কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অলৌকিক-ঘটনা।

অলৌকিক রহস্যের পাঠক-পাঠিকারা কতই অলৌকিক ঘটনাবলী পাঠ করেন, কতই হৃদয়-কম্পনকারী অচিন্তনীয় ঘটনাবলী পাঠান্তে স্তম্ভিত হইয়াছেন; আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের সামান্য ঘটনা বর্ণিত করিয়া পাঠক-পাঠিকাকে যে অধিক কুতূহলী করিতে পারিব, এরূপ আশা করিয়া রহস্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিলাম না। তবে এইমাত্র আশা করি তটিনী যেমন নিশব্দে বনস্থলী অতিক্রম করিয়া বিশাল সমুদ্রের বক্ষে মিশাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করে, আমিও সেইরূপ আমার এই সামান্য অলৌকিক ঘটনাটী "অলৌকিক-রহস্য" সমুদ্রে মিশাইয়া কৃতার্থ হইব।

আমারও বড় সাধ হইল আমি এমন একটী ঘটনা লিখিব, যাহার দ্বারা পাঠক ও পাঠিকাদিগের কৌতূহল উদ্দীপ্ত, হয় অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস হয়; কিন্তু কত বিপদেই পড়িলাম, কল্পনা ব্যতীত লোমহর্ষণ ঘটনা লিখিলেও চলিবে না। তাই সুদূর বাল্যকালের লুপ্ত স্মৃতির অঙ্ক হইতে এই ক্ষুদ্র ঘটনার জাগরণের জন্য প্রয়াস পাইলাম।

অলৌকিক ঘটনা সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিতে হইলে, 'বিশ্বাস করিব' এই বাক্যটী মনে রাখা উচিত। যদি বিশ্বাস না করি, তবে অবিশ্বাস বা কেন করিব? আমি যা দেখিব শুনিব অর্থাৎ আমার স্থূল ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে যাহা আসিবে, তাহারই অস্তিত্ব বিশ্বাস করিব এবং তাহা ছাড়া আর কিছু নাই এরূপ বিশ্বাস থাকিলে, অলৌকিক ঘটনাবলী গাঁজাখুরি গল্পছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। এইরূপ অবিশ্বাসিগণের নিকট আমার এই নিবেদন,—তাঁহারা (Materialis) জড়বাদী হইলেও,ও তাঁহাদের একথা মনে রাখা উচিত তাঁহারা মানব বই আর কিছুই নহেন (যদিও এই জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে দেবতাস্বরূপ হয়েন)। আমাদের এ কথাগুলি মনে রাখা উচিত যে, এই বিশ্বের তুলনায় আমরা

কত ক্ষুদ্র, আমরা ইহার কতটুকু জ্ঞান অধিকার করিয়া আছি। আমাদের বুদ্ধিরও প্রসর কত, আমাদের আয়ুটুকু কত দিনের জন্য। এই সকল কথার সঙ্গে অনন্ত জটিলতাপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনা করিলে, ইহা সহজেই আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের দ্বারা সমস্ত জটিল রহস্যের এক কণাও উদ্‌ঘাটন করিতে পারি না। স্থূল জগতের জ্ঞান আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা—পুস্তকের দ্বারা নিজেদের অল্পবিস্তর চেষ্টায় উপলব্ধি করিতে পারি কিন্তু স্থূল জগৎ লইয়াই ত আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নয়? তবে এই বিশ্বের আর যা কিছু আছে, তাহা সহজে ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির মধ্যে নয়; আর যা কিছু আছে, সব জটিল। আমাদের দেশে বহু আর্য্য ঋষিগণ এই সমস্ত জটিল তত্ত্ব নিরূপণের জন্য জীবনপাত করিয়াছেন এবং বহু সত্য নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—আমরা তাঁহাদের সত্যে বিশ্বাস সংস্থাপন করিব কি না! আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির কাছে সেগুলি অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু তা বলিয়া প্রকৃতপক্ষে সে সত্যগুলি অসম্ভব, একথা কি করিয়া বলিব? এখন আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করা কিংবা তাঁহারা যা বলিয়া গিয়াছেন সে বিষয় অনুসন্ধান করিয়া দেখা। যদি কেহ কাহাকে প্রশ্ন করে,—"তুমি কি ভূত বিশ্বাস কর?" আর সে যদি বলে,--This belief is mere superstitious অর্থাৎ এই বিশ্বাস কুসংস্কারাত্মক, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে কি বলিব? আমার ইচ্ছা—তাঁহাকে ভাষার কোন নূতন শব্দ বাহির করিয়া বুঝাইব।

এখন আসল গল্পক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যাউক। সে আজ ১৩ বৎসরের কথা। আমি একবার আমার মেজ দাদার সহিত তাঁহার শ্বশুরালয় লাহেরিয়াসরাই (দ্বারভাঙ্গা) গিয়াছিলাম। নিশা যাপনের জন্য একটি

কক্ষ নির্ব্বাচিত হইলে, আমরা আহারের পর শয়ন করি। আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম, জানি না।

হঠাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। মেজ দাদার দেশালাই ঘর্ষণের শব্দে বোধ হয় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি মেজদাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—মেজদা আলো জ্বালিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন,—'ইন্দুরে কাগজ টানিয়া গর্ত্তে লইয়া যাইতেছে। তাই এমন খড় খড় শব্দ হইতেছে যে, আমার ঘুম হইতেছে না। ইতিমধ্যে মেজদাদা বাতি জ্বালিয়া ইন্দুরের গর্ত্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আমিও দেখিতে লাগিলাম কিন্তু কোন কাগজের চিহ্ন মাত্র পাওয়া গেল না। মেজদাদা কিছু ভীত হইলেন এবং বলিলেন,—কিসের শব্দ হইতেছিল? পুনরায় আমরা আলো নিবাইয়া শয়ন করিলাম। আবার পূর্ব্ববৎ শব্দ হইতে লাগিল। এবারও আলো জ্বালা হইল, কিন্তু কিছু ধরিতে পারা গেল না। আমাদের আর নিদ্রা হইল না, চুপ করিয়া বিছানায় শয়ন করিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম, সিমেণ্টের মেজেতে মারবেল্ খেলিলে যেরূপ শব্দ, ঠিক সেইরূপ শব্দ হইতেছে। ঠিক মনে হইল, যেন কেহ মেজেতে মারবেল্ খেলা করিতেছে। আমরা আরো ভীত হইলাম। বাতি অল্পই ছিল; কাজেই আর অধিকক্ষণ জ্বলিল না। যেমন নিবিয়া গেল, অমনি আবার পূর্ব্ববৎ শব্দ হইতে লাগিল। এইভাবে ত আমরা নিশা পোহাইলাম।

তার পরদিবস সমস্ত ঘটনা আমরা বলিলাম। শুনিয়া সকলে প্রথমে হাসিলেন। তার পর ঘটনায় বৌদিদির মাতাঠাকুরাণী ও ঠাকুরমা এবং ভগ্নীরা অনেক কথা বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—এই বাটীর দুর্নাম ছিল; কিন্তু আমাদের ভূতের বিশ্বাস না থাকায় এ বাটী আমরা ভাড়া লইয়াছিলাম। এক্ষণে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে এ ভৌতিক

কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারি না। তাঁহারা নিজে নিজে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাও আমাকে বলিলেন।

শ্রীচুনিলাল মিত্র।

কর্ম্মানুসারে জীবের গতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৮)

মানুষের মন স্বভাবতঃ চঞ্চল। একাগ্রতা সহজে আসে না। তাহার উপর আবার এক বিপদ,—পৃথিবীতে মন আকর্ষণ করিবার জিনিষ বিস্তর আছে! ইন্দ্রিয়গুলি মনটাকে লইয়া কতই না খেলা করিতেছে। বেচারী মনটার অপরাধ কি? তাহাকে যে ইন্দ্রিয়গুলি নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইতেছে! রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই কয়টী হইতেই নানারূপ সুখ পাইতে মন সদাই ব্যস্ত। কোথায় যাইলে সুন্দর মানুষের রূপ দেখিতে পাইত, কি খাইলে মনটা তৃপ্তিলাভ করিবে, কি গন্ধে প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে, কি মধুর ধ্বনি শুনিলে অপার আনন্দ হইবে, এবং কি সুখস্পর্শ জিনিষ পাইলে অঙ্গ শীতল হইবে,—মনটা কেবল এই সব চিন্তায় মগ্ন থাকে। ধ্যানমগ্ন যোগী যেমন ঈশ্বরকে এক মনে চিন্তা করে, মনটাও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গুলির সুখ একমনে চিন্তা করে। একটা না একটা ইন্দ্রিয়ের হুকুম মনটা না শুনিয়া অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলি বড় মজার এক চাকর পাইয়াছে।

কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল মানুষকে লইয়া যতই কেন দৌড়াদৌড়ি করাক্ না, ভগবানের রাজ্যে এমন এক রকমের

লোক আছে, যাহাদের কাছে ইন্দ্রিয়গুলি এমন কি চঞ্চল মনটাও পর্য্যন্ত জব্দ থাকে; তাহারা কে? তাঁহারা যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত ও ঈশ্বর প্রেমিক। তাঁহারা জানিয়াছেন যে সাধারণ সংসারী মানুষ প্রকাণ্ড ভ্রমে পড়িয়া দিবারাত্রি বিভীষিকা দেখিয়েছে; এক মজাব স্বপ্ন দেখিয়া কখন বা হাসিতেছে কখন বা কাঁদিতেছে কখন বা নিজেকে মহাপণ্ডিত মনে করিয়া অপরকে মূর্খ বলিয়া বিদ্রূপ করিতেছে এবং কখন বা অভিমানে মনের কান্না কাদিতেছে; মৃত্যুতেই কেবল এই মজার জাগ্রত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়।

একটা কথা আছে "ভ্রমেতেই ভ্রমণ করায়।" একটা খুব সোজা অথচ সত্য কথা। মনটা কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল বুঝিতে না পারিয়া পৃথিবীটাতে কত অপার সুখ খুঁজিয়া সর্ব্বদাই বেড়ায়। শান্তি পাইবার জন্য কত দেশের কত জিনিষ চায়! সর্ব্বদাই ভ্রমান্ধ থাকে বলিয়া আপনার মধ্যে শান্তি খুঁজিয়া পায় না, কেবলই ভাবে আপনার বাহিরে জগতের সব জায়গায় শান্তি পাওয়া যায়। এই ভ্রম যাহার যত বেশী, সে তত আপনার বাহিরে সুখ খোঁজে; আর এক জনকে না পাইলে তাহার আনন্দ হয় না, স্ফুর্ত্তি হয় না, কাজেই তাহাকে সুখ পাইবার জন্য পরবশ হইতে হইল। কিন্তু পর নির্ভরতাই দুঃখ। শাস্ত্রে আছে,—

আত্মবশং সুখং পরবশং হি দুঃখং।

সুতরাং কস্তুরীমৃগ যেরূপ আপনার মধ্যে মৃগনাভি আছে জানিতে না পারিয়া গন্ধে উন্মত্ত হইয়া মৃগনাভি ভোগ সুখ আশায় চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়ায়, ভ্রান্ত মানবও সেইরূপ আপনারই মধ্যে ঈশ্বরের অংশ-রূপী বিবেক আছে জানিতে না পারিয়া আত্মার স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া সুখের ও শান্তির আশায় অপরের কাছে যায় এবং অপর জিনিষ চায়।

আমাদের সঙ্গে সংসার বিরাগী ঈশ্বর প্রেমিক সাধকের পার্থক্য এই যে তাঁহারা আত্মবশ, আর আমরা পরবশ, তাহারা আত্মারাম আত্মানন্দে ভরপুর, আর আমরা পরপ্রত্যাশী ; কখন আর এক জনের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমোদ পাইব এই চিন্তায় আচ্ছন্ন।

তার পর আর একটা বড় প্রভেদ আছে। ঈশ্বর-প্রেমিক যোগীরা পৃথিবীটার সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করে কারণ পৃথিবীর সুখ পৃথিবীর সকল জিনিসের মত নশ্বর, "এই আছে, এই নাই।" আমরা এই নশ্বর সুখটাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করিয়া চলি। আর তাঁহারা ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বর মিলন পরম সুখের ও শান্তির কারণ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ঈশ্বরলাভই জীবনের মহালক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাদের নিকট ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু, ঈশ্বরই প্রার্থনীয় আর সব অসার, তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া ফেলেন, ঈশ্বর হইতে মন তুলিয়া লইয়া অপর কোন জিনিষে দিতে পারেন না। আমরা ঈশ্বরকে ভুলিয়া পৃথিবীর জিনিষ লইয়া থাকিতেই চাহি এবং আমাদের এই সুখে হতাশ হইলে মহাদুঃখ উপস্থিত হয় এবং তখন ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত আমাদের সুখের হন্তারক মনে করিয়া আন্তরিক বিরক্তি প্রকাশ করি। আমারা ঈশ্বর লাভের চেয়ে পৃথিবীর সুখলাভে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করি। তাঁহারা ঈশ্বর চান, পৃথিবীর কিছু চান না, আর আমরা পৃথিবীর সুখই চাই, ঈশ্বরলাভ অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বৃথা শক্তিক্ষয় করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয় বলিয়া মনে করি। তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমে আপনাকে ভুলিয়া যান আর আমরা মানুষের প্রেমে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই। ঈশ্বর প্রেমের ফল মুক্তি এবং অপূর্ব্ব শান্তি ; আর মানুষের প্রেমের ফল মায়ার বন্ধনে দুঃখ ও বার বার জন্মগ্রহণ। আমরা ভোগী তাঁহারা ত্যাগী।

কিন্তু রহস্য এই যে তাঁহারা মনে করেন আমরা (সংসারী জীবরা) ভ্রমান্ধ এবং আমরাও মনে করি যে আমরা ভ্রমান্ধ তাঁহারাই সত্য পথে যাইতেছেন।

অতএব ইন্দ্রিয়-বশীভূত আমরা দুঃখের দিকে এবং জিতেন্দ্রিয় তাঁহারা পরম সুখও শান্তির দিকে প্রবল বেগে ছুটিতেছেন।

এইজন্য যোগের পঞ্চম অঙ্গ প্রত্যাহার মানব জীবনের মঙ্গলের কারণ।

পাতঞ্জল দর্শন বলিয়াছেন,—

"স্ববিষয়াসংপ্রয়োগে চিত্তানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ॥"

অর্থাৎ, স্ব স্ব বিষয়ের অসম্বন্ধে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের চিত্তের অনুকার অর্থাৎ চিত্তের নিরোধে ইন্দ্রিয়ের নিরোধের নামই প্রত্যাহার।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে,—

"ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ।
বলাদাহরণং তেষাং প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ স্বভাবতঃ বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয় সকলের বলপূর্ব্বক প্রত্যাকর্ষণের নামই প্রত্যাহার।

সুতরাং চিত্ত যখন স্বভাবতঃ চঞ্চল এবং এবিষয়ের আকর্ষণও যখন প্রবল, অতএব বিষয়ে দোষ দৃষ্টি ও তৎসংসর্গত্যাগ ভিন্ন ইন্দ্রিয় সকলকে আয়ত্ত করা যায় না। এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—

"বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।"

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল অতীব বলবান বলিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও বিষয়াসক্ত করে।

এই বারে আমরা বুঝিতে পারিব অভ্যাস (Habit) ও সংস্কারে (nature) পার্থক্য কি এবং অভ্যাসের দ্বারা সংস্কার পরিবর্ত্তন করা যায় কি না।

মানুষ কতকগুলি প্রবৃত্তি (Tendency) লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই গুলিকে সংস্কার বলে। সংস্কার গুলি কোথা হইতে আইসে? নিশ্চয়ই এই জন্মের পূর্ব্বে এক জন্ম ছিল তাহারই অভিজ্ঞতার ফল, তাহা না হইলে তাহারা আর কোথা হইতে আসিবে? কারণ, ইহ জন্মে নবজাত শিশুর কোন কার্য্যই করা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইহ জন্মের জ্ঞান হইতে তাহারা আসিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন,—

"জীব বার বার জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য, কর্ম্মই বলবান্ এবং কর্ম্মই জীবের ঘন ঘন জন্মগ্রহণের কারণ।"

পূর্ব্বজন্মের যেটা অভিজ্ঞতা (Experienc) ইহ জন্মের সেটা সংস্কার (Tendency) রূপ ধারণ করিয়া জীবের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মবশে অনুগমন করে। সুতরাং সংস্কার জিনিসটা আমাদের নিজের সৃষ্টি ও সম্পত্তি। যদি কাহারও সংস্কার মন্দ হয়, সে জন্য অপর কেহই ধর্ম্মত ও ন্যায়তঃ দোষী হইতে পারে না।

এখন অভ্যাস জিনিষটা মানুষের ইহ জন্মের সাধনার ফল। মানুষ জ্ঞান সঞ্চার হওয়া অবধি যেরূপ সঙ্গ (Atmosphere বা Company) ও শিক্ষা Education পাইবে, সেইরূপ আপনার জীবনকে চালাইতে শিখিবে। ভাল শিক্ষা ও সাধু সচ্চরিত্র লোকের সঙ্গ বাল্যকাল হইতে পাইলে, তাহার জীবনের প্রতিদিনের কার্য্যাবলী Routine ভাল আদর্শে গঠিত হয়। আদর্শ ভাল হইলে কার্য্যও ভাল হয়। প্রতিদিন এক নিয়মে যে কার্য্য করিবে, তাহাই কালে অভ্যাসে পরিণত হইবে। প্রত্যহ একই রকমের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে কিছুদিন পরে সেই কার্য্যই এত বলবান্ হইবে যে তখন আর না করিয়া থাকা যাইবে না। অভ্যাসের ফল সামান্য নয়। অভ্যাস মন্দ হইলে তাহার ফল এত মর্ম্মান্তিক হয় যে, অনেক সময় ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানুষ সেই কার্য্যই করিয়া থাকে।

সুতরাং ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইল যে সংস্কার nature প্রকৃতিগত innate এবং অভ্যাস Habit সাধনাগত অভিজ্ঞতাগত Acquire এখন দুটী কথা মনে রাখিতে হইবে, যে (১) এই অভ্যাস সংস্কারের পর আইসে বলিয়া স্বভাবতঃ সংস্কারের অধীন ও অনুকূল; এবং (২) এই অভ্যাস সাধনা বলে এত প্রবল হয় যে, সংস্কারকে বদলাইয়া দেয় এবং সংস্কারের উপর আধিপত্য করে।

এইখানে আমরা আর দুটী নূতন কথা বলিব। কর্ম্মরহস্য বিষয়টী বড়ই জটিল বলিয়া আমরা দুটী কথা আনিতেছি এবং ইহার সাহায্যে বিষয়টী সহজ-বোধ্য হইবে।

এই সংস্কারের অপর নাম অদৃষ্ট বা নিয়তি Predestination এবং অভ্যাসের অপর নাম পুরুষকার বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা Freewill, দর্শন শাস্ত্রে এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টী বড় কোনটী ছোট বিচার বড়ই কৌতুককর ও চিন্তাপূর্ণ। মানুষের Freewill বা পুরুষকার অদৃষ্টকে বদলাইতে পারে কিনা; এই বিচার এখনও জ্ঞানী সমাজে একটী প্রকাণ্ড আলোচনার জিনিষ হইয়া রহিয়াছে।

অভ্যাস বা পুরুষকার সাধারণতঃ সংস্কার বা অদৃষ্টের অধীনে ও অনুকূলে থাকিয়া কার্য্য করে। একটী ভীল জাতীয় লোকের সন্তান সাধারণতঃ ভীলদের অভ্যাস বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা করে। আবার উচ্চ ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও মন্দ সংস্কার জন্য বাল্যকাল হইতেই অনেকে কদভ্যাস শিখিতে আনন্দ বোধ করে। যাহার যেমন সংস্কার বা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম থাকিবে তাহার ইহ জন্মের অভ্যাসও সেইরূপ বাল্যকাল হইতেই আরম্ভ হইবে। আমি এখন একটী ভদ্র কায়স্থ ঘরের বালককে জানি যে বাল্যকাল হইতেই বিদ্যালয়ের নামে কাঁদিত এবং নীচজাতীয় বালকদিগের সহিত খেলা করিতে আমোদ বোধ করিত; এমন কি,

সেই বালক যখন ২২ বৎসরের যুবক হইল তখনও প্রকাশ্যে গুরুজন-দিগের সম্মুখে অভদ্রভাবে মালকোছা বাঁধিয়া কাপড় পড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহা হইতেই নিশ্চয়ই এই বুঝিতে হইবে যে, বালকটীর সংস্কার ভদ্রঘরের উপযোগী নয়।

আবার, আর একটী ঘটনা জানি যেখানে একটী নাপিতের ছেলে বাল্যকাল হইতে নাপিতের বৃত্তি ভাল বাসিত না, একটু চিন্তাশীল থাকিত। সেই বালকের সংস্কার নাপিতের ঘরের উপযোগী ছিল না; সেইজন্য নাপিতের কার্য্য বা অভ্যাস তাহার সংস্কারের অনুরূপ হইত না।

ইংরাজি শিক্ষিত সকলেই জানেন, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক নিউটন অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন বলিয়া এবং ক্ষেত্রের কার্য্যে অন্যমনস্ক থাকিতেন বলিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে কৃষিকার্য্য হইতে অবসর দিয়া-ছিলেন। নিউটনের সংস্কারের সঙ্গে কৃষকের কার্য্য ঠিক মিলিতে ছিল না বলিয়া কৃষকের মত অভ্যাস তাঁহার সহজে আয়ত্ত হইতেছিল না, এবং সেই জন্যই সংস্কারের বিরোধী বলিয়া তাঁহার কৃষিকার্য্য মোটেই ভাল লাগিত না।

সিংহশিশুর শৃগাল শাবকের সহিত প্রতিপালনের গল্পে আমরা সংস্কা-রের প্রাধান্য সহজেই বুঝিতে পারি। এক সিংহ-শিশুকে বনের মধ্যে অসহায় অবস্থায় দেখিয়া এক শৃগালী দয়া পরবশ হইয়া তাহাকে আপন সন্তানদের সহিত প্রতিপালন করিতে লইয়া গেল। শৃগাল শাবকগণ সিংহ শিশুর সহিত শৃগালীর দুগ্ধপান করিয়া কালক্রমে বেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণ যুবক হইয়া উঠিল। সিংহশিশু জানিত না যে সে সিংহশিশু; শৃগাল শাবকগণও এই ব্যাপার জানিত না; সেই শৃগালী কেবল ইহা জানিত, কিন্তু সে তাহা গুপ্ত রাখিয়া ছিল। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে

সেই শৃগালশাবকগণ সেই সিংহশিশুকে তাহাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মনে করিত। একদিন বনে এক হস্তীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। দেখিবামাত্র শৃগালশাবকগণ ভয়ে যে যেদিকে পাইল, পলায়ণ করিল, কেবল সিংহশিশু পলাইল না; সে গর্জ্জন করিয়া হস্তীর সম্মুখে অগ্রসর হইল। হস্তী সিংহগর্জ্জন শুনিবামাত্রই ভয়ে এক দিকে ছুটিয়া প্রাণ লইয়া পলাইল। সিংহশিশু তখন শৃগাল শাবকগণকে খুঁজিতে লাগিল। শৃগাল শাবকেরা এদিকে শৃগালীর নিকট আসিয়া মিথ্যা করিয়া নিজেদের বিক্রম ও সিংহ শিশুর ভিরুতা সম্বন্ধে বলিতে ছিল। শৃগালী একটু হাসিয়া বলিল, "তোদের শৃগালের জন্ম, শৃগালের সংস্কার, তোরা হাতী মারাব কেমন করিয়া?" আর তোদের দাদার সিংহের জন্ম, সিংহের সংস্কার, সে কখন হাতী দেখে পালাতে পারে?" ইতিমধ্যে সিংহশিশু শৃগালীর নিকট আসিয়া ভ্রাতৃগণের কাপুরুষতার কথা বলিল, শৃগালী কখন সরলভাবে সত্য কথাগুলি বলিয়া তাহার জন্ম বিবরণ বলিল। তখন সিংহশিশু আনন্দে গর্জ্জন করিয়া শৃগালদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের সিংহদের দলে আনন্দ পাইতে ছুটিল। সিংহের সংস্কারে শৃগালের কার্য্য বা অভ্যাস ভাল লাগিবে কেন? সিংহের সংস্কারে সিংহের অভ্যাস খাপ খায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী

বি, এ, বি, এল।

গুহামুখে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি ছাড়া বাড়ীর আর কেহই ইহাতে কোনও ভীতির চিহ্ন দেখাইল না। কেহ কোনও কথা কহিল না, অথবা সেখানে আসিল না।

আমি কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইলাম। আমার ক্ষুধা—যা কিছু ছিল—সমস্তই লুপ্ত হইয়াছে। এখন গৌরী পথ ছাড়িয়া দিলেই আমি পলাইয়া বাঁচি।

কিন্তু গৌরী পথ ছাড়িল না। বাসনগুলা ফেলিয়া, নিকটের একটা জলপাত্র হইতে জল লইয়া হাত ধুইতে বসিয়া গেল। পথ সঙ্কীর্ণ—যাইতে হইলে, তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হয়।

আমি আর তাহার পাগলামী দেখিতে দাঁড়াইয়া থাকিব না স্থির করিলাম। বলিলাম,—"আর কেন, রাত্রি অধিক হইতেছে। পথ ছাড়িয়া দাও—আমি বিশ্রাম করি।"

"আর একটু অপেক্ষা কর"—বলিয়া গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আর অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি না। সকলে নিদ্রিত হইয়াছে।"

"কেহ ঘুমায় নাই। বাবু কি করিয়াছে, বলিতে পারি না। আর সকলেই যে যার নিজের ঘরে জাগিয়া আছে। তাহারা জপের নাম করিয়া

তোমার আহারশেষের অপেক্ষা করিতেছে। কেহ এখনও জল খায় নাই। বলা বোধ হয় বাবুর পদসেবা করিতেছে।"

"তবে তাহাদের আহারের ব্যাঘাত ঘটাইতেছ কেন? আমাকে যাইতে দাও।"

"তুমি ত এখনও পর্য্যন্ত কিছু মুখে দিলে না।"

"এখনও কিছু খাওয়াইবার অভিলাষ আছে নাকি?"

"আছে বই কি!"

"তা হইলে দেখিতেছি, তুমি যথার্থই পাগল।"

"আমাকে পাগল বলিতেছে কে?"

"আমিই বলিতেছি।"

"পাগলের কাজ আমাতে কি দেখিলে?"

আমি গৌরীর কথায় অপ্রতিভ হইলাম। আগাগোড়া হিসাব করিয়া তাহার এতক্ষণের কার্য্যে পাগলামী ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমার মনে হইতে লাগিল, তাহার বাহিরের প্রাত আচরণে তাহার ভিতরটা প্রতিফলিত হইতেছে। আমি তাহার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলাম না।

গৌরী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আমার উত্তরের অপেক্ষা করিল। অথবা অপেক্ষার ছলে আমাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। যখন দেখিল, আমি উত্তর দিলাম না, তখন সে বলিল,—"বারংবার আহারের ব্যাঘাতে তোমার ক্ষুধা দূর হওয়াই সম্ভব। আমি তোমাকে আর অনুরোধ করিতাম না। বুঝিতাম, তোমার ভাগ্যে আজ আহার নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তুমি না কিছু মুখে দিলে, ইহারা কেহ কিছু মুখে তুলিবে না। সেইজন্য তোমার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছি। আর একবার তোমাকে আসনে বসিতে হইবে। একটা মিষ্টান্ন অন্ততঃ দাঁতে কাটিতে হইবে।"

তাহার মনোভাব এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া মনে মনে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিলাম। হিন্দুপরিবার ব্রাহ্মণ অতিথিকে কিরূপ চক্ষে দেখে, সে বোধ আমি অনেক দিন জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমি ইহাদের ঘরে অতিথি—বিশেষতঃ তীর্থে অতিথি। আমার আহারের দুরবস্থা দেখিয়া, ললিতের মা ও পিসী নিজের নিজের ঘরে বসিয়া কি মনোবেদনাই না ভোগ করিতেছেন? ললিতের কল্যাণ-কামনায় ভগবানের কাছে আকুল হৃদয়ে কতই না প্রার্থনা করিতেছে? মনে করিতেই আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—"চল গৌরী! আমি মিষ্টান্ন মুখে দিব।"

গৌরী বলিল—"চল।"

আমি আগে গৃহে প্রবেশ করিলাম, গৌরী আমার পশ্চাতে প্রবেশ করিল। আসন পাতাই ছিল। আসনের সম্মুখে মিষ্টান্নপাত্র যে ভাবে রক্ষিত ছিল, এখনও সেই ভাবেই রহিয়াছে।

তথাপি গৌরী আমাকে আসনে বসিতে নিষেধ করিল। বলিল—"আর একটু দাঁড়াও। আহারের স্থানটা পরিষ্কার করিয়া নূতন মিষ্টান্ন লইয়া আসি। এ মিষ্টান্ন অনেকক্ষণ অনাবৃত ছিল। ইহা তোমাকে দিতে পারি না।"

আমি এই বারে আর একবার গৌরীর মুখের পানে চাহিলাম। শুধু চাহিলাম—কোনও কথা কহিলাম না। সেও আমার মুখের পানে চাহিল। চাহিয়া হাসিল।

আমি হাসিয়া তাহার হাসির উত্তর দিলাম। গৌরী ক্ষিপ্রহস্তে সে স্থান পরিষ্কার করিয়া, মিষ্টান্নপাত্র লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

আমি তাহার ফিরিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেই অব-

স্থাতেই মনে মনে বলিলাম—"এ আমার ব্রাহ্মণত্ব পুনঃ প্রাপ্তির প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।"

একটু পরেই গৌরী আবার একটা নূতন পাত্রে ভরিয়া কতকগুলা মিষ্টান্ন আনিল। প্রচুর মিষ্টান্ন। আমি জীবনে তত মিষ্ট দ্রব্য আর কাহাকেও কখন একবারে খাইতে দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। অবশ্য বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, তাহারা নিমন্ত্রণে খাইতে বসিয়া পূর্ণাহারের পরেও পাঁচ সের মোণ্ডা উদরস্থ করিতে পারিতেন। শুনিয়াছি, কিন্তু কাহাকেও খাইতে দেখি নাই। ইংরাজী পড়ার সময় হইতে আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অজীর্ণের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এখন নিমন্ত্রণে বসিয়া যে যত কম খাইতে পারে, তাহারই গৌরব তত অধিক। বিশেষতঃ আমাদের সময়ে মিষ্টান্নটা মুখে করা সভ্য যুবকগণের মধ্যে একরূপ পাপ বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল।

সেই মিষ্টান্নের সমষ্টি দেখিয়াই আমি বলিয়া উঠিলাম—"এ কি গৌরী? দশজনের খাবার পাত্রে ভরিয়া আনিলে কেন?"

"তুমি খাইবে বলিয়া। পিসীকে বলিতে সে এই খাবার আমাকে দিয়াছে।"

"পিসী তোমার আজিকার মূর্ত্তি দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিজের জন্য কিছু রাখেন নাই। ভাণ্ডারে যা ছিল, সব দিয়াছেন।"

"তা কেন, এখনও যথেষ্ট খাদ্য ভাণ্ডারে আছে। ইহাদের অর্থাভাব নাই। একজনের খাদ্য যোগাইতে ইহাদের ভাণ্ডার শূন্য হইবে না।"

এই বলিয়া গৌরী খাদ্যপাত্র আসন সম্মুখে রক্ষা করিয়া আমাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

আমি আসনে উপবেশন করিলাম। সে ইত্যবসরে একটি গ্লাস জল-

পূর্ণ করিয়া পাত্রের পার্শ্বে রক্ষা করিল এবং আমার সম্মুখের ভূমিতে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিল।

আমি জলে হাত ধুইতে ধুইতে তাহাকে বলিলাম,—"মিষ্টান্নের দুইটী মাত্র রাখিয়া, আর সমস্ত উঠাইয়া লও।"

গৌরী বলিল,—"কেন ?"

"আমার মত দশ জনেও এ খাদ্য নিঃশেষ করিতে পারিবে না।"

"বেশ ত, যা পার খাও।"

"অবশিষ্ট ?"

"অবশিষ্টের জন্য তোমার ভাবনা কেন ?"

"হ'তে পারে ইহারা ধনী। ইহাদের সামগ্রীর অভাব নাই। কিন্তু আমি জিনিষের অপচয় দেখিতে ইচ্ছা করি না।"

গৌরী খিল্ খিল্ হাসিল।

আমি বলিলাম,—"তুমি হাস, আর যাই কর—আমি যা বলিলাম, তা না করিলে, এ মিষ্টান্নের একটী কণাও আমি মুখে তুলিব না।"

গৌরী আবার খিল্ খিল্ হাসিল—কোনও উত্তর করিল না। অথবা আমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিল না। মুখ তুলিয়া দেখি, সে আমার মুখের পানে চাহিয়া আছে।

চোখে চোখ পড়িবামাত্র সে তৃতীয় বার হাসিল। সে হাসির তরঙ্গ আমার চোখ দিয়াই হউক, অথবা কাণ দিয়াই হউক, কোনও রকমে আমার হৃদয়দেশে প্রবেশ করিয়া আমার মস্তিষ্কে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, আমি মিষ্টান্নের থালায় চোখ নামাইয়া কিছুক্ষণের জন্য তাহাতে এক রা'শ্ অন্ধকার সঞ্চিত দেখিলাম। আবার একবার মুখ তুলিবার চেষ্টা করিলাম। মুখ উঠিল, কিন্তু চোখ উঠিল না। মস্তিষ্কটা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে দেখি, আমার বক্ষ প্রবলবেগে স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু যে

অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাতে আমাকে যেমন করিয়া হউক হৃদয়কে শান্ত করিতেই হইবে। এ পাগলিনী কি করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত আমি একটি ঘরে বসিয়া আছি। আমার আচরণ দেখিয়া ইহারাই বা কি মনে করিতেছে! আমি হৃদয়ে যথাসম্ভব বল সঞ্চয় করিয়া, চোখ না তুলিয়াই বলিলাম,—"যদি আমাকে কিছু খাওয়াইবার সাধ থাকে, তাহা হইলে যা বলিলাম, তাই কর। একখানি বরফী ও একখানি প্যাঁড়া রাখিয়া আর সমস্ত খাবার উঠাইয়া লও।"

গৌরী যেমন বসিয়া ছিল, তেমনিই বসিয়া রহিল—আমার আদেশ পালন করিল না।

আমি কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইলাম। গৌরী চোখ তুলিয়া দেখিল মাত্র—কথা কহিল না।

তাহার ভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। ক্ষণপূর্ব্বের উল্লাসময়ী সুন্দরী দেখিতে দেখিতে যেন নিথর প্রস্তরমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে।

আমি এখন শুধু বিস্মিত নহি—বিপন্ন। দাঁড়াইয়াই আমার মনে হইল, আমি কিছু না খাইলে, ললিতের মা ও পিসী রাত্রিতে জলস্পর্শও করিবেন না।

কর্ত্তব্য স্থির করিতে অনেকটা সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। আমি আর একবার গৌরীর মুখপানে চাহিতে দেখি, সে পলকহীন নেত্রে ঊর্দ্ধে যেন কাহার পানে চাহিয়া আছে। তাহার সে অবস্থা দেখিয়া আমার ভয় হইল। মনে হইল বুঝি, আবার তাহার হিষ্টিরিয়া হইয়াছে। তাহাকে ডাকিতে আমার সাহস হইল না।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমি তাহার সংজ্ঞা ফিরিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বহুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৌরী

সংজ্ঞায় ফিরিল। তাই ত! এতক্ষণ পর্য্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস রহিত করিয়া সে বসিয়া ছিল! এতক্ষণ শ্বাস বন্ধ করিয়া কেহ কখন কি জীবিত থাকিতে পারে! গৌরীর সে সময়ের অবস্থাটা বুঝিবার জন্য আমার কৌতূহল হইল। কিন্তু প্রশ্ন করিতে না করিতে সে বলিয়া উঠিল,—"ও কি, তুমি দাঁড়াইলে যে? মিষ্টি মুখে দিলে না?"

আমি বলিলাম,—"আমার কথার অন্যথা হইবে না। আমি দুইটা মিষ্টান্নের অধিক মুখে তুলিব না। যদি আমাকে খাওয়াইবার ইচ্ছা থাকে, তা' হইলে এই সব খাদ্য হইতে আমাকে দুইটা তুলিয়া দাও—তা তোমার যে দুইটা ইচ্ছা। অবশিষ্ট সরাইয়া লও। যদি না লও, তাহা হইলে আমি উঠিয়া যাইব। মা ও পিসী-মা যদি রাত্রে উপবাসী থাকেন, তাহার পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে।"

"বেশ, মা নিজ হাতে যে খাবার প্রস্তুত করিয়াছেন, তা' হ'তে দুইটা তুমি উঠাইয়া লও।" এই বলিয়া গৌরী দুইটা সন্দেশ আমাকে দেখাইয়া দিল।

আমি তন্নির্দ্দিষ্ট সন্দেশ দুইটা উঠাইয়া লইলাম, এবং পাছে পাত্রে উচ্ছিষ্ট পড়ে, এইজন্য মুখ ফিরাইয়া একটা সন্দেশ উদরস্থ করিলাম। অপরটাকেও নিঃশেষ করিতে যাইতেছি, এমন সময় গৌরী বলিল—"ঠাকুর! আমার একটা কথা শুনিবে?"

"কি, বল।"

"যদি দুইটার অধিক না খাওয়াই তোমার সঙ্কল্প—"

"আমি স্থিরসঙ্কল্প। তুমি সমস্ত দেবতার দিব্য দিয়া অনুরোধ করিলেও আমি বাক্যের অন্যথা করিব না।"

"এ ত ব্রাহ্মণেরই উপযুক্ত কথা। সকল কাজেই এরূপ সঙ্কল্প রাখিতে পারিলে, ব্রাহ্মণের লুপ্ত জ্যোতি আবার তোমাতে ফিরিয়া আসে।

তাহাতে যে আমি কত সুখী হইব, তা আর তোমাকে কি বলিব। তাহ'লে এক কাজ কর, দ্বিতীয় সন্দেশ সমস্ত খাইও না—কিছু অবশিষ্ট রাখ।"

"কেন ?"

"ব্রাহ্মণকে পাত্র নিঃশেষ করিয়া খাইতে নাই—ভুক্তাবশেষ কিছু রাখিতে হয়।"

"তুমি আমাকে একদিনেই ধার্ম্মিক করিয়া তুলিলে, দেখিতেছি।"

"তুলিবার প্রয়োজন আছে।"

"কি প্রয়োজন ?"

"প্রয়োজন বলিতে গেলে যে সন্দেশ ফুরাইয়া যায়।"

হরিদ্বারে তখন সন্দেশ মিলিত না। মিলিত কেবল ক্ষীরের সামগ্রী। আমি বুঝিয়াছি, ললিতের মা দুগ্ধ হইতে ছানা প্রস্তুত করিয়া, সেই ছানাতেই এই সন্দেশ করিয়াছেন। খাদ্য এমন উপাদেয় হইয়াছে যে, মুখের কাছে তাহা লইতে না লইতেই নির্ব্বাপিত ক্ষুধানল পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়াছে। সন্দেশের অংশ রাখিব কি, খাইতে খাইতে মনে করিতেছিলাম, যদি এখন গৌরী আমাকে আরও দুই চারিটা সন্দেশ খাইতে উপরোধ করে, আমি 'না না' বলিতে বলিতে আরও দুই চারিটা খাইয়া ফেলি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশে গৌরী আর উপরোধ করিল না। অগত্যা আমাকে আহারে নিরস্ত হইতে হইল।

তখন সন্দেশটার অভুক্তাংশ হাতে করিয়া গৌরীকে বলিলাম,—"এইত প্রসাদ। এখন এ প্রসাদ রাখিব কোথায় ?"

গৌরী বলিল,—"এই পাত্রেই রাখ। আমার কথা শুন, অন্যথা করিওনা। তুমি ব্রাহ্মণ—তোমার প্রসাদ পড়িয়া থাকিবে না। এ বাড়ীতে প্রসাদ পাইবার লোক ঢের আছে।"

"ঢের কে? প্রসাদ খাবার পাত্রের মধ্যে এক ভৃত্য বলাইকে মাত্র ত দেখিতেছি।"

"চাকর আছে—ঝী আছে—আমি আছি।"

"ঝীকে ত দেখি নাই।"

"আজ তার জ্বর হইয়াছে। সে একটী ঘরে লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে।"

"চাকর ঝী না হয় রহিল। তুমি আছ—মানে কি?

"কেন আমার থাকিতে দোষ কি? ব্রাহ্মণকন্যা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রসাদ পাইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? আমার সে ত বহু-ভাগ্য।

"তাহা হইলে বুঝিতেছি, এ প্রসাদ তুমিই লইবে।"

"আমিই লইব। কেন লইব, বলিতেছি—আগে তুমি প্রসাদ পাত্রে রাখ।"

আর তার উপরোধ না রাখা কর্ত্তব্য মনে করিলাম না—তাহার ইচ্ছা-মত কার্য্য করিলাম।

তখন গৌরীর কথা শুনিলাম, তাহার প্রসাদ লইতে কেন যে তাহার এত আগ্রহ, তার কারণ বুঝিলাম। বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

গৌরী বলিল,—"কি জানি, কি অবস্থায় কতদিন কোথায় ঘুরিতে হইবে তার ঠিক কি? এজন্য ব্রাহ্মণের প্রসাদ পথের সম্বল করিয়া লইলাম।

"একান্তই যাইবে?"

"কতবার বলিব?"

"গৌরী! এরূপ উন্মত্তার মত কথা কহিও না।"

"বালাই, আমি উন্মত্ত হইতে যাইব কেন?"

"কোথায় যাইবে?"

"তা এখন কেমন করিয়া বলিব? আমি ত কখন বাড়ীর বাহিরে পা দিই নাই। অতি শৈশব অবস্থা থেকে ইহাদের আশ্রয়ে আছি।"

"সামান্ত কথায় তোমার এত অভিমান হইল?"

"কাহারও উপর আমার অভিমান নাই। আমাকে যাইতেই হইবে বলিয়া যাইতেছি।"

"তুমি ইহাদের কে?"

"পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, কেহ নয়।"

"তবে এখানে আসিলে কেমন করিয়া?"

"অদৃষ্ট আনিয়াছে।"

"তোমার কি আপনার জন কেহ নাই?"

"কেহ ছিল না। থাকিলে, ইহাদের গৃহে আসিব কেন? আমি বাল্য-কাল হইতেই পিতৃমাতৃহীন।"

"তবে কার আশ্রয়ে তুমি যাইবে?"

"আশ্রয় মিলিয়াছে।"

"এইত দুই ঘণ্টা আগে তোমার গৃহত্যাগের ইচ্ছা হইয়াছে। ইহারই মধ্যে আশ্রয় মিলিল কোথায়?"

"মিলিয়াছে। আমি দেখিয়াছি।"

"আমার সম্মুখে যখন দমবন্ধ করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে বসিয়া ছিলে, তখনই কি দেখিয়াছ?"

গৌরী মৃদু হাসিল।

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, এখনি ললিতকে ও সেই সঙ্গে বাড়ীর সকলকে সংবাদ দিয়া ইহার গৃহত্যাগে বাধা দিব। মনের সেই সাহসে, আমি কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আরও দুই একটা প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা করিলাম। বলিলাম,—"তখন কি দেখিতেছিলে?"

"তোমাকেই দেখিতেছিলাম।"

"আমি কি কড়িকাঠে ঝুলিতেছিলাম ?"

গৌরী তাহার চির অভ্যস্ত খিল খিল হাসির সহিত বলিল,—"আকাশে উড়িতেছিলে।"

"তাহ'লে আমিই তোমার আশ্রম বল !"

"এইরূপই ত দেখিলাম।"

"তুমি শুধু পাগল নয়, বদ্ধ পাগল।"

"পাগল তুমি।"

"বেশ, তবে পাগলকে কি সাহসে আশ্রয় করিতেছ ?"

"ও পাগলামী সারিয়া যাইবে।"

"কিন্তু আমি যে নিরাশ্রয়।"

"পুরুষ মানুষ নিজেই নিজের আশ্রয়।"

"এত বয়স পর্য্যন্ত তোমার বিবাহ হয় নাই কেন ?"

"তোমার জন্য। বিধাতা তোমার আশ্রয়ে আমাকে পাঠাইয়াছে, অন্যে আসিবে কেন ? ইংরাজী শিক্ষিতের অবিশ্বাসের মন—গৌরীর এই কথায় কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়া গেল। সে যে কুমারী, তাহা প্রথম দর্শনেই বুঝিয়াছিলাম। তাহার হাতে সোনার বালা ও নোয়া আছে, কিন্তু মাথায় সিন্দূর নাই। কিন্তু হিন্দুকন্যা বিশেষতঃ বাঙ্গালী-কন্যা নিজে ঘটকী হইয়া এত প্রগল্‌ভতার সহিত একজন প্রথমদৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে নিজের বিবাহের সম্বন্ধ করে, আর কোথাও দেখা দূরে থাক্, সভ্য জগতেও কোনও রমণীকে এরূপ করিতে শুনি নাই। যে দেশেই হউক, রমণীর রমণীত্বের নাম মাত্র থাকিলেও, এরূপ করা অসম্ভব। গৌরীর চরিত্রে আমার সন্দেহ হইল। ভাবিলাম, এই অনূঢ়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ললনা এই যে এতকাল এক সম্পর্কবিহীন অনূঢ় যুবকের সঙ্গে বাস করিতেছে,

ইহাতে তাহার চরিত্রে দোষস্পর্শ না হওয়া কি সম্ভব? দেবকন্যাও এরূপ অবস্থায় চিত্তবিকার রোধ করিতে পারে কি না, সন্দেহ।

আমার মনে সংশয় জন্মিল। মস্তক অবনত করিয়া, গৌরীর কথায় কি উত্তর দিব, অথবা তাহাকে কি প্রশ্ন করিব, চিন্তা করিতে লাগিলাম।

গৌরী এতাবৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমি তাহার নিঃশ্বাস-শব্দটা পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতেছি না।

তাইত! সে কি বসিয়া বসিয়া আমার অন্তরের কথা শুনিতেছে? উত্তর দিবার জন্য মাথা তুলিয়া দেখি, গৌরী আমার মুখের পানে চাহিয়াই মুখ ফিরাইল।

আমি বলিলাম,—"তা কেমন করিয়া হয় গৌরী, আমি যে অগ্রেই একজনকে ভালবাসিয়াছি।"

"মিছে কথা।"

"মিথ্যা নয়, আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছি।"

"বড় বড় কথা কহিও না।"

"তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

"প্রাণ কি বস্তু, তোমার জানা নাই। ভালবাসার পবিত্রতা তোমার বোধ নাই। আজীবন বাহিরের দিকে ছুটিয়াছ। ভিতরের সে বস্তু জানিতে তোমার অধিকার কি?"

"এ তুমি নিজের ইচ্ছামত, যাহা ইচ্ছা বলিতেছ। আমার অন্তর আমি জানিলাম না—তুমি জানিলে?"

"অন্তর জান বই কি। কিন্তু প্রতারক! অন্তরের কথা মুখে বলিতে তোমার সাহস নাই।"

এই বলিয়া গৌরী মিষ্টান্নের থালা হাতে লইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিল। আর আমার পানে একটি বারের জন্যও ফিরিয়া চাহিল না।"

আমি একবার ডাকিলাম,—"গৌরী!" কিজন্য ডাকিলাম—আর তাহাকে বলিবার কি আছে,—বুঝিলাম না। তবু ডাকিলাম—"গৌরী!" উত্তর পাইলাম না।

তখন মাথা হেঁট করিয়া নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে ললিতের ঘরে চলিয়া গেলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ প্রণীত।

প্রিণ্টার—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,

মেট্‌কাফ্ প্রেস্—৭৬নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পঞ্চম ভাগ ; মাঘ ও ফাল্গুন ১৩২০। [illegible] সংখ্যা।

অলৌকিক রহস্য

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদিত

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বিএ, বিএল,

সহকারি-সম্পাদক ;

সূচী।

অলৌকিক রহস্যের নিয়মাবলী

১। "অলৌকিক রহস্য" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হয়। শ্রাবণ মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলাদি সমেত সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র; ভিঃ পিঃতে পাঠাইতে ৴০ এক আনা অধিক লাগে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ তিন আনা।

৩। কেবল ৶১০ সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা একখণ্ড প্রেরিত হইবে।

৪। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদ পর-সংখ্যা-প্রকাশের পূর্ব্বে না জানাইলে আমরা সেই সংখ্যা পুনরায় পাঠাইতে দায়ী থাকিব না।

৫। কেহ যদ্যপি পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া রিপ্লাই পোষ্টকার্ড লিখিবেন।

৬। "অলৌকিক রহস্য"-সম্বন্ধীয় চিঠি-পত্র, টাকা-পয়সা আমার নামে এবং প্রবন্ধাদি বিনিময়ার্থ পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ইউনিভার্শেল লাইব্রেরী, ৫৬৷১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, } শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক

৬ষ্ঠ ভাগ] মাঘ, ১৩২০। [৭ম সংখ্যা।

ভৌতিক-গন্ধ।

ভৌতিক-গন্ধ অর্থে ভূতের গন্ধ বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন। ভূতদের কোন বিশেষ গন্ধ নাই। ভূতদর্শন হইলে, তৎকালে কোনরূপ ভূতের গন্ধ পাওয়া বড় একটা শুনা যায় না; কাজেই ভূতের যে একটা বিশেষ প্রকারের গন্ধ আছে, তাহা বলা যাইতে পারে না।

ইতিপূর্ব্বে অলৌকিক-রহস্যে হাবড়া সহরের কাসুন্দে নামক পল্লীতে একটি ভূতের প্রকাশ সম্বন্ধে ঘটনা বাহির হইয়াছিল। তাহাতে আমরা দেখিয়াছি যে, সেই ভূতের আবির্ভাব হইলেই এক প্রকার পচাবিষ্ঠার গন্ধ পাওয়া যাইত। কাসুন্দের একটী প'ড়ো বাটীতে এক দুঃখিনী বৃদ্ধা আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। বৃদ্ধাকে পাড়ার লোকে পাগলী বলিয়াই জানিত, এজন্য সে ঐ বৃহৎ প'ড়ো বাটীর কোথায় থাকে, কি করে, কেহ সংবাদ রাখা আবশ্যক মনে করিত না। পাগলী কয়েকদিন বাটীর বাহিরে আসিয়া আহার চাহিয়া খাইয়া বেড়াইত, পরে আর বাটীর বাহিরে আসিত না। লোকে মনে করিত, পাগলী চলিয়া গিয়াছে। কয়েকদিন পরে পাগলীর মৃতদেহ অতি দুর্গন্ধ অবস্থায় সেই বাটীর মধ্য হইতে বাহির করা হয়।

অনেকে বুঝিলেন, পাগলী পীড়াক্রান্তা হইয়াই হউক বা ক্ষুধায় শক্তি-হীনা হইয়াই হউক, বাটীর বাহিরে আসিতে পারে নাই। ক্ষুধায় বা পীড়ায় বা দুই কারণেই পাগলীর ইহলীলা শেষ হইয়া থাকিবে। এই ঘটনার প্রায় বৎসরখানেক পরে ঐ বাটীতে একঘর বাঙ্গালী খৃষ্টিয়ান ভাড়াটিয়া আসেন। ইঁহারা রাত্রে ভূতের দর্শন পাইতে লাগিলেন। ইঁহাদের নিকট শুনিয়া পাড়ার অনেক ভদ্রলোকও রাত্রে ভূতের দর্শনেচ্ছায় ইঁহাদের বাটীতে যাইতেন। এই ভূতের আকার বিশেষ স্পষ্ট ছিল না; তবে যাঁহারা পাগলীকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা ভূতকে সেই পাগলীর ভূতাবস্থা বলিয়াই অনুমান করিতেন। এই ভূতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার পচাবিষ্ঠার গন্ধ পাওয়া যাইত। উপরের কয়েকখানি কুঠারির মধ্যে একখানিতেই তাহার সম্বন্ধ ছিল, এই কুঠারির কপাট বন্ধ থাকিলে, তাহা খুলিয়া যাইত। ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ না করিলেও অনেক সময় গুরুতররূপ ধাক্কা দিলেও কপাট খুলা যাইত না ও ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় থাকিত না। বাহিরের দালানে খাদ্যাদি আহার করিতে বসিলে, অতি অস্পষ্ট ও খোনা শব্দে যেন বলিত "আমাকে দিবি না?" বাটীর উঠান দিয়া একটা ছায়া-মূর্ত্তি চলিয়া যাওয়াও দেখা যাইত। রাত্রি দশটা এগারটার পর এইরূপে ভূতের আবির্ভাব হইত। ইহাতে সেই খৃষ্টিয়ান গৃহস্থ বিশেষ উত্যক্ত হইয়া শেষে তাঁহাদের গির্জ্জা হইতে কি জল আনিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। আশ্চর্য্য, এই জল যে যে স্থানে ছড়ান হইত, সে সকল স্থানে ভূতের গতায়াত বন্ধ হইত। গির্জার জলের শক্তি এইরূপ প্রকাশ পাইল। অনেকে বলিতে পারেন যে, ঐ জল ছড়াইবার সময় সে ব্যক্তি উহার ভূতাপসরণ করিবার শক্তি থাকার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করায়, তাহার মনেও ভূতকে আসিতে না দিবার দৃঢ় ইচ্ছার উদয় হইয়াছিল, ঐ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির

বেগ ভূতকে দূরে যাইতে বাধ্য করিয়াছিল। যগুপি কোন দৃঢ়চিত্ত সংযমী ব্যক্তি কেবল স্থির হইয়া বসিয়া, ভূত আর না আসে—এইরূপ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলেও এইরূপ ফল দেখা যাইত।

কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাদেবীর প্রার্থনা-মত স্বর্ণমৃগ ধরিতে বহুদূর চলিয়া গিয়াছিলেন, তৎকালে দূর হইতে মারীচের করুণ চীৎকার শুনিয়া সীতাদেবী আপন স্বামীর অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া, দেবর লক্ষ্মণকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ করেন। লক্ষ্মণ সীতাদেবীর একান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া, সীতাদেবীকে একাকী অরণ্যমধ্যে রাখিয়া যাইতে হইতেছে দেখিয়া, তাঁহার রক্ষার্থে কোন লোক না পাইয়া সীতাদেবীর স্থিতি-স্থানের চতুর্দ্দিকে রেখা টানিয়া,সেই রেখার বাহিরে তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই রেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানে থাকিলে সীতাদেবীর কোন বিপদ্ ঘটিবে না। কোন জীব জন্তু শত্রুও এই রেখার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না—এইরূপ দৃঢ় ইচ্ছা করিয়া তিনি এই রেখা টানিয়াছিলেন। ইহার ফলে অমিতপরাক্রমশালী রাবণও রেখার মধ্য-বর্ত্তী স্থানে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া সীতাদেবীকে বাহিরে আসিয়া ভিক্ষা দিতে বলিয়াছিলেন। ইচ্ছাশক্তির এমনই মহিমা। এইরূপ মহিমা আমরাও ইচ্ছাশক্তি-সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি। চাই কেবল নিজের শক্তির উপর দৃঢ়বিশ্বাস। আমি পারিব না, একার্য্য হইতে পারে না, মানবের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও আমার মত লোকের দ্বারা হইতে পারে না, তাইত পারিব কি না,—এইরূপ মনের ভাব না থাকিলেই যথেষ্ট।

এই যে ভূতের গন্ধ, এরূপ ঘটনা সচরাচর হয় না। যখনই যে স্থানে ভূতের প্রকাশ হয়, তখনই যে কোন না কোন প্রকার গন্ধ অনুভব করা যাইবে, একথা ভূতবিশ্বাসসম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকও বলেন না। এস্থলে পাগ-লীর ভূতদেহসহ যে গন্ধ বাহির হইত, তাহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা

করিতে হইলে, বলা যাইতে পারে যে, জল জমিয়া বরফ হয়, আবার বরফ গলিয়া জল হয়। জল ও বরফের মধ্যবর্ত্তী একটা অবস্থা এইরূপ হয়, যখন সেই অবস্থাকে জলও বলা যায় না, বরফও বলা যায় না, জল বলিব কি বরফ বলিব, স্থির করিতে পারি না। সেইরূপ মানবের মৃত্যুতে এই স্থূলদেহ নাশ হইলেও, উহার লিঙ্গদেহ থাকিয়া যায়, এই লিঙ্গদেহ ক্রমে ক্রমে নাশ হইতে থাকে, এই দেহনাশের পর মানবের প্রেতদেহ হয়। এই লিঙ্গদেহ-নাশ ও প্রেতদেহ-লাভের যে সন্ধিস্থল, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের অর্থাৎ লিঙ্গদেহের শেষ অবস্থা ও প্রেতদেহের সর্ব্বপ্রথম অবস্থায় দুইপ্রকার দেহের গুণই বিদ্যমান দেখা যায় ও দুই দেহকে পরস্পর পৃথক্ করা কষ্টকর হইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রেতদেহে লিঙ্গদেহের গুণাবলী (attributes) সকলই থাকিয়া যায়। এই লিঙ্গদেহ পার্থিব দেহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা স্থূলদেহ-নাশের পরও পাগলীর মৃত স্থূলদেহে যখন বিষ্ঠা মিশ্রিত হইয়া সেই প'ড়ো বাটীর ভিতর পড়িয়া ছিল, তাহার সহিত মিশিয়া থাকা হেতু ঐ দুর্গন্ধে দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; সেই দুর্গন্ধ-অবস্থা উহার প্রেতদেহ-লাভের প্রথমে এবং লিঙ্গদেহ-নাশের শেষ কাল পর্য্যন্ত থাকিয়া গিয়াছিল ; অথবা ঐ দেহ, যাহা লোকে ভূত বলিয়া দেখিয়াছিল, তাহা সেই লিঙ্গদেহ মাত্রই হইবে। লিঙ্গদেহ পার্থিব দেহ, পার্থিব পঞ্চভূতে গঠিত বলিয়াই উহাতে পার্থিবগন্ধ লাগিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, এইবারে আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

এই প্রবন্ধে যে গন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে, তাহাকে অপার্থিব গন্ধ, অলৌকিক গন্ধ বা অবাস্তব গন্ধ বলা যাইতে পারে। মানুষ মাত্রেরই গন্ধ আঘ্রাণ করিবার শক্তি রহিয়াছে। এই ঘ্রাণশক্তি থাকার জন্য তাহাদের দেহে ঘ্রাণেন্দ্রিয় নামক একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় রহি-

য়াছে। এই ইন্দ্রিয়কে নাসিকা কহে, মানুষ নাসিকা সাহায্যে গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া থাকে। এই নাসিকার ভিতরে কোন পদার্থের সূক্ষ্ম রেণু গিয়া প্রবেশ করে, করিলে, সেই রেণু সকল গিয়া নাসিকার ভিতরের ঝিল্লি নামক পাতলা আবরক চর্ম্মে লাগিয়া যায়; তাহাতে ঐ ঝিল্লি হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী (nerve)-সাহায্যে সেই স্পর্শজ্ঞান মস্তিষ্কে যাইয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কের অংশবিশেষে এইরূপ স্পর্শজ্ঞান নাসিকার মধ্যবর্ত্তী গন্ধবহা নাড়ী (Olfactory nerves), সাহায্যে উপস্থিত হইলে মানব সেই দ্রব্যের অর্থাৎ যে দ্রব্যের রেণু নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার গন্ধ পাইয়া থাকে। এমতে আমরা বুঝিলাম যে, গন্ধ অনুভব করিতে হইলে, কোন দ্রব্য নিকটে থাকা চাই, এবং সেই দ্রব্য হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু সকল বাতাসের সাহায্যে চতুর্দ্দিকে উড়িয়া যাওয়া চাই, এইরূপে কোন কোন কণা মানবের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করা চাই, এবং নাসারন্ধ্র হইতে যে সকল গন্ধবহা স্নায়ু মস্তিষ্কের অংশবিশেষে গিয়াছে, সেই স্নায়ু বা নাড়ীর সুস্থ (অবিকৃত) অবস্থা থাকা চাই; তবেই মানবে বস্তুবিশেষের গন্ধ অনুভব করিতে পারিবে।

সুস্থ মানব মাত্রেরই ঘ্রাণশক্তি অর্থাৎ গন্ধঘ্রাণশক্তি ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবিকৃত অবস্থায় থাকে। কচিৎ এই শক্তির কমবেশী হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেহ অল্পমাত্র গন্ধও অনুভব করিতে পারে, অপরে হয় ত আবার সেই গন্ধ অধিকতর তীব্র বা উগ্র না হইলে অনুভব করিতে পারে না। সুতরাং গন্ধদ্রব্য নিকটে থাকিলে, মানবমাত্রেই গন্ধ পাইয়া থাকে। গন্ধ-দ্রব্য নিকটে না থাকিলে, গন্ধ পাওয়া যায় না। এইরূপে যে গন্ধজ্ঞান হয়, তাহা পার্থিব গন্ধ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যখন কোন গন্ধদ্রব্য নিকটে থাকে না, এবং দূরবর্ত্তী কোন পদার্থ হইতেও অনুরূপ গন্ধ নিকটে আসার সম্ভাবনা দেখা যায় না, তখনও কোনও কোনও মানবে কোন কোন রূপ

বিশেষ গন্ধ পাইয়া থাকে; এইরূপে যে গন্ধ পাওয়া যায়, তাহাকেই আমরা ভৌতিক গন্ধ বলিতেছি, এবং এইরূপ কয়েকটি ঘটনার আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের বিষয় হইতেছে। ভৌতিক গন্ধকে আমরা ইংরাজীতে Psychic Odour বলিলে বলিতে পারি।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিকৃতি ঘটিলে, লোকে ভাক্ত বা মিথ্যা গন্ধ পাইয়া থাকে। রোগবিশেষে এরূপ মিথ্যা গন্ধ পাওয়ার কথাও শুনা যায়; সেরূপ গন্ধের কোন দ্রব্যই নিকটে নাই, অথচ রোগী এক প্রকার গন্ধে বড়ই কষ্টানুভব করিতেছেন বলিয়া জানাইতেছেন। তন্ত্রোক্ত মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ ও সম্মোহন নামক ষট্ কর্ম্ম-সাহায্যে লোককে এইরূপ মিথ্যা গন্ধ অনুভব করান যাইতে পারে। কোন মানবের চৈতন্যশক্তি বা জ্ঞানশক্তিকে বশীভূত করিয়া, তাহা চাপিয়া রাখিয়া, তাহার স্থলে আপনার জ্ঞানশক্তিকে বসাইয়া, সেই মানবকে যাহা অনুভব করিতে বলিবে, তাহার পঞ্চেন্দ্রিয় সেইরূপই অনুভব করিয়া থাকে; কিন্তু সেইরূপ অনুভবের যথার্থ কোন কারণ থাকে না, ইহাকে বশীকরণ বলা যায়। হিপ্‌নটীজম্ ইহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক নাম হইতেছে। আবার মানবের সমস্ত চৈতন্যশক্তিকে বশীভূত না করিয়া, তাহার কোন একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মাত্র যে জ্ঞান লাভ হয়, সেই ইন্দ্রিয়সংক্রান্ত মস্তিষ্কের অংশটুকু মাত্র আবৃত রাখিয়া, সেই অংশ হইতে যে নাড়ী বা স্নায়ু ইন্দ্রিয়পথ পর্য্যন্ত আসিয়াছে তাহাকে আপন ইচ্ছায় চালিত করাও হইয়া থাকে; ইহাকে স্তম্ভন বলা যায়; দৃষ্টিস্তম্ভন করিয়া বাজীকরে কত প্রকার খেলা আমাদের দেখাইয়া থাকে। এই প্রকারে যদ্যপি কোনও মানবের গন্ধবহা নাড়ীকে বশীভূত, স্তম্ভিত করিয়া মস্তিষ্কের গন্ধজ্ঞান লাভ করিবার সংক্রান্ত অংশের স্তম্ভন করা যায়, তবে সেই মানবকে যে গন্ধ অনুভব করিতে বলা যাইবে, সে সেই গন্ধই

পাইতে থাকিবে, গন্ধদ্রব্য তাহার নিকটে রাখিবার আবশ্যকতা হইবে না। মিথ্যা গন্ধ অনুভবের এও একটি কারণ-বিশেষ হইতেছে।

কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় যে, মানবকে কেহ সম্মোহিত, স্তম্ভিত বা হিপ্‌নটাইজ্‌ করে নাই, অথচ মানব এমন কোন বিশেষরূপ গন্ধ পাইতে থাকে, যে গন্ধ সে স্থানে অনুভব করিবার কোন কারণই নাই। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, এইরূপ বিনা কারণে কোন স্থানে প্রচুর সদ্‌গন্ধ পাওয়া যাইতে থাকিলে, সেই স্থানে সেই সময়ে কোন দৈবশক্তি বা কোন সিদ্ধ সাধুবিশেষের আবির্ভাব হইয়া থাকিবে। ঐ বিশ্বাস অমূলক নহে। পূজনীয় ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ পাঠে জানা যায় যে, তিনিও এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস, আমাদের মত অন্ধ বিশ্বাস নহে। তিনি অতীন্দ্রিয়দর্শী ছিলেন, আমাদের চক্ষুর অগোচর বিষয় তাঁহার দৃষ্টির ভিতর ছিল। দেব দেবী, সিদ্ধ মহাপুরুষদের দর্শন তিনি পাইতেন। সাক্ষাৎ ভাবে ইহাঁদের সহিত তাঁহার বাক্যালাপ পর্য্যন্ত হইত। একদা তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাত্রি এগারটার পর হইতে চারিটা পর্য্যন্ত সাধন করিবার প্রশস্ত কাল। অন্যান্য হেতুর মধ্যে তিনি বলিয়াছিলেন যে এই সময়ে অনেক দেবগণ ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণে বাহির হইয়া থাকেন। সাধনকার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে তাঁহাদের কাহারও নজরে পড়িয়া যাইলে, তাঁহারা সাধককে কৃপা করিয়া যান। এই কৃপালাভে সাধকের অনেক উপকার হইয়া থাকে। তাহার কোনরূপ স্থায়ী উন্নতিও হইয়া যাইতেও পারে। তৎকালে এই সকল মহাপুরুষদের বা দেবতাদের সাক্ষাৎ দর্শন না পাইলেও, অনেকে নানাবিধ সুগন্ধ অনুভব করিয়া থাকে। এইরূপ সুগন্ধ দ্বারা উঁহাদের আবির্ভাব বুঝিতে পারা যায়। পূজনীয় গোস্বামী মহাশয় যখন ভৌতিক-গন্ধ-প্রাপ্তি হইতে মহাপুরুষদের সান্নিধি জ্ঞান করিতে

উপদেশ দিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে আর আমাদের সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না।

সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা কর্ণেল্ অল্‌কট্ মহাশয়:এইরূপ ভৌতিক গন্ধ সম্বন্ধে Old Diary Leaves নামক গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। অল্-কট্ মহোদয় আমাদের হিমালয়স্থ কোন ঋষিবিশেষের শিষ্য ছিলেন। জীবন্মুক্ত কয়েকজন ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সূত্রে পরিচয়ও ছিল; অনেক মহাত্মা তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। তিনি বলেন যে, হিমালয়ের উপরিদেশে যে ঋষিসঙ্ঘ আছেন, তাঁহাদের চন্দনের গন্ধ অতিশয় প্রিয়; তাঁহাদের আবির্ভাব হইলে চন্দনের গন্ধে সেই স্থান ভরিয়া যায়। কোন স্থানে ভৌতিক চন্দনগন্ধ কেহ পাওয়ার কথা তাঁহাকে জানাইলে, তিনি অনুমান করিতেন যে, সেই স্থানে হিমালয়স্থ উক্ত ঋষিবৃন্দের কাহারও উপস্থিতি ঘটিয়াছিল।

মান্দ্রাজের থিয়জফিক্যাল্ সোসাইটী নামক মহাসমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী এবং হিমালয়স্থ ঋষিবৃন্দের একান্ত প্রিয় শিষ্যা ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাট্-স্কির হস্তের তালু হইতে বিনা কারণে এই চন্দনগন্ধ প্রচুর পরিমাণে বাহির হইত। তিনি ইচ্ছা করিলে, তরল চন্দন তাঁহার হস্ত হইতে বাহির করিয়া অন্যকে দিতে পারিতেন। এই চন্দনসার যাঁহারা পাইতেন, তাঁহাদের নিকট অবিকৃত অবস্থায় এই গন্ধ বহুকাল পর্য্যন্ত রহিয়াছে। তালু হইতে এরূপ চন্দন-নির্য্যাসের স্রাব হওয়ার বিষয় আর কোথাও দেখা বা শুনা যায় না। ইঁহার মস্তকের উপরের একটি সিকি-প্রমাণ স্থান হইতেও ঐরূপ গন্ধ পাওয়া যাইত। একদা তিনি আপনার এক-গুচ্ছ কেশ জনৈক সাধক ষ্টেণ্টন্ মোজেস্‌কে উপহার দিয়াছিলেন, ঐ গুচ্ছে উক্তরূপ চন্দনগন্ধ ছিল। বিশ বৎসর পরে কর্ণেল অল্‌কট্ তাঁহার গ্রন্থে চিত্র সন্নিবেশিত করিবার জন্য এই কেশগুচ্ছের ফটো-চিত্র লইতে

ইচ্ছুক হইয়া, সেগুলি চাহিয়া আনান; তদবধি এইগুলি তাঁহার নিকট রহিয়া গিয়াছে। এখনও তাঁহাতে চন্দনেরগন্ধ সমান ভাবে রহিয়াছে। এস্থানে বলিয়া রাখা উচিত যে, মাডাম্ ব্যাভাটস্কি কখনও পার্থিব চন্দন ব্যবহার করেন না। এমতে এই চন্দনগন্ধ পার্থিব চন্দনের গন্ধ নহে। পার্থিব চন্দনের গন্ধ এরূপ স্থায়ী হইতেও পারে না'। অল্‌কট্ মহোদয় বলেন, প্রকৃত ভক্ত, সাধু, সন্ন্যাসী প্রভৃতিদের মধ্যে এই ভৌতিক গন্ধ ঘ্রাণের ঘটনা সচরাচর হইয়া থাকে।

ষ্টেণ্টন মোজেস্ (Stainton Moseyn M. A. oxon) নামক জনৈক বিলাতী সাধুর জীবনেও আমরা এইরূপ ভৌতিক গন্ধসম্বন্ধে অনেক ব্যাপার দেখিতে পাই। ইনি অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ, এবং একজন সুপণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ইঁহার উপর ভগবানের অশেষ দয়া ছিল। ধর্ম্মপিপাসা প্রবল থাকায়, ইনি বিদ্যালাভের পর গির্জ্জার পুরোহিতের কার্য্য করিয়া ধর্ম্মশিক্ষালাভে তৎপর হন। তাঁহার অসুস্থতাবশতঃ ঐ কার্য্য হইতে তাঁহাকে অবসর লইতে হইল। পৈতৃক ভূমিসম্পত্তি সমুদ্রগর্ভে গত হইয়া তাঁহার বিষয়-বাতনা দূর করিয়া দিল। তিনি বিনা চেষ্টায় এক জন মাধ্যমিক (medium) হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রায়শঃই আবেশ হইত। এই অবস্থায় তাঁহার দেহে অনেক উন্নত আত্মার আবির্ভাব হইত। তাঁহারা অনেক তত্ত্বকথা ইঁহার মুখ দিয়া ব্যক্ত করিতেন। এই সকল আত্মাদের ইনি দেখিতে পাইতেন এবং ইঁহাদের সহিত সজ্ঞানে কথাও অনেক সময় হইত। শেষে তাঁহার লিপিসিদ্ধ অবস্থা হয়। এই অবস্থায় তাঁহার আবেশ হইত না, তিনি সজ্ঞানে চেয়ারে বসিয়া বন্ধু-বান্ধবের সহিত কথা কহিতেছেন বা কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন,

অথচ অপরদিকে তাঁহার বাম হস্তে ক্রমাগত লেখা হইতেছে, অনেক সময় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা করিয়া অনেক লেখা হইত ; শেষ হইলে, তিনি কি লেখা হইল দেখিতেন। ইহাতে তাঁহার যে সকল সন্দেহ মনে উদয় হইত, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বিষয় সুমীমাংসা আবশ্যক বলিয়া কয়েকদিন যাবৎ চিন্তিত ছিলেন, সেই সকল তত্ত্বের মীমাংসা ও অন্যান্য অনেক নূতন কথা এইরূপ লেখায় প্রকাশ হইত। এইরূপ লেখা হইবার সময় কে লেখাইতেছে, তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন।

একদা কর্ণেল্ অল্‌কট্ ম্যাডাম্ ব্যাভাট্‌স্কির তালুনিঃসৃত তরল চন্দন-স্রাবে তুলা ভিজাইয়া ; ঐ তুলা ষ্টেণ্টনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই গন্ধ তুলা পাইয়া ষ্টেণ্টন্ কর্ণেলকে এইরূপ পত্র লেখেন ;—"ইহা ভারত-বর্ষীয় চন্দনের গন্ধ, এই গন্ধ আমার বিশেষ পরিচিত। আমাদের চক্রে যখন কোন উন্নত আত্মা আসেন, তখন আমরা এই গন্ধবান্ বায়ু সেবন করি, কখনও তরল চন্দনসারও পাইয়া থাকি। যে বাটীতে একবার এইরূপ চক্রে বসিয়া উন্নত আত্মার আবির্ভাব হইত ও চন্দনগন্ধ পাওয়া যাইত, সেই বাটীতে চক্রভঙ্গের পরও দুই তিন দিন এই গন্ধ থাকিয়া যাইত। ওয়াইট্ দ্বীপে ডাক্তার ষ্টিয়ারের একখানি বাটী আছে, সেখানে অবস্থান কালে একবার চক্রে এইরূপ গন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। পরে আমরা লণ্ডনে চলিয়া আসি ও সেই বাটী বন্ধ থাকে। ছয়মাস পরে পুনরায় সেই বাটী খোলা হইল, তখনও পূর্ব্ববৎ তীব্র মাত্রায় চন্দনের গন্ধ পাওয়া যাইতে লাগিল। আপনি বলেন, হিমালয়স্থ ঋষিদের এই চন্দনগন্ধ হইতেছে ; ইহাতে অনুমান হয়, উক্ত মহাপুরুষগণ প্রায়ই আমার সন্নিকটে আসিতেছেন। আমার বাসগৃহ এই গন্ধে ভর-পূর, আমার দেহ এই গন্ধে পূর্ণ হইয়াছে, আমি এই গন্ধ ঘ্রাণ করিতেছি, খাইতেওছি, আমার সকল জিনিষেই এই গন্ধ হইয়াছে। আমার মাথার

তালুর উপরিস্থিত পয়সা-পরিমাণ একস্থান হইতে এই গন্ধ বাহির হইতেছে; এই গন্ধ এত তীব্র যে, প্রায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমার এক বন্ধু আমাকে একটি গোলাপ ফুল দিয়াছিলেন, সেই গোলাপটি আমার হাতে থাকিতে থাকিতে অল্পক্ষণ পরেই কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল ও তাহা হইতে গোলাপের পরিবর্ত্তে চন্দনের গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। এই গোলাপ ও তাহার চন্দনগন্ধ এখনও রহিয়াছে।” খৃষ্টীয়ানবংশজাত সাহেবের উপর আমাদের ঋষিদের এইরূপ অযাচিত কৃপা ও হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সাধনাদি না করিয়াও, কেবলমাত্র সত্যনিষ্ঠ থাকিয়া—সচ্চরিত্র থাকিয়াই ঋষিকৃপায় এইরূপ উন্নত অবস্থা লাভ, হিন্দু আমাদের ভাবিবার বিষয় বটে।

শ্রীমতী এলিজাবেথ্ সেভার্স্ নামক ইংরাজমহিলা থিয়জফিষ্ট্ পত্রে নিজ জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি ভৌতিক গন্ধ সম্বন্ধে এইরূপ বলেন;—“থিয়জফিষ্ট্ হইবার পূর্ব্বে অলৌকিক ঘটনা আমার জীবনে আদৌ ঘটে নাই। থিয়জফিষ্ট্ হইলাম, নিরামিষ খাওয়া আরম্ভ করিলাম, মধ্যে মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার অনুভব হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম অলৌকিক বর্ণদর্শন ও ভৌতিক গন্ধের ঘ্রাণ পাইতাম। ধ্যানকালে নানাপ্রকার বর্ণ দর্শন হইত। গন্ধঘ্রাণ যখন তখনই পাইতাম। একদা ইউরোপ হইতে ফিরিতেছি, পথকষ্টে শারীরিক ক্লান্তি ও সাংসারিক ব্যাপারে মানসিক উদ্বেগ আমাকে অতিশয় কাহিল করিয়াছে, এমন সময়ে অনুভব করিলাম, যেন একখানি সুগন্ধের মেঘ আসিয়া আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এরূপ প্রচুর সুগন্ধ সেখানে পাইবার কোনও উপাদান ছিল না। আর একবার ইয়র্ক মিনিষ্টার্ নামক স্থানে কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। দেহ ও মন বেশ প্রকৃতিস্থ ছিল, মনে কোনরূপ ধর্ম্মভাব—ভক্তিভাব থাকে নাই। অকস্মাৎ সুন্দর পুষ্পগন্ধ পাইতে লাগিলাম; মনে হইল—যেন

কোন পুষ্পবাটিকার নিকটে রহিয়াছি; দারুণ গ্রীষ্মে এইরূপ সুন্দর পুষ্পগন্ধে মনের যেরূপ শান্তিবোধ হয়, আমারও সেইরূপ শান্তিবোধ হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যখন ভৌতিক গন্ধ পাইতাম, তখন কেবল ধূপ, ধূনা, গুগ্‌গুল প্রভৃতিরই গন্ধ পাইতাম। এবার পুষ্পের গন্ধ পাইয়া মনে হইল, নিকটে কোথাও ফুল আছে কি না দেখিতে হইল, পুষ্পের অনুসন্ধানে বাহিরে যাইলে, পুষ্পগন্ধ আর পাইলাম না, পুষ্পের নির্দ্দেশও পাইলাম না, পুনরায় পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেই পূর্ব্ববৎ পুষ্পগন্ধ আসিতে লাগিল। এই স্থানে গন্ধবান্ কোন দ্রব্য ছিল না, কেবল কতকগুলি বসিবার কাষ্ঠাসন ছিল মাত্র। বোধ হয়, এই স্থানে বসিয়া কোন মহাপুরুষ ভগবদারাধনা করিয়া থাকিবেন, তাহার ফলে এই স্থানের বায়ু এইরূপ সুগন্ধ হইয়া রহিয়াছে।"

আমার কোন নিকট আত্মীয়া, ইনি এক্ষণে আমার নিকটেই আছেন বিশেষ উন্নত অবস্থা নহে, সংসারে থাকিয়া স্বামী পুত্র পালন করা, গৃহস্থালীর কার্য্য করা—যেমন সাধারণ স্ত্রীলোকে করিয়া থাকে,ইনিও সেইরূপে জীবন যাপন করেন। ইহার তিন পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছে। প্রথম পুত্রটি যখন গর্ভে ছিল, তখন ইনি চাঁপাফুল ও বেলফুলের গন্ধ প্রায়ই পাইতেন। এই গন্ধ শুধু নিজে যে, পাইতেন তাহা নহে ; বাটীর সকলেই অনুভব করিতেন প্রায়ই সন্ধ্যার পর হইতে মধ্যে মধ্যে গন্ধ পাওয়া যাইত। বাটীর খিড়কী ঘাটে যাইবার পথের পার্শ্বে থাকিয়া একদিন সন্ধ্যায় বেশ পরিষ্কার বেলফুলের গন্ধ আমি প্রায় পাঁচ মিনিট কাল পাইতে লাগিলাম। সে সময় সেই স্থানের এক মাইলের মধ্যে বেল-ফুলের গাছ নাই ও খিড়কিতে বিশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বাটীর যাবতীয় আবর্জ্জনা ফেলা হইয়া আসিতেছে, ঘাটপথের অপর পার্শ্বে বাটীর ছেলেদের মলমূত্র-ত্যাগের স্থানে ও খিড়কী পুকুরটি একটি পানা-বুজান

পচা পুকুর। এই ঘাটপথ দিয়া তিনি বাটীতে প্রবেশ করিতেছিলেন, গন্ধ পাইয়া আমাকে জানাইলেন, এইরূপ গন্ধ প্রায় প্রত্যহই তিনি পাইতেছেন। ঐ প্রথম গর্ভাবস্থায় বাটীর শয়নঘরে ও মধ্যে মধ্যে চম্পকপুষ্পের গন্ধ পাওয়া যাইত। একদিন রাত্রি দশটার সময় আমাকে ঐরূপ গন্ধ ঘ্রাণ করিতে বলায় আমিও কয়েক মিনিট ধরিয়া চম্পক গন্ধ পাইতে লাগিলাম। নিজের জানা চতুর্দ্দিকেই বহু দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলে, চম্পক বৃক্ষ মিলিবে না। শুনিলাম, গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় মাস হইতেই এইরূপ গন্ধ অনেক সময় ঘরে বাটীর দর দালানে ও ছাদের উপরি যাঁহারা শয়ন করিতেন, তাঁহারাও পাইতেন; তবে গন্ধ পাইবার সময় আমার কথিত আত্মীয়াটী নিকটে থাকিতেন বা সেই মাত্র সেইস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এই অবস্থায় এই গন্ধ পাওয়া যাইত। প্রথম প্রথম এইরূপ গন্ধ পাইয়া ইঁহার মনে ভয় হইত। যাহাকে উপস্থিত পাইতেন, জানাইতেন এবং তিনিও সেই গন্ধ অনুভব করিতেন। এই গর্ভে পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর আর ওরূপে ভৌতিক গন্ধ ঘ্রাণ হইত না। গর্ভের নবম মাসে ইনি পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন, তথায় তিনি কোনরূপ ভৌতিক গন্ধ পাইতেন না। এইবারে চন্দনের গন্ধও মধ্যে মধ্যে তিনি পাইয়াছিলেন, তবে সে সময় আমি নিকটে না থাকায়, অনুভব করিবার সুযোগ পাই নাই।

ইঁহার দ্বিতীয়বার গর্ভিণী হইবার পর মাত্র দুই তিন বার উক্তরূপ ভৌতিক গন্ধ তিনি পাইয়াছিলেন মাত্র। এবারে চন্দনগন্ধ আদৌ পান নাই। তৃতীয় পুত্র গর্ভে থাকা কালে তিনি আমার হাবড়ার বাটীতে ছিলেন। গর্ভের প্রায় অষ্টম মাসে একদিন রাত্রে প্রায় ৮টার সময় বাটীর ছাদে মাছ কুটিতে কুটিতে নানাপ্রকার পুষ্পের গন্ধ পাইতে লাগিলেন; তৎকালে বাটীর চাকর তাঁহার নিকটে ছিল, সেও পাইতে লাগিল।

আমি রুগ্ন শয্যায় পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের ভিতর ছিলাম ; আমার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত গন্ধ আসিয়াছিল ; নিজের উত্থানশক্তি না থাকায় উক্ত গন্ধ আঘ্রাণ করাতে ঘটিয়া উঠিল না। প্রথমতঃ ইহাতে তাঁহার মনে ভয় হইয়াছিল ; পরে তাঁহার গর্ভাবস্থা ও পূর্ব্ব গর্ভের সময়ের ব্যাপার স্মরণ হওয়ায় ভয় দূরে গেল। ইঁহার চতুর্থ গর্ভে কন্যা সন্তান হইয়াছে ; এ গর্ভ থাকা কালে কোনরূপ ভৌতিক গন্ধ তিনি পান নাই।

ইঁহার প্রথম সন্তানটির বয়স দশ বৎসর হইয়াছে। ইহাতে কোনরূপ বিশেষত্ব কিছুই দেখা যায় নাই। তবে এই বালকটি গর্ভে থাকা কালে কেন যে চন্দনাদির গন্ধ পাওয়া যাইত, তাহার বিষয় কিছুই মীমাংসা করিতে পারি না। দ্বিতীয় পুত্রটী পঞ্চম মাসে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তৃতীয়টীর তৃতীয় বৎসর চলিতেছে, এবং কন্যাটির দশম মাস উত্তীর্ণ হইয়াছে। এক্ষেত্রে কেনই যে তিনি গর্ভকালে উক্তরূপ গন্ধ পাইতেন, অপর সময়ই বা পান না কেন, ইহার সম্বন্ধে কিছুই বিশেষ বলা যায় না।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলকারক-প্রেতযোনি।

সে আজ অনেক দিনের কথা, আমি তখন জন্মিয়াছি কি না সন্দেহ, আমার পিতা তখন পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ ছিলেন ; তিনি এই সবে মাত্র ময়মনসিংহ জেলায় বদলি হইয়াছিলেন। তিনি একদিন গভীর রাত্রিতে জনৈক ইন্স্পেক্টার্ সহ পরিদর্শনার্থে বহির্গত হইয়াছেন। ইন্স্পেক্টার্ মহাশয়ের নাম শশিশেখর বাবু এখন তিনি পেন্সন প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার পিতা ও ইন্স্পেক্টার্ বাবু ঘোটকারোহণে একটী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া গমন করিতেছেন। পথটী প্রশস্ত, কিন্তু দৈর্ঘ্যে অপরিমেয়। পথটী

একটী সমুন্নত ভূখণ্ডের উপর ও খরস্রোত ভৈরবনদের তটে অবস্থিত। সেই পথিপার্শ্বে মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ দুই একটা বৃক্ষ পথের অপর দিকে বিস্তীর্ণ জলাভূমি ও শ্যামল ক্ষেত্র প্রকৃতির অঞ্চলরূপে বর্ত্তমান। সেদিন গভীর অন্ধকারময় হওয়ায় তাঁহাদের সঙ্গে সার্চ্চ্ লাইট্ ছিল। তদ্দ্বারা তাঁহারা পথের চারিধার দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছিলেন। এইরূপে তাঁহারা একটী সমুন্নত বৃক্ষ অতিবাহিত করিবার পর যেন কাহার আহ্বান শুনিলেন। তাঁহারা ঘোটকদ্বয়কে স্থির করাইলেন। আলোটী বৃক্ষের দিকে ফিরাইয়া ধরিলেন ও দেখিতে পাইলেন যেন জনৈক কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ফিরিবার জন্য অনুনয় করিতেছে। ইহা শুনিয়া তাঁহারা রিভলভার দ্বারা গুলি করিলেন কিন্তু কিছুই লক্ষিত হইল না। কেবল ইহা দেখিয়া শশী বাবু বলিলেন—ওহে ওটা একটী ভূত, চল তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটাইয়া দিই।" যেমনি বলা, অমনি কার্য্যারম্ভ। কিয়ৎদূর গমন করিয়া ঘোটক নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইল আর তো অগ্রসর হয় না। পিঠে শত সহস্র কষাঘাত চলিল তবুও পূর্ব্ববৎ। সার্চ্চ লাইট ফিরাইয়া তাঁহারা যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদের সমস্ত শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল। তাঁহারা এখন মৃত্যুর শুভাগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ওটা কি, কি বিষম দুর্গন্ধ। এই বুঝি তাঁহাদের জীবন যায়—না না নীচে পড়িল পশ্চাদ্ভাগে ওটা কি যেন একটী পশু। তাঁহারা পুনর্ব্বার ঘোটক ছুটাইয়া দিলেন। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ যাইবার পর সম্মুখে প্রকাণ্ড একটী দ্বাররক্ষক আসিয়া সেলাম করিল। তাঁহারা ঘোটক স্থির করাইলেন। দ্বাররক্ষক বলিল—"মহাশয় আমি আপনাদের ঋণ পরিশোধ করিলাম। শশীবাবুআপনি ইহার জন্য প্রাণ পাইলেন। ইনি এক সময় আমার প্রাণদান করিয়াছিলেন তাই অগু একটী সামান্য পশুর রূপ ধরিয়া ব্যাঘ্রকে তাড়াইয়া দিয়াছি। আমি। কে আপনা-

দের ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই আমি আপনাদের বিশ্বাসী লোক ছিলাম এখন আমি এই হইয়াছি।” আমার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি হইয়াছ?” উত্তর হইল “শুনিয়া কাজ নাই,” তারপর সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

অষ্টম অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

২। স্বপ্নে ভবিষ্য-জ্ঞান।

“স্বপ্নে ভবিষ্য-জ্ঞান”—আমাদের এই নামকরণটি বেশ সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ নিদ্রিত মানবের যে অবস্থায় ভবিষ্য ঘটনার জ্ঞান বা দর্শন হয়, তাহাকে কোনওরূপে স্বপ্নাবস্থা বলা যায় না। আমরা এ কথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার স্থূল বা জাগ্রত চৈতন্যকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য, হয়তঃ মানব-জীবাত্মা সুষুপ্তি-অবস্থায় কোনও একটি ভবিষ্য-ঘটনা স্বয়ং দর্শন করিয়া, তাঁহার স্থূল মস্তিষ্কে সেই অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়া দেন। পূর্ব্বে আমরা ইহার উদাহরণও দিয়াছি। কখনও বা এমন হয় যে, জীবাত্মা স্বয়ং ইহা দর্শন করেন না; কোনও মহাপুরুষ বা অপর কোনও সুপ্ত মানব, কোনও ভবিষ্য ঘটনা দর্শন করিয়া, তাহার বা অপর কোনও মানবের বা জগতের কল্যাণ জন্য, তাহার নিদ্রাবস্থায় এই ঘটনার পরিচয় দেন; তাহার জীবাত্মা সেই অনুভূতি পর্য্যায়ক্রমে তাহার স্থূল মস্তিষ্কে অবভাসিত

করিয়া দেন।* আমরা ইহাও বলিয়াছি যে, সকল সময়ে, মানব জাগরিত হইলে, সেই প্রবেক্ষণ সম্পূর্ণভাবে স্মৃতিতে থাকে না। ইহা কেন হয় তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। † ইহা দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করে—যিনি সুপ্ত-চৈতন্যাভিমানী, যিনি অধিদৈব বা (Individuality) তাঁহার অভিব্যক্তির ও মানবের সূক্ষ্ম স্থূলাদি শরীরের বিকাশের উপর। সুপ্ত অবস্থায় যে জ্ঞান লাভ করেন, যে ভবিষ্যদর্শন করেন, তাহা যদ্যপি ঠিক স্বাধিকৃত করিতে না পারেন, যদ্যপি তাহা স্বপ্রকৃতিস্থ করিতে না পারেন, যদ্যপি তাহা কেবল বাহ্য বিষয়ভাবে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে, তিনি ইহা সূক্ষ্ম বা স্থূল চৈতন্যে সম্পূর্ণভাবে সঞ্চারিত করিতে পারেন না; তাঁহার নিজের ভিতরই জ্ঞানটি সম্পূর্ণরূপে ফুটে নাই, তিনি আবার তাহা অন্যকে কিরূপভাবে দিবেন? তাহার পর দেহ বা শরীর গুলিকে স্বায়ত্তে লইয়া আসাও বড় সহজ কথা নহে; তাহা ও অভিব্যক্তির ফলে কালে সংসাধিত হয়। এইত গেল চৈতন্যের কথা। শরীরের অভিব্যক্তি বা বিকাশের উপরও এই স্মৃতি অনেকটা নির্ভর করে। মলিন মুকুরে যেমন প্রতিবিম্ব ঠিক পড়ে না, দেহ অপবিত্র হইলে জ্ঞান-জ্যোতির সেরূপ ভাবে স্ফুরণ হয় না। চঞ্চল, বাত্যা-বিক্ষোভিত ঊর্ম্মি সমাকুল নদী বক্ষে যেমন চন্দ্র প্রতিবিম্ব বিভক্ত ও বিচূর্ণিত হইয়া যায়, যেমন পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্ব অন্তর্হিত হয়, কেবল অবশিষ্ট থাকে কিরণমালীর কিরণজাল, সেইরূপ নানা বাসনা বা চিন্তা-বিধ্বস্ত মানব-মানসে, তাহার সূক্ষ্ম-মস্তিষ্কে অধিদৈবের বা সুপ্ত চৈতন্যাভিমানীর ভবিষ্য-ঘটনা-চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা বিফল হইয়া যায়, মানব জাগরিত হইলে জাগ্রৎ চৈতন্যে অপ্রভেদ্য

---

* অলৌকিক রহস্য ৪র্থ ভাগ ৫৪৩ পৃঃ।

† অলৌকিক রহস্য ৪র্থ ভাগ ৪৬৫ পৃঃ।

বিক্ষিপ্ত কিরণ-জালরূপ কেবল একটা অতি অস্পষ্ট অতি অপরিস্ফুট একপ্রকার "স্মৃতি-বিভ্রম" অবশিষ্ট থাকে।

যাঁহারাই স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় ও ঘটনাবলী পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, ইহার কতকগুলি পুরুষত্ব-হিসাবে অতিশয় আবশ্যক অতএব সুপ্ত চৈতন্যাভিমানী বা (Individuality) অধিদৈবের, তাহা জাগ্রৎ চৈতন্যে কেন সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণ সহজে অনুমিত হয়; যেমন হয়ত কোনও পরমাত্মীয়ের আসন্ন মৃত্যুর ভবিষ্যৎ চিত্র; হয়ত অবশ্যম্ভাবী কোনও মহাবিপদের পরিচয়। কিন্তু, আমার এমন অনেক ভবিষ্যৎ দর্শন হয়, যাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, যাহা অতি অনাবশ্যক। ইহাদিগকে স্থূল মস্তিষ্কে সঞ্চারিত করিয়া দিবার কি উদ্দেশ্য, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় না। হয়ত উহারা বহু ঘটনাবলি-সমন্বিত কোন ভবিষ্যৎ দৃশ্যাবলি-সংশ্লিষ্ট খণ্ডাংশ মাত্র। স্থূল মস্তিষ্ক সমগ্র চিত্রটিকে ধারণা করিয়া রাখিতে পারে নাই; ইহার অনাবশ্যক কোন একটি অংশকে কেবলমাত্র স্মরণে রাখিয়াছে।

এই যে, প্রাক্-দর্শন ঘটে, তাহা অনেক সময় কোনও সংভাব্য বিপদ-বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য। কখন কখন আমরা বিপদের এইরূপ পূর্ব্বাভাস বা পূর্ব্ব সংবাদ পাইয়া, সতর্ক হই, সাবধানে কার্য্য করি এবং বিপদ আসিলে, তাহা হইতে মুক্ত হই। কিন্তু অধিক সময়েই আমরা আমাদিগের অন্তর্যামীর এই প্রকার নিদেশ বাক্যকে গ্রাহ্য করি না, "স্বপ্ন অলীক" বলিয়া তাহা উপেক্ষা করি; অথবা তাহা উপেক্ষা না করিলেও, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিতে পারিয়া, সেই আশু বিপদকে প্রতিরোধ করিবার আমাদিগের সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। যখন সুপ্তানুভূতি প্রকৃততঃ সম্মুখীন হয়, তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া,

অনন্তোপায়ে তাহাতে আত্মসমর্পণ করি ও অনুতপ্ত হইয়া মনোবেদনার বোঝা বাড়াইয়া তুলি। আবার কখন কখন এমনটিও হয়, যে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শক্তির উপর আমাদিগের কোনও ক্ষমতা নাই তাহাদিগের দ্বারা বাধিত ও প্রহত হইয়া আমাদিগের ক্ষুদ্র চেষ্টা বিফল হয়, আমরা বহু আয়াসেও সম্মুখীন বিপদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি না। প্রারব্ধ কর্ম্ম-ফল-শক্তি ব্যাধের মত পুরুষকারকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। আমরা এতৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি তাহা দ্রষ্টব্য।*

আমাদিগের বর্ত্তমানালোচিত স্বপ্ন-বিভাগের উদাহরণের অভাব নাই। আশা করি আমার চিন্তাশীল পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকের নিজ নিজ জীবনে তাহা ঘটিয়াছে বা বিশ্বস্ত সূত্রে তাহা অবগত আছেন। যদ্যপি তাঁহারা অনুগ্রহ ও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তৎবৃত্তান্ত অলৌকিক রহস্য কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে লেখকের প্রচুর উপকার করা হইবে।

সে যাহা হউক, আমরা বলিতেছিলাম যে সকল স্বপ্নের উদাহরণের অভাব নাই। আমার জীবনে ও আমার পরিচিতের ও আত্মীয়বর্গের মধ্যে এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। এরূপ ঘটনার কথা মধ্যে সাধারণ বার্ত্তাবাহী পত্রিকায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। ডেলি নিউস্ পত্রিকায় (The Indian Daily News) কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা ইটালি নিবাসিনী এক গোয়ালিনীর স্বপ্নের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। বৃদ্ধা নিশা শেষে স্বপ্ন দেখিল যে, তাহার পর্ণকুটীরে অগ্নি-সংযোগ হইয়াছে; সব ভস্মীভূত হইতেছে, কিছুতেই অগ্নির প্রকোপ নিবারিত হইতেছে না; অনল ভীষণ অসুরের মত বিরাট মুখ-ব্যাদান করিয়া সমস্তই গ্রাস করিতে

* অলৌকিক রহস্য।

উদ্যত; মানবের সকল চেষ্টা, বিজ্ঞানের বিরাট উদ্যম সমস্তই ব্যর্থ হইবার উপক্রম; শ্রাবণের বারিধারা প্রায় যন্ত্রাদি সাহায্যে যে জলবর্ষণ হইতেছিল, তাহাতে অগ্নির প্রকোপ নিবারিত না হইয়া যেন ঘৃতাহুতির মত তাহার শরীর পোষণ করিতেছিল। প্রথমে একখানি কুটীরে অগ্নি সংযোগ হয়, এখন সমগ্র লোকালয় একটি বিশ্বগ্রাসী যজ্ঞ-কুণ্ডে পরিণত হইল। বৃদ্ধা কোনও ক্রমে জীবন রক্ষা করিল; কিন্তু, সন্তান অপেক্ষা তাহার প্রিয় ও পরম "আত্মীয়" গো-বৎসগণ, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায় স্বরূপ, তাহার শ্যামলী ধবলী; তাহাদিগকে কিরূপে উদ্ধার করিবে? তাহারা যে গো-শালায় বন্ধনদশায় আছে! তাহাদিগের বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া, গো-শালার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারিলে তাহার হয়ত আত্ম জীবন-রক্ষা করিতে পারিত! এই চিন্তার যন্ত্রণা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। সে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল এবং তাহার নিদ্রাও ভঙ্গ হইল। সে তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া, কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, তাহার গো-শালার দিকে, তাহার কুটীরপটলাভিমুখে নয়ন নিক্ষেপ করিল। বুঝিল, প্রকৃতত: অগ্নি-সংযোগ হয় নাই; সে অগ্নি-সহযোগের স্বপ্ন দেখিয়াছিল মাত্র। কিন্তু, এই ভীষণ স্বপ্ন তাহার এরূপ মর্ম্ম-স্পর্শী হইয়াছিল যে, সেইদিন নিশাকালে শয়ন করিবার পূর্ব্বে, সে গো-শালে যাইয়া ধেনুবৎসগণের বন্ধন মোচন করিয়া দিল, গো-শালের দ্বার উন্মুক্ত রাখিল। কিন্তু, সে রাত্রি-শেষেও সেই স্বপ্ন সেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড, সেই গো-বৎসগণের দাহ-চিত্র। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ শয্যা-ত্যাগ করিয়া গো-গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল এবং তাহারা নিরাপদে আছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রত্যাগত হইল। আবার রজনীতে শয্যাগমনের পূর্ব্বে পূর্ব্বরাত্রের মত তাহাদিগের বন্ধন মোচনাদি করিয়া রাখিল। রজনী শেষে, আবার সেই স্বপ্ন এবং বৃদ্ধার উৎকণ্ঠিত মনে সেইরূপ পর্য্যবেক্ষণ।

এইরূপ উপর্য্যুপরি সে তিন দিন প্রতি রজনীতে স্বপ্ন দেখিয়াছিল এবং প্রতিদিন জাগরিত হইয়া দেখিত যে দাহকাণ্ড প্রকৃত নহে, তাহা স্বপ্ন মাত্র। তত্রাচ তাহার মনে একটা ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল,—সে যে বার বার এই একই স্বপ্ন দেখিতেছিল, ইহার মূলে একটা কোনও সত্য অবশ্য নিহিত আছে; হয়ত অগ্নিকাণ্ড অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাকে সতর্ক করিয়া রাখিতে যেন ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া এইরূপ স্বপ্নদান করিয়াছেন।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া বৃদ্ধা আর সে (চতুর্থ) রজনীতে নিদ্রা যাইল না। তখন প্রায় একটা বাজিয়াছে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কোলাহলময়ী সতত উদ্দামবতী কর্ম্মরতা নগরী যেন ক্ষণিক শান্তির জন্য নিদ্রিত; এমন সময় উৎকণ্ঠা-পরায়ণা নিদ্রাহীনা বৃদ্ধার সতর্কিত নাসা-রন্ধ্রে যেন গৃহদাহের তীব্রগন্ধ প্রবেশ করিল। এটা কি ভ্রম? তাহার উত্তেজিত অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের অলীক কল্পনা না,একপ্রকার জাগ্রত স্বপ্ন? উত্তরোত্তর সেই দুর্গন্ধ তীব্রতর হইতে লাগিল; সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিল। তাহার কুটীরের পশ্চাতে সন্নিহিত অপরের পর্ণ-শালে অগ্নি-সংযোগ হইয়াছে। অগ্নি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; অনল-শিখা যেন অতি সন্তর্পণে উদ্গত হইতেছে, ভয়ে ভয়ে, পাছে কেহ তাহার তস্কর বৃত্তি দেখিতে পায়, সমগ্র কুটীর-পল্লী ভস্মীভূত করিয়া তাহার জঠর-জ্বালা-নিবারণ-প্রয়াসে বাধা দেয়। সেই কুটীরের অধিবাসিগণ এখনও নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে; কাল যে তাহাদিগের মস্তকোপরি সমাসীন হইয়া, তাহার মহতী ধ্বংসলীলার সূত্রপাত করিয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গ ও তাহারা এখনও জ্ঞাত নহে।

বৃদ্ধা অনল-শিখা দর্শনে স্বপ্ন বুঝি সফল হইল, এই ভাবনায় বিহ্বল হইয়া, ভীত ত্রস্ত হইয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। সেই বিকট

রবে, সুপ্ত রজনীর শান্তি ভঙ্গ করিয়া, সেই উচ্চনাদে, চতুর্দ্দিক হইতে, সেই স্থান নরনারীপূর্ণ হইয়া গেল; দিগন্ত কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে অগ্নি প্রলয়কালীন করাল মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাঁহারা অগ্নি দর্শন করিয়াই সকলের সমবেত চেষ্টায় গো-বৎস, বালক-বালিকাগণ অতি কষ্টে নিরাপদ স্থানে রক্ষিত হইল। বহু উদ্যম ব্যর্থ করিয়া বহু আয়াসে এবং যন্ত্রাদি সাহায্যে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক সেই অনলের ভীষণ লীলা উপশমিত হইয়াছিল। বৃদ্ধা যদ্যপি এই ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার বিষয় পূর্ব্ব হইতে না জানিয়া তাহার জন্য কোনও রূপে প্রস্তুত হইয়া না থাকিত, তাহা হইলে হয়ত অনেক প্রাণীর সংহার হইত। এ কথা সেই কালে সকলেই বলিয়াছিল।

এইরূপ সকল স্বপ্নের বহু উদাহরণ, সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহার স্থানাভাব, এবং বহু উদাহরণের প্রয়োজনীয়তাও দেখা যায় না; কারণ সকলেরই সেরূপ স্বপ্নবৃত্তান্ত অন্ততঃ দুই একটি শুনা আছে। আমার কোনও আত্মীয় পরিচিত কাহারও মৃত্যু ঘটিবার পূর্ব্বে তাহার আভাস স্বপ্নে দেখিতে পান। এমন অনেকবার দেখা গিয়াছে যে, তিনি যে ব্যক্তির মৃত্যু বিষয়ে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তিনি হয়ত তখন (স্বপ্নের সময়) নিরাময়, নির্ব্রণ, সুস্থ ও সবল। তখন তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার যে আশু মৃত্যু ঘটিবে এ কথা কিছুতেই কাহারও অনুমিত: হইত না। অথচ দেখা গিয়াছে তাঁহার স্বপ্ন অলীক নয়; তাহা প্রত্যেক বিষয়ে সত্য। কখনও কখনও তিনি রূপক ভাবে জাগ্রত মস্তিষ্কে সেই ভাবী ঘটনা ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; কখনও বা এরূপ দেখা গিয়াছে যে, ব্যক্তির মৃত্যুচিত্র দেখিয়াছেন, ঠিক তাহার মৃত্যু না হইয়া অপর কোনও ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিল; কিন্তু সেই মৃত্যু স্বপ্নের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আর যে যে বিষয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা মুমূর্ষুর মৃত্যুর সময় যেরূপ বিকৃত বা শান্তমূর্ত্তি

হইত তাহার শেষ কথা পর্য্যন্ত স্বপ্ন-দৃষ্ট চিত্রের সহিত প্রকৃত ঘটনা ঠিক মিলিয়াছে। কথনও বা মৃত্যুর সময়ের শেষে চিত্রখানি প্রতি বর্ণে স্বপ্ন দৃষ্টের সহিত এক হইয়াছে ;—যে যে লোকে তথায় উপস্থিত ছিল ; সে সময় তাহারা যাহা যাহা কার্য্য করিয়াছিল ; যে আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল সকলগুলিই যেন স্বপ্নচিত্রের পুনরাভিনয়।

অলৌকিক রহস্যে মধ্যে মধ্যে সকল স্বপ্নের বিবরণ বাহির হইয়াছে। কৌতুহলী পাঠক পাঠিকা পাঠ করিলে তৎসমস্ত জ্ঞাত হইতে পারিবেন। আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় চৌধুরী ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া যে ডেকার (D' Acre) সাহেবের মাতুলানীর বারংবার "নৌকা ডুবির স্বপ্ন" * সেনাপতি টরেন্‌স পত্নীর "সিপাহী বিদ্রোহের ভীষণ স্বপ্ন," † "নিগ্রো ভৃত্য কর্ত্তৃক তাহার প্রভু পত্নীর গুপ্ত হত্যার স্বপ্ন" ‡ লিখিয়াছেন। এ সকলগুলিই অধ্যাপক এবার ক্রম্বি (Prof. Aber Crombie) বিরচিত Intellectual Powers নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। এই স্বপ্ন তিনটিতে ভবিষ্যৎ ঘটনা স্পষ্টরূপে সূচিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়াও সব সময়ে যে তাহা খণ্ডন করা যায় না তাহাও প্রমাণিত হই-তেছে। সিপাহী কর্ত্তৃক কাপ্তেন টরেন্‌স—জামাতা কাপ্তেন হেসের হত্যা পূর্ব্ব হইতে স্বপ্ন জানিতে পারিয়াও, কিছুতেই তাহা প্রতিরোধ করিতে পারা গেল না। অবশ্য কাপ্তেন হেসের পুত্র কন্যাদি সকলে নিরাপদ হইল ; স্বপ্ন না দেখিলে হয়ত তাহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইত। কিন্তু কথনও কথনও চেষ্টা করিয়া স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা আমরা নিবারিত করিতে

---

* অলৌকিক রহস্য, ১ম ভাগ, ৩৮৬ পৃঃ।

† অলৌকিক রহস্য ২য় ভাগ ৩০০ পৃঃ।

‡ অলৌকিক রহস্য ২য় ভাগ ৩০১ পৃঃ।

পারি, যেমন নিগ্রো ভৃত্য কর্ত্তৃক বৃদ্ধার হত্যা, নৌকাডুবি হইতে ডেকা-রের প্রাণরক্ষা ইত্যাদি।

এইরূপ অনেক দেশী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত আমার বন্ধু মাখন বাবু "স্বপ্নে গুরুলাভ" শীর্ষক একটি সুন্দর স্বপ্ন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কলিকাতা নিবাসী তাঁহার জনৈক সাধন-পিপাসু বন্ধু ও আত্মীয়ের কিরূপে স্বপ্নে গুরু সন্দর্শন হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত। স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন, বহুকাল পরে তাহা ঘটিয়াছিল, স্বপ্নদৃষ্ট সেই আশ্রম, স্বপ্নে ট্রেণ হইতে যে ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াছিলেন, দীক্ষাকালে তথায় যে যে লোক ছিল সকলই ঠিক। * অবশ্য স্বপ্নদর্শনের পূর্ব্বে তিনি সে স্থানে কখনও যান নাই বা সেরূপ লোক কখনও দেখেন নাই। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃ-দেব সুপ্রসিদ্ধ রাধিকাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনীর মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস সম্বন্ধীয় যে দুইটী স্বপ্ন-বৃত্তান্ত অলৌকিক রহস্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই দুইটীই উল্লেখ যোগ্য। † শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমার আত্মীয় এবং তিনি অনেকের সুপরিচিত। অতএব স্বপ্নের সত্যতা সম্বন্ধে ও আমাদিগের পূর্ব্বলিখিত সন্দেহ করিবার কারণ দেখিনা। অধ্যাপক এবার ক্রশ্বি সংগৃহীত ডেকারের (D' Acre) জীবনে যেরূপ ঘটিয়াছিল, বীরভূমের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি পরলোকগত ৺ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনে ঠিক সেইরূপ একটি ঘটনা হইয়াছিল। যখন যিনি কলিকাতার মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, আমি তাঁহার নিজ মুখে ইহা শুনিয়াছিলাম। তখন তিনি, বোধ হয় (আমার ঠিক

---

* অলৌকিক রহস্য ২য় ভাগ ৩০২ পৃঃ।

† অলৌকিক রহস্য ১ম ভাগ ৩৮৭-৩৯১।

এখন স্মরণে নাই) পূর্ব্ববঙ্গে কোন স্থানে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এক রাত্রে তাঁহার মাতা স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার (অমৃত বাবুর) পিতা আসিয়া তাহার সম্মুখে এক নদীবক্ষে মহা ঝটিকায় অভিনয় চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। ঝটিকায় দারুণ প্রকোপে নদীবক্ষ বিলোড়িত হইতে লাগিল; তাহার ভৈরব ঘাত-প্রতিঘাতে জলরাশি ত্রস্ত হইয়া সৈকত ভূমিতে আশ্রয় লইবার জন্য ঝাপাইয়া পড়িতে লাগিল। নদী সন্নিহিত বৃক্ষরাজি পবনবেগে আসিয়া নদীগর্ভে পতিত হইতে লাগিল। নদী বক্ষঃস্থিত তরণী অচিরে জলমগ্ন হইয়া গেল। তাহার মধ্যে একটি দৃশ্য অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী। একখানি সুবৃহৎ বাষ্প-পোত বাত্যাতাড়িত ঘূর্ণমান, তাহার কর্ণ নদীবক্ষে ভাসমান বৃক্ষগুল্মে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আরোহিবর্গের সকলে জীবন-আশা পরিত্যাগ করিয়াছে। যাত্রীদিগের মধ্যে একজনকে দেখিয়া বৃদ্ধা স্তম্ভিতা হইলেন। তিনি আর কেহ নন বৃদ্ধার নয়নমণিঅমৃত বাবু। তাঁহাকে তথায় দেখিবামাত্র তিনি হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার পরদিন অমৃত বাবু আদালত হইতে প্রত্যাগত হইয়া বলিলেন, বিশেষ কার্য্যানুরোধে তাঁহাকে পরদিন ষ্টিমার করিয়া কোনও দূরস্থানে যাইতে হইবে অতএব সমস্ত দ্রব্য যেন প্রস্তুত রাখা হয়। বৃদ্ধা ইহা শুনিয়া অধীর হইয়া বলিলেন, "আমি যে মর্ম্মঘাতী স্বপ্ন দেখিয়াছি। তোমার এবার কিছুতেই যাওয়া হইবে না।" এই বলিয়া তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। মাতার আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার জলপথে যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল। তিনি স্থলপথে যাত্রা করিলেন। তাহার পরদিন প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইল। যে ষ্টিমারে তিনি যাত্রা করিতেন, তাহা জলমগ্ন হইয়াছিল এবং বহু আরোহীও তাহার সহিত জলমগ্ন হয়।

এইবার আমরা ষ্টেড্ সাহেব কৃত "রিএল গোষ্ট ষ্টোরিজ" নামক *

* Real Ghost Stories by Mr. W. T. Stead page 77.

পুস্তক হইতে একটী সফল স্বপ্নের বিষয় উল্লেখ করিয়া এই বিভাগ শেষ করিব।

এই বৃত্তান্তের স্বপ্নদ্রষ্টা বিলাতের একটি বৃহৎ কারখানার কর্ম্মকার ও প্রধান মিস্ত্রী। সেই কারখানায় স্রোতশ্চালিত যন্ত্র সাহায্যে কার্য্য হইত। সেই যন্ত্রের প্রধান চক্রখানি একটু বিশৃঙ্খলীকৃত হইয়া গিয়াছিল। সেই প্রধান মিস্ত্রী তাহা জানিত, এবং ইহার জীর্ণ সংস্কার করিতে হইলে ইহা যে, তাহারই তত্ত্বাবধানেই হইবে ইহাও সে জানিত। সে এক রজনীতে স্বপ্ন দেখিল যেন পরদিন কারখানা বন্ধ হইবামাত্র, তাহার অধ্যক্ষ আসিয়া আদেশ করিলেন যে, সেই দিনেই সেই চক্রখানির সংস্কার করিতে হইবে। সেই সংস্কার ব্যাপারে কিছু জটিলতা ছিল; অতএব তাহাকেই তাহা করিবার ভার প্রদত্ত হইল। সে যেন আদেশ মত চক্রনেমীর উপরিভাগে আরোহণ করিলে, অতি সাবধানে কার্য্য করিতে করিতে দৈববশে তাহার পদস্খলিত হইয়া ঘূর্ণমান দুইখানি চক্র মধ্যে জড়িত হইয়া গেল। বহুকষ্টে তথা হইতে তাহাকে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া আনা হইল, তখন সে জ্ঞানশূন্য। তাহার পর সে যেন কোনও বৃহৎ হাঁসপাতালে নীত হইল। তথায় পদচ্ছেদন হইল এবং বহুদিন পরে সে যেন আরোগ্য হইল, কিন্তু চির জীবনের তরে তাহার এক পদ নষ্ট হইয়া রহিল। এই হইল স্বপ্নবৃত্তান্ত।

কর্ম্মকার শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই তাহার পত্নীকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল এবং দুইজনে রামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, সেই দিন সন্ধ্যার সময় সে কর্ম্মস্থল হইতে কোনও ক্রমে সরিয়া পড়িবে।

সেই দিবসের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই অধ্যক্ষ আদেশ করিলেন যে, দিবাবসানে দৈনিক কার্য্যান্তে সেই চক্রখানির জীর্ণ সংস্কার করিতে হইবে, এবং কার্য্যটি জটিল বলিয়া তাহার ভার সে প্রধান কর্ম্মকারের উপরই

ন্যস্ত হইল। সে কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়াছে যে সে তাহার বহুপূর্ব্ব কার্য্যস্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইবে।

মধ্যদিবার কার্য্যান্তে সে কর্ম্মস্থল হইতে সঙ্গোপনে বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক বনমধ্যে লুক্কায়িত হইল। সে তথায় অতি সন্তর্পণে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে এমন সময় দেখিতে পাইল যে, একটি দুর্বৃত্ত তস্কর, তাহাদিগেরই নিমকুঠির অতি যত্নে সংস্থিত কাষ্ঠখণ্ড অপহরণ করিয়া পলাইতেছে। সে দেখিবামাত্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। সেই কাষ্ঠখণ্ডগুলি এত আবশ্যক যে সে গুলির উদ্ধার করিতে যাইয়া, তাহার পূর্ব্ব রাত্রের স্বপ্ন বিবরণ এবং তৎসংক্রান্ত তাহার সঙ্কল্প ও তদনুযায়ী কার্য্যস্থান হইতে তাহার পলায়ন সেই সময়ে ইহার কিছুই তাহার স্মরণে আসিল না। সে সেই তস্করকে লাঞ্ছিত করিয়া কাষ্ঠখণ্ডগুলি উদ্ধার করিয়া মহানন্দে তাহার পূর্ব্ব পরিত্যক্ত কার্য্যালয়ে একেবারে অধ্যক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠিক সেই সময়ে তথাকার দিবসের কার্য্য শেষ হইয়াছে মাত্র এবং কার্য্যাধ্যক্ষ জীর্ণ চক্র-খানির সংস্কার করিবার জন্য তখন তাহারই অন্বেষণ করিতে ছিলেন। এমন সময়ে সেই কর্ম্মকার ধৃত তস্করের সহিত দুষ্প্রাপ্য ও আবশ্যক কাষ্ঠ-খণ্ড লইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। এখন তাহার সংজ্ঞা আসিল, তাহার স্বপ্নবৃত্তান্ত ইত্যাদি স্মরণে আসিল। কিন্তু আর কোনও উপায় নাই; তাহাকে অবশ্য সেই চক্রসংস্কারার্থে জটিল চক্রজালের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল।

স্বপ্ন বিষয় স্মরণে রাখিয়া সে অতি সন্তর্পণে কার্য্য করিতে লাগিল। কিন্তু প্রারব্ধ খণ্ডন করিবার শক্তি কাহার আছে? তাহার পদস্খলিত হইল এবং ঠিক সেইরূপ স্বপ্নানুভূতি হইয়াছিল, দুইখানি চক্রমধ্যে তাহার চরণ আবদ্ধ হইয়া পেষিত হইল। অপরাপর কর্ম্মচারী সাহায্যে যখন

সে ভূতলে নীত হইল, তখন তাহার কোনও সংজ্ঞা নাই। সে এই অবস্থায় ব্রাডফোর্ড হাঁসপাতালে (Bradford Infirmary) রক্ষিত হইল। তথায় তাহার এক পদচ্ছিন্ন (ampufated) করা হয়। যাহা যাহা স্বপ্নে সূচিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই প্রতি বর্ণে ঘটিয়াছিল। আমরা এই উদাহরণে দেখিলাম যে বহু চেষ্টা ও স্বপ্ন দৃষ্টান্ত অবশ্যম্ভাবীকে রোধ করা গেল না। আবার কখন কখন যে ইহাকে রোধ করা যায় তাহাও দেখিয়া আসিলাম।

কর্ম্মফল বারিত হইতে পারে কিনা, মানবের ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন বা তাহা কর্ম্মাধীন ইত্যাদি বিষয় আমার পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহা দ্রষ্টব্য।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কর্ম্মানুসারে জীবের গতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৯)

সাধারণতঃ মানুষ যাহা কিছু করে তাহা হয় সংস্কার বশে না হয় অভ্যাস বশে। সংস্কার ও অভ্যাস লইয়া মানুষের কর্ম্মময় জীবনের অস্তিত্ব। সুতরাং মানব জীবনে এই দুইটী জিনিষ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চিন্তার বিষয়। যেহেতু আমাদের কর্ম্মের উৎপাদক কারণ (Cause) উহাদের দুইটীর মধ্যে একটী হইবেই।

---

* অলৌকিক রহস্য ৪র্থ ভাগ ৪৬৪—৪৭০ পৃষ্ঠা।

সংস্কার ও অভ্যাসের লক্ষণ, প্রকৃতি ও শক্তি সম্বন্ধে আমরা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে অথচ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে সংস্কার বা স্বভাব (Nature) বা অদৃষ্ট বা দৈব বা নিয়তি (Predestination) জিনিষটা প্রাক্তন (Innate) বা পূর্ব্ব জন্মের এবং অভ্যাস (Habit) বা পুরুষকার (Free-will) জিনিষটা ইহ জন্মের। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে এই সংস্কার বা দৈবসাধারণতঃ, অভ্যাস পুরুষকার অপেক্ষা বলবান; কিন্তু কখন কখন এই অভ্যাসের শক্তি এত প্রবল হয় যে, সংস্কারকে পর্য্যন্ত অভ্যাসের কাছে হার মানিতে হয়।

আমরা উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছি যে "স্বভাবোমূর্দ্ধি বর্ত্ততে"—অর্থাৎ স্বভাব বা দৈবই বলবান বা "স্বভাব না যায় ম'লে"—স্বভাব কখন বদলায় না।

আমরা আবার ইহাও উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়াছি যে অভ্যাস কখন কখন এত প্রবল হয় যে সংস্কারকে ছাপাইয়া উঠে বা পুরুষকারে দৈবকে নষ্ট করিতে পারে। সংস্কৃত হিতোপদেশে এই জন্ম দেখিতে পাওয়া যায়—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্রদোষঃ ॥

অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষই ভাগ্যবান হয়, এবং কাপুরুষেরাই কেবল বলে বরাতে থাকে ভাগ্য ফিরিবে; দৈবকে নষ্ট করিয়া আপন শক্তি প্রকাশ কর, যত্ন করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয়, তবে তাহাতে দোষ কি?

আমরা কর্ম্মের যে দুইটী বিভাগ সংস্কার ও অভ্যাস অনুসারে করিয়াছি তাহাই দেবীভাগবতে তিন প্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে যথা,: (১) সঞ্চিত

(২)বর্ত্তমান ও (৩) প্রারব্ধ এবং ইহার প্রত্যেকর আকার তিন তিন প্রকার যথা,—সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক।

দেবীভাগবতের তিন প্রকার কর্ম্মের কথা আমরা ১৩১৯ সালের চৈত্র সংখ্যায় সরলভাবে বুঝাইয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরুক্তি নিস্প্রয়োজন।

এথম আমরা একটী নূতন প্রসঙ্গ আলোচনা করিব। আমরা এখন দেখিব কর্ম্মানুসারে পরলোকে জীবের কিরূপ গতি হয়। এই পরলোক-তত্ব আলোচনার সময় আমরা প্রথম মহর্ষি ব্যাস-প্রণীত ও মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য টীকা উদ্ভাসিত বেদান্ত মত গ্রহণ করিয়া জটিল কর্ম্মরহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বেদ হইতে বেদান্তে প্রবেশ, স্থুল হইতে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম লইতে ক্রমে সূক্ষ্মতমে হইয়াছে। বৈদিক পরলোকতত্ব হইতে আমরা বৈদান্তিক পরলোকতত্বে, স্থুল হইতে সূক্ষ্মের বিকাশ দেখিতে পাইব।

বৈদিক সময়ে শব অগ্নিতে দগ্ধ করা সাধারণ নিয়ম ছিল, কিন্তু কদাচিৎ মৃত্তিকায়ও মৃতদেহ প্রোথিত করা হইত। উভয় স্থলেই মৃত-দেহের উপর আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা জানাইবার জন্ম অগ্নি ও পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতে শবের ক্লেশ না হয় তজ্জন্যই এই প্রার্থনা।

আবার অগ্নি যখন মৃতদেহকে দগ্ধ করে, তখন কোন কোন অঙ্গ বাহিরে পড়িয়া রহে। যখন পরলোকে অগ্নি দেহের সকল অঙ্গ পুনরায় সংযোজিত করিবেন, তখন পাছে অদগ্ধ অঙ্গটী অগ্নিদেব সংযোজিত না করেন, তজ্জন্য অগ্নিদেবের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে মৃত ব্যক্তি পরলোকে যাইয়া পত্নী পুত্র প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবীর ভোগের ন্যায় ভোগে রত

হন। কেবল পরিবার বর্গের মিলনের কথা নহে, গৃহ পালিত পশুরাও পরলোক যাইয়া মৃতব্যক্তির সহিত মিলিত হয়। সুতরাং বৈদিক সময়ে ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে কোন বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৈদান্তিক যুগে স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্মের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য বেদান্তে জ্ঞানানুরূপ দেহপ্রাপ্ত, কামনানুরূপ লোকপ্রাপ্তি, দেখিতে পাওয়া যায়। পিতৃলোকে স্বাপ্নিক শরীর গন্ধর্ব্বলোকে সূক্ষ্ম শরীর, পরমাত্মায় জীবের চিন্ময় শরীর, ব্রহ্মলোকে ছায়া ও জ্যোতির ন্যায় উহার স্থিতি বেদান্তে বর্ণিত হইয়াছে।

বৈদিক সময়ে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে মৃতব্যক্তি লোক-লোকান্তরে ভ্রমণ করে। এই সকল লোক-লোকান্তর পৃথিবীর মত পৃথিবীলোক নহে। সুতরাং বৈদিক অনুষ্ঠানে মনুষ্যলোক হইতে মনুষ্যের লোকান্তরে পুনরাবৃত্তি হয়, বেদান্ত এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন, বেদান্ত যে পুনরাবৃত্তি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি ব্যতীত আর কিছু নহে।

ব্রাহ্মণ-বিভাগে বহুলোকের বর্ণনা আছে। এই সকল লোক সূর্য্যের নিম্নে অবস্থিত এবং পৃথিবীর ন্যায় মনুষ্যলোক। সূর্য্যের উদয়াস্ত পৃথিবীর ন্যায় ঐ সকল লোকে নিয়মিত সময়ে হইতেছে। এজন্য ঐ সকল লোকের অধিবাসিগণ একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না, এক লোক হইতে তাহাদিগকে অন্য লোকে যাইতে হয়। কারণ, দিন রাত্রি কাটিলেই ঐ সকল নষ্ট হয়, সুতরাং তাহাদের অধিবাসিগণ এক অবস্থায় থাকিতে সমর্থ নয়।

ব্রাহ্মণ বিভাগের এই বিশ্বাস বেদান্ত যে গ্রহণ করিয়াছেন, ছান্দোগ্য স্পষ্ট বাক্যে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন বৃহদারণ্যকও ঐ কথা বলিয়াছেন †।

---

* ৩।৬।৮। † ৮।২।১৬

"সে লোক হইতে কর্ম্ম করিবার জন্য জীব এ লোকে আসে—"এখানকার "এ লোক" যে পৃথিবীলোক, মনুষ্যলোক, তাহা স্বয়ং বৃহদারণ্যকই, "আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে পৃথিবী", এই কথা বলিয়া কিছুমাত্র সন্দেহ রাখেন নাই।

বৈদিক ক্রিয়াকলাপ যাহারা অনুষ্ঠান করে, পুষ্করিণী খনন ও অতিথিশালা স্থাপন প্রভৃতি পুণ্যকার্য্য যাহারা করে, তাহাদের লোকান্তরে ভ্রমণ হয়, ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক চিরদিনের জন্য সেখানে বাস হয় না, বেদান্ত এই কথা বলিয়া বেদের অবমাননা করেন নাই। বেদান্ত সিদ্ধ উপাসনা অবলম্বন করিয়া যে গতি হয়, সে গতিতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, দিব্য লোকে নিত্যকাল বাস হয়।

এখন বৈদান্তিক পরলোকতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে এই মুখ্য অপুনরাবর্ত্তনী গতিরই উল্লেখ প্রয়োজন।

অপুনরাবর্ত্তনী গতি দুইপ্রকার। প্রথমটীতে যদিও পৃথিবীলোকে পুনরাগমন হয় না, তথাপি ইচ্ছামত বিবিধ দিব্যলোকে ভ্রমণ হইয়া থাকে। এই প্রকার গতিতে সেই সেই দিব্যলোকের ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ হইয়া থাকে। যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া গৃহীর ধর্ম্ম আচরণ করেন, সত্যপালন ও ব্রহ্মচর্য্যারক্ষা করেন, তাঁহারাই এইরূপ স্বেচ্ছামত দিব্যলোক সমূহে ভ্রমণ করিতে অধিকারী হন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল যাঁহারা ছলনা কপটতা আচরণ না করেন, তাঁহাকেই অপুনরাবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মলোকে স্থিতি করেন। কারণ, সত্যস্বরূপ, সত্যের পরম নিধান যিনি, তাঁহাকে পাইবার জন্য এক সত্যই উপায়। সত্যের দ্বারা সমস্ত জয় করিয়া জীবের দেবভাব প্রাপ্তি হয়। রসস্বরূপ পরব্রহ্মে স্থিতিতে জীবের সর্ব্বদুঃখ ও ভয় দূর হইয়া থাকে। এ অবস্থায় সাধক অণুমাত্রও বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্য রসস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। রসস্বরূপ উপাস্য দেবতার

সহ ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের যে কি দশা হইত, তাহা তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত পড়িলেই জানা যায় এবং রসস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে সমগ্র জীব ও সমগ্র জগতের সহিত একাত্মতা উপস্থিত হয়। এই একাত্মতায় পরব্রহ্মে নিত্য আনন্দ সম্ভোগ করিয়া সাধক কৃতার্থ হন।

বেদান্ত অনন্ত জীবন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ওঙ্কারাবলম্বনে আকাশ-স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনায় পর পর উৎকৃষ্ট জীবনলাভ হয়, ইহাই বেদা-ন্তের প্রতিপাদ্য। বেদান্ত আরও দেখাইয়াছেন যে, ক্ষুদ্র জীবের ক্রমো-ন্নতিগতিতে অনন্তত্ব প্রাপ্তি সম্ভব।

শোভাদাতা ও সর্ব্বপ্রকাশক বলিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিলে, শোভা ও দীপ্তি প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে এবং জীবনান্তে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দেবপথে ব্রহ্মপথে উপাসককে ব্রহ্মসন্নিধানে লইয়া যান এবং জীবকে আর মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না। এই দেবপথে ক্রমে যে প্রকারে আরোহণ হয়, বেদান্ত তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এ, বি, এল্।

ভূতযোনি।

ভূত দেখিব বলিয়া অনেক দিন মনের একটা সাধ ছিল। ভূতের কাহিনী অনেক পড়িয়াছি, অনেক শুনিয়াছি' কিন্তু কখনও প্রত্যক্ষ করার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। আজ চারি মাস হইতে গৌহাটী সহরের অপর পারে প্রায় ১৪ মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরস্থিত সোয়ানকুচি গ্রামে একটা ভূত প্রতি রাত্রে লোকের সহিত কথা বলে এবং সময় সময় লোকের উপর দৌরাত্ম্য করে, এরূপ শুনিয়া আসিতেছি। প্রতি রাত্রে শত শত লোক গিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে। সহরের এত নিকটে হইলেও, এত দিন তথায় যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয় নাই। সোয়ানকুচি গ্রাম-নিবাসী প্রাচীন উকিল শ্রীযুক্ত সোনারাম দাস নিজে এক রাত্রে ভূতের কাণ্ড কারখানা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট বৃত্তান্ত শুনিয়া, আমারও যাইবার জন্য উৎকণ্ঠা জন্মে।

বিগত ২৬শে পৌষ অপরাহ্ণ বেলা ৩ ঘটিকার সময় আমি ও আমার কনিষ্ঠ তৃতীয় সহোদর শ্রীমান্ বরদাচরণ সেন উভয়ে নৌকাপথে রওনা হইলাম। সন্ধ্যার একটু পরে ৬ ঘটিকার সময় ঐ গ্রামে পৌছিয়া আমরা রাত্রে যে স্থানে অবস্থান করিব, তথায় বিছানা আদি রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া ঐ স্থানের উদ্দেশ্যে চলিলাম। আমাদের বাসা হইতে ঐ স্থান প্রায় ১॥ মাইল ব্যবধান হইবে। পথে আমাদের সঙ্গে প্রায় ১৫।১৬ জন লোক জুটিল এবং নানা লোকের নিকট নানাপ্রকার কথা শুনিতে লাগিলাম। কেহ বলিল, আজ কাল ভূত প্রতিদিন আসে না, কখন আস্‌বে, তাহার স্থিরতা নাই। কেহ বলিল, এখন ভূত মোটেই আসে না, ভূতের কার্য্যকলাপ সমস্ত

থামিয়া গিয়াছে। যখন রাত্রে এত দূর কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছি, তখন ঐ স্থানটা না দেখিয়া ফিরা হইবে না, এরূপ সঙ্কল্প করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাত্রি প্রায় ৭॥ ঘটিকার সময় ঐ স্থানে পৌছিলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম, রহমতী নাম্নী একটী স্ত্রীলোক একখানি কুঁড়ে ঘরে তাহার সন্তানাদি লইয়া বাস করিতেছে। সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে অগ্নি জালিয়া রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত আছে। বেড়ার ফাঁক দিয়া, ঘরের মধ্যে কি হইতেছে অনেকটা দেখা যায়। শুনিলাম, ভূত আসিয়া নাকি উহাকে সম্বোধন করিয়া নানা কথা বলে। রহমতীকে আমরা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় সেও অনেক কথা বলিল; পূর্ব্বে গৌহাটীর যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম, তাহার অনেক কথাই সত্য বলিয়া ব্যক্ত করিল। আজ ভূত আসিবে কি না জিজ্ঞাসা করায় রহমতী বলিল, পূর্ব্বে প্রত্তি রাত্রে আসিত, কখনও ২।৩ বারও আসিত এবং সময় সময় দিনেও আসিত; কিন্তু এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় আসে না; তবে যে দিন আসিবে না, তৎপূর্ব্ব দিন বলিয়া যায়। গত রাত্রিতে প্রায় ৯ ঘটিকার সময় আসিয়াছিল। আজ আসিবে না, এরূপ বলে নাই; কাজেই আজ আসিবার সম্ভাবনা আছে। রহমতীর ঘরের পার্শ্বস্থিত একটী অপ্রশস্ত গ্রামিক পথের পূর্ব্ব দিকে বলো নামক এক ব্যক্তির বাড়ীর উঠানে আমরা সকলে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছি। লোক প্রায় বিশ জন, রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী; সকলেই উৎকণ্ঠিত মনে প্রতীক্ষা করিতেছি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর রাত্রি যখন ৮ টা ২০ মিনিট, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম দিক্ হইতে গরুর বাছুরের শব্দের ন্যায় "ব্যাঁ" এইরূপ একটী ক্ষীণ ধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর হইল। ক্রমে ঐ ধ্বনি অগ্রসর হইয়া রহমতীর ঘরের অনুমান ১০ হাত ব্যবধানে দক্ষিণপশ্চিম কোণে রাতিবড়ী নাম্নী আর একটী স্ত্রীলোকের ঘরের পশ্চাতে থামিল।

একটু পরে ঐ স্থান হইতে আর একটী ঐরূপ "ঝ্যা" শব্দ হইল। আমরা বলো নামক যে ব্যক্তির উঠানে ছিলাম, সে বলিল—এই আসিয়াছে, আপনারা কেহ কথা বলিবেন না। প্রায় ২ মিনিট আর কোন সাড়া শব্দ নাই। তৎপরে ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় একটা বিকট শব্দ হইল, প্রায় ২ মিনিট এইরূপ শব্দ হইতে থাকে। বলো বলিল—উলুলু দিতেছে। ঐ শব্দ থামিয়া গেল; আর কিছুক্ষণ নীরব। পরে শুনিলাম ঐ স্থানে যেন ২টী বিড়াল ঝগড়া করিতেছে। প্রায় ২ মিনিট পরে এই শব্দ থামিয়া গেল। ইহার পরে রহমতীকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতে লাগিল। কথাগুলি সমস্ত আসামীয়া ভাষায়; পাঠকগণের সুবিধার জন্য বাঙ্গালাতে কথাগুলি অবিকল দেওয়া হইল।

বিড়ালের ঝগড়ার শব্দ থামার প্রায় এক মিনিট পরে এইরূপ শব্দ হইতে লাগিল।

"লহমতী, লহমতী, লহমতী, লহমতী।" চা'র বার ডাকার পর ঘরের ভিতর হইতে রহমতী উত্তর দিল—"কি হইয়াছে?"

অদৃশ্য বাণী "আমি আজ বলোর একটা হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছি, তুমি জান। বলো নিকটেই ছিল, আমার কি করিল?—"

এই কথার পর আধ মিনিট নীরব নিস্তব্ধ। তার পর আবার অদৃশ্য বাণী বলিতে লাগিল।

আমি সেদিন বাদ্য বাজাইয়াছিলাম তুমি শুনিয়াছিলে কি?

রহমতী গালাগালি দিয়া বলিল,—"তুমি বড় বাজাইয়াছিলে।" ইহার পর আর কিছুক্ষণ থাকিয়া অদৃশ্য বাণী আবার বলিল—

"আমি আজ চেনেহীর কাপড় টানিব মনে করিয়াছিলাম, তাহাকে না পাইয়া রাতিবড়ীর আঁচল ধরিয়া টানিয়াছি।

রাতিবড়ী ঘর হইতে বলিল,—"আমি সন্ধ্যার সময় চেনেহীর বাড়ী

গিয়াছিলাম, আঁচলটা ভারি ভারি একটু টানমত বোধ হওয়ায়, কিসের টান বুঝিতে পারিলাম না; মনে করিলাম যে, কাপড়টা কোন স্থানে লাগিয়াছিল।” চেনেহা একটী স্ত্রীলোক, রাতিবড়ীর বাটীর লাগ দক্ষিণে বাস করে।

ইহার পরে আবার ধ্বনি হইল—

“আমি একটী স্ত্রীলোককে খাব মনে করিয়াছিলাম, হইয়া উঠিল না।”

রহমতী জিজ্ঞাসা করিল,—“কাহাকে খাবে মনে করিয়াছিলে?” কিন্তু অদৃশ্য বাণী আর কোন উত্তর দিল না।

আবার কিছুক্ষণ থামিয়া অদৃশ্য বাণী বলিল,—“আমি অমুকের (নামটি এখন আমার মনে নাই) বাড়ী যাইতেছি; তোমরা আইস।” ইহার পর নিস্তব্ধ হইল। আমরা প্রায় ১৫ মিনিট অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু আর কোনরূপ ধ্বনি হইল না। বলোকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—“ঐ দিন দিনের বেলা একটা হাঁড়িতে ধান সিদ্ধ হইতেছিল; সে নিকটে বসিয়াছিল; উপরে সিকায় একটা কি টানান ছিল, হঠাৎ তাহা হাঁড়ির উপর পড়িয়া হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া গেল।”

আমরা বলো ও বলোর পুত্র ও রহমতীর নিকট ভূতযোনির পূর্ব্বেকার কার্য্যকলাপ অনেক শুনিলাম। নিম্নে তাহার কয়েকটি প্রদত্ত হইল।

(১) কয়েক দিন পূর্ব্বে রাতিবড়ী একদিন সন্ধ্যার সময় একটি মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া লওয়ার জন্য বলোর বাড়ী আসিতেছিল, রাতিবড়ীর হাত হইতে কে যেন প্রদীপটা ছিনাইয়া লইল। কোন লোক দেখিতে পাইল না, অথচ প্রদীপটা হাতে নাই। বলোর বাড়ী হইতে রাতিবড়ীর বাড়ী অনুমান ৪।৫ হাত প্রস্থ একটি রাস্তা মাত্র ব্যবধান ঐ দিন রাত্রিতে অদৃশ্য বাণী রহমতীকে সম্বোধন করিয়া বলে,—“আজ

আমি রাতিবড়ীর হাত হইতে প্রদীপটা ছিনাইয়া লইয়াছি, তুমি জান?" "আমি অমুক স্থানে রাখিয়াছি, সেখানে গেলে পাইবে।" তৎপরে কয়েক জন লোক ঐ স্থানে গিয়া তল্লাস করিয়া প্রদীপটা পাইল না। সেই রাত্রে আবার ধ্বনি বলিল—"আমি প্রদীপটা দিয়া যাইব।"

পর দিন প্রত্যূষে প্রদীপটা রাতিবড়ীর ঘরের আঙ্গিনায় পাওয়া যায়।

(২) রাতিবড়ীর ১৪।১৫ বয়স্ক একটি ছেলে "পরশু"কে একদিন সন্ধ্যার সময় ঠেলা দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। ছোকরাটা আমার নিকট বলিল যে, "আমার এইরূপ বোধ হইয়াছিল, যেন আমার পিঠে কেহ ধাক্কা দিল, আমি পড়িয়া গেলাম। পরে আমাকে অন্য লোকে ধরিয়া তুলিল। মাটিতে ঘষা লাগিয়া আমার চিবুকে ঘা লাগে।"

ঐ রাত্রে অদৃশ্য বাণী রহমতীকে সম্বোধন করিয়া বলে—"আমি আজ পরশুকে ফেলিয়া দিয়াছি, তুমি জান?"

(৩) আর এক দিন যে স্থান হইতে ধ্বনি হইতেছিল, সেখানে ৪।৫ জন লোক তাড়াইয়া গিয়াছিল এবং ইতস্ততঃ দা ঘুরাইতে থাকে, কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। পরে ঘরের চালের উপর হইতে শব্দ হইতে লাগিল—"রহমতী, রহমতী, আমাকে কুঠারখানা দেও, আমি ইহাদিগকে কাটি।" কিছুক্ষণ পরে ধ্বনি থামিয়া গেল।

হাজো থানার পুলিস কর্ম্মচারিগণ আসিয়া এইরূপ কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া বন্দুক আওয়াজ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। পর দিন রহমতীকে সম্বোধন করিয়া ধ্বনি হয়—

"কাল বন্দুক দিয়া আমার কি করিল?"

এইরূপ প্রায় প্রতিরাত্রেই নানাপ্রকার কাণ্ড হইতেছে।

ধ্বনি যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন ভাল বুঝিতে পারা যায় না। ক্রমে স্পষ্ট হইতে থাকে।

পর দিন সকাল বেলা আমরা, ঐ স্থানটা কিরূপ, দেখিবার জন্য তথায় যাই। যে স্থান হইতে পূর্ব্ব রাত্রে ধ্বনি হইয়াছিল, সে স্থানে কোন বৃক্ষাদি নাই। ৮।১০ হাত দূরে একটী লেবুর গাছ আছে। সমস্ত স্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। রহমতী ঘরের বাহিরে আছে, দেখিলাম। উহার বয়স ৩০।৩৫ বৎসর হইবে. শ্যাম বর্ণ, চেহারা মোটেই সুশ্রী নহে। উহার স্বামী আছে। তাহারা সকলে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে, অন্যত্র উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। আমাকে রহমতী বলিল— "বাবু সরকার হইতে কোন উপায় করিয়া এটাকে তাড়ান যায় না কি ?" আমি বলিলাম,—"সরকার ইহার কি করিবেন ?"

আমি নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ও বিশ্বস্ত লোকের নিকট শুনিয়াছি, তাহা যথাযথ রূপে বর্ণনা করিলাম।

শ্রীকালীচরণ সেন বি, এল,

গোপেশ্বরের চাকুরী।

বহুবিধ ঘটকের সমাগম এবং সত্য মিথ্যা অতিরঞ্জনামিশ্রিত আন্দাজ লক্ষ্য বাক্যব্যয়ে একটী সুশ্রী পাত্রীর নির্ব্বাচন ও উভয় পক্ষের দেনা পাওনা ইত্যাদি অত্যাবশ্যক ও অনাবশ্যক বিষয়গুলির যথাসম্ভব স্থিরীকরণ হইলে, ধার্য্য হইল যে, ক্ষীরোদ বাবু এখনি ছুটী লইয়াই আগামী আষাঢ় মাসে আশীর্ব্বাদাদি ও শুভ লগ্নে ননীগোপালের বিবাহ দিবেন।

গোপেশ্বর তখনো অস্থির; তাহার জিদে ও উত্তেজনায় ক্ষীরোদ বাবু তৎক্ষণাৎ ছুটীর দরখাস্ত পেশ করিলেন।

উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত হইলে গোপেশ্বর কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল, কিন্তু পরক্ষণেই বর্ষার মেঘভার-ঘেরা আঁধারময় আকাশের মত আবার গুরু গম্ভীর ও তমসাচ্ছন্ন।

কি যেন একটা অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত যন্ত্রণা বুকের ভিতর কি একটা গুরু গুরু স্পন্দন, কখনো একটা জ্বালার ন্যায় অন্তর্দাহ, আবার কখনো হৃদয়ের মধ্যে শূন্য আকুলতা, অক্ষিপল্লব আর্দ্র; কখনো উন্মাদের ন্যায় গুম হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া থাকিত, কখনো দূরাগত একটা কাল্পনিক ক্রন্দনশব্দে শিহরিয়া উঠিত, ভয় হইত—অপরং বা কিং ভবিষ্যতি। আবার বুঝি কি একটা অনর্থ ঘটে!

কিন্তু বুঝিতে পারিল না—আবার কি ঘটিবে? যে সর্ব্বস্বান্ত, যার সর্ব্বস্ব গিয়াছে—মাঝ দরিয়ায় ভরাডুবি হইয়াছে—তার আর কি বিপদ ঘটিতে পারে?

শঙ্কা জাগিল—বুঝি বা ক্ষীরোদ বাবুরই কিছু অনর্থ হয়। নিজে দুরদৃষ্ট, তাই ভাবিল—বুঝি বা তাহারই সংস্পর্শে কোন বিপদ ঘটে। সেই জন্য সে তাড়াতাড়ি ননীর বিবাহ দিয়া আশ্রয়দাতার সংস্রব হইতে চিরবিচ্ছিন্ন হইবার নিমিত্ত দ্রুত প্রস্তুত হইতে লাগিল।

প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিল, ক্ষীরোদ বাবু বহির্ব্বাটীতে বসিয়া নিজ মনে ধূমপান করিতেছেন। ক্ষীরোদ বাবু গোপেশ্বরকে দেখিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইলেন। অপরাধী যেমন আপনা হইতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে তেমনি সঙ্কোচে ক্ষীরোদ বাবু গোপেশ্বরের নিকট হইতে যেন নিজেকে দূরে রাখিবার জন্য ব্যস্ত।

তাঁহার এই আকস্মিক ও অভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর ও সঙ্কোচভাব গোপেশ্বরের চক্ষু এড়াইল না, প্রথমে ঈষৎ ব্যথিত হইয়াই চিন্তিত হইল— ইহার কারণ কি ?

ক্ষীরোদ বাবুকে কিছু না বলিয়াই সে ধীরে ধীরে বিধুমুখীর নিকট গমন করিল। আশা, হয়ত তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ের কিছু রহস্য ভেদ হইতে পারে।

বিধুমুখী দূর হইতে গোপেশ্বরকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিলেন। গোপেশ্বর লক্ষ্য করিল যে, তাঁহারও মুখে বিশেষ ভাবান্তর।

সর্ব্বস্ব গিয়াও যাহাদের আশ্রয় করিয়া সে এতদিন ধরণীবক্ষে দাঁড়াইয়া আছে, যাহাদের আদর যত্ন সহানুভূতি ও সমবেদনায় তার মর্ম্মান্তিক দুঃখের যথোচিত উপশম হইয়াছে, তাঁহাদের এই অভাবনীয় ভাবান্তরে সে প্রাণে দারুণ আঘাত পাইল ; হৃদয়-তন্ত্রীর প্রত্যেক তার যেন মুচড়াইয়া ছিঁড়িতে লাগিল ; তবে কি সে নিজে কোন অপরাধে অপরাধী ? অজ্ঞাতভাবে কি তাঁহাদের ক্লেশদায়ক হইয়াছে ? কৈ, তা ত মনে পড়ে না ? বেশ করিয়া সে তার গত দুই তিন দিবসের খুঁটিনাটি কার্য্যগুলিও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিল—যথা পূর্ব্বম্ তথা পরম্ ; কই, কোন নূতনত্ব বা বৈলক্ষণ্য ত নাই ? তবে এরূপ কেন ?

তবে স্বামি-স্ত্রীতে রাত্রে কোন কলহ হইয়াছে ?—কিন্তু তাহারই বা কারণ কি ? এখন ত আর যৌবনের উন্মাদোচ্ছ্বাস নাই, এ প্রৌঢ় দম্পতীর এতটা মনান্তরের গুরুতর কারণ কি হইতে পারে ?

ঈষৎ দাঁড়াইয়া ভাবিল—ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি! সন্দেহ-দোলায় অধিকক্ষণ অস্থির থাকা অবিধেয় ভাবিয়া, বিধুমুখীর গৃহপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিল "মা ?"

বিধুমুখী প্রথমটা যেন শুনিতে পান নাই, এইরূপ অন্যমনস্কতার ভাব

দেখাইলেন, কিন্তু গোপেশ্বরের আগ্রহাতিশয্যে স্থির থাকিতে পারিলেন না।

গোপেশ্বর দেখিল—যেন অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তার চিহ্ন মুখে সুস্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান, অত্যধিক কালিমাগ্রস্ত।

কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই গোপেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল—"মা, তোমাদের ব্যাপারখানা কি? আজ সকালে দেখ্‌ছি, বাবুরও মুখ ভার, তুমিও বিষণ্ণ; কি হইয়াছে বল দেখি?

বিধুমুখী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন যে "বাবা, গত রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মনটা অত্যন্ত কাতর আছে; নারায়ণ করুন—যেন আমার ননীর কোন অমঙ্গল না হয়। কিন্তু স্বপ্নটা এত ভীষণ যে, এখনো শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ছে, কিছুতে সুস্থির হ'তে পার্‌ছি না।"

গোপেশ্বরের দীর্ঘ দেহ কাঁপিয়া উঠিল—দেওয়ালে হস্ত রক্ষা করিয়া দেহের ভার সামলাইল। ভাবিল—ভগবান্ এ কি? এ কিরূপ তোমার খেলা! শেষে কি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ও এই নিরীহ দম্পতীকে এইরূপ করিয়া কাঁদাইবে? আর কোন কথা না কহিয়া, বাহিরে আসিয়া ক্ষীরোদ বাবুকে ধরিয়া বসিল।

ক্ষীরোদ বাবু একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন যে, গত রাত্রে ননীর সম্বন্ধে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মনটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে; তবে বিধুমুখী ইহা জানিতে পা'রলে, অত্যন্ত কাতর হইবে বুঝিয়া, আড়ালে আসিয়া মনটাকে সুস্থির করিবার চেষ্টায় আছি।

বিধুমুখী কিন্তু আড়াল হইতে সমস্ত শুনিয়াই ছুটিয়া আসিয়া ধরিলেন যে, যেরূপে হউক, শীঘ্রই চুঁচুড়া হইতে ননীর সংবাদ আনা হউক।

একটা বিস্মৃতপ্রায় যৌবনকথা সকলের মনে জাগিল—প্রথম যৌবনে স্বামী স্ত্রী উভয়ে একরাত্রে একই বিষয়ক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

সে স্বপ্নকাহিনী ক্ষীরোদবাবুকে ফাঁসী কাষ্ঠ হইতে রক্ষা করিয়া বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গিয়াছিল—এবারেও যদি সেইরূপে ফলিয়া যায়, তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ!

তবে সেথায় ভগবানের কৃপায় বহু কষ্টে শেষ রক্ষা হইয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ হইয়াছিল; তাই সকলের মনে এবারও বিপন্মুক্তির একটা ক্ষীণ আশা জাগিল। সকলে প্রার্থনা করিল যে, নারায়ণ সেবারের ন্যায় এবারেও যেন মুখরক্ষা করেন।

তখনো টেলিগ্রাফের লৌহ-তার ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছাইয়া ফেলে নাই। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও দ্রুত সংবাদ আনয়নের কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

গোপেশ্বর আশ্বাস দিয়া বলিল যে, ভয় নাই; সে যেরূপেই হউক, রাত্রের মধ্যেই চুঁচুড়া হইতে সংবাদ আনিয়া দিবে।

তাড়াতাড়ি একখানা ত্রিশ বোটে ছিপ ও বাছাই দাঁড়ী সংগ্রহ করিয়া বেলা আটটার মধ্যেই রওনা হইল।

তখন নূতন বর্ষা নামিয়াছে; শীর্ণ নদীবক্ষগুলি যৌবনসমাগমে উচ্ছ্বসিত, বেগময়ী জলস্রোত আপন গরবে ফুলিয়া উঠিয়া অনন্ত উর্ম্মিমালার উচ্ছ্বাস বুকে লইয়া অবিরাম গতিতে ছুটিয়াছে—অসীম আকাশভরা অনন্ত আকারের বহুরূপী মেঘরাজির খেলা—কূলের উভয় পার্শ্বে শ্যামল বিটপি-লতার শ্রেণী, কোথাও বা বিস্তৃত প্রান্তরব্যাপী হরিদ্বর্ণের কোমল শস্যশীর্ষের উপর দিয়া উন্মুক্ত উদার শীতল পবনের হিল্লোল। ছিপ এই সকল মোহন দৃশ্যের মধ্য দিয়া উচ্ছ্বসিত জলরাশি কাটাইয়া তর তর বেগে ছুটিয়া চলিতেছে। গোপেশ্বর সম্পূর্ণরূপে অন্যমনস্ক—তাহার মানস-পক্ষীও যেন এই ছিপের মত, আকুল মেঠো হাওয়ার মত, বিমানচারী জলদরাশির মত উধাও হইয়া চলিয়াছে।

কোথাও গ্রামপার্শ্বে নদীতটে বালক-বালিকারা বাঁশের ভেলায় ভাসিয়া প্রাণ খুলিয়া গান ধরিয়াছে বা উচ্চকণ্ঠে কল্লোল করিতেছে—পল্লীরমণীরা স্নান করিতেছে কলস ভরিয়া জল তুলিতেছে—গল্পগুজব ও পরচর্চ্চার পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছে। গঞ্জ বা বন্দরের কোলে নৌকার সারি, গোলমাল ও লোকসমাগম, নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারের আমদানী ও রপ্তানী। কোথাও কৃষকেরা টেকো মাথায় মাঠের মধ্যে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া কৃষিকার্য্য করিতেছে—কোথাও সম্পূর্ণ নির্জ্জন—লোকসমাগমশূন্য বিশাল প্রান্তর—শুধু অগণ্য বিহঙ্গের একত্র সমাবেশ, কলরব, নৃত্য ও সঙ্গীত। কোথাও প্রাচীন বটবিটপী কত যুগ ধরিয়া জটাজূট এলাইয়া নির্জ্জনে ধ্যানগম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান।

অন্য সময় হইলে তাহারা কত না উপায়ে এই আনন্দ উপভোগ করিত, পথিপার্শ্বস্থ লোকজনের সহিত কত আমোদ স্ফূর্ত্তি পরিহাস করিয়া গান গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া চলিত, কিন্তু সর্দ্দারের ভাব দেখিয়া সকলেই নীরব ও গম্ভীর।

গ্রামবাসীরা অবাক্ হইয়া দেখিতেছে এবং তৎসম্বন্ধে যথাবিধ মন্তব্য ও সমালোচনাদি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই ছিপ নদীর বাঁক ঘুরিয়া চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

গোপেশ্বর অস্থির—তাহার চঞ্চল চিত্তে জাগিতেছিল যে, ছিপ বুঝি জোর চলিতেছে না, বেলা অধিক হইয়া যাইতেছে। ক্রমাগত শীঘ্র চলিবার জন্য লোক জনকে উৎসাহ ও ভর্ৎসনা করিতেছিল। মাথার উপর দিয়া একটা পাখীর ঝাঁক সাঁ করিয়া উড়িয়া গেল। বেগগামী ছিপের উপর বসিয়া মনে হইল, যেন মাথার উপর দিয়া মেঘগুলা আকাশের গায় হু হু করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। যদি সে ঐ পাখীর মত বা মেঘের মত উড়িতে পারিত, তাহা হইলে হয়ত এতক্ষণে চুঁচুড়া পৌঁছিতে

পারিত। ছিপ বুঝি ভাল চলিতেছে না ভাবিয়া, মাল্লাদের ভৎর্সনা করিয়া বলিল,—"কিরে তোদের আজ আক্কেলখানা কি বল্ দেখি?—তোরা যে আজ গতর নাড়তেই চাচ্ছিস্ না?"

তারা অবাক্ হইয়া বলিল,—"বল কি সর্দ্দার! আমাদের মুখে রা-টী পর্য্যন্ত নেই, ছিলিমটা পর্য্যন্ত খাচ্ছি না, মাথার ঘামে গা ভেসে যাচ্ছে। দেখ্তে দেখ্তে আমরা জলাঙ্গীর মোহানা ছাড়িয়ে প'ড়্লাম, আর তুমি কি না বল্ছ যে, আমরা গতর খাটাচ্ছি না; তোমার কি কিছু আক্কেল নেই?"

গোপেশ্বর অপ্রতিভ হইয়া দেখিল, তাই ত, তাহাদের ত অপরাধ নাই। এইবার ভাগীরথীতে ছিপ পড়িবে জানিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বুঝিল—পৌঁছিবার আর বিলম্ব নাই। তখন একবার ছিপ ধরিয়া তাহাদের তামাক খাইবার আদেশ দিল।

বিশ্রামান্তে ছিপ আবার ছুটিল। ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, জলাঙ্গী ও ভাগীরথী বাহিয়া বর্ত্তমান খুলনা মেল অপেক্ষাও দ্রুতবেগে বেলা প্রায় ২টার সময় চুঁচুড়ায় পৌছিল। গোপেশ্বর একজনকে বাটী হইতে অগ্রে সংবাদ আনিবার জন্য বলিল, কিন্তু কেহই যাইতে রাজী না হওয়ায়, অবশেষে সকলকে পাকসাক করিয়া আহারাদি শেষ করিয়া লইবার জন্য উপদেশাদি দিয়া, সাদা ধব্‌ধবে চাদরখানা কোমরে বাঁধিয়া চটিজুতা পরিয়া তৈলসিক্ত বহু প্রাচীন বংশদণ্ডটী হাতে লইয়া নিজেই যাত্রা করিল। নদীতীর হইতে বাটী খুব বেশী দূর নয়, তথাপি তার বিলম্ব হইতে লাগিল, যেন পা আর উঠিতে চায় না, মন বিদ্রোহী হইয়া ফিরিয়া আসিতে চায়; ভয়—পাছে বুঝি সর্ব্বনাশী দুঃসংবাদ শুনিতে হয়।

বাটীটী দূর হইতে তাহার মানস-নেত্রে আঁধার ও শোক-সমাচ্ছন্ন রূপে জাগিয়া উঠিল। বাটীর নিকটে সদ্যঃ-পরিত্যক্ত রন্ধনের হাঁড়ী, শয্যাবস্ত্র,

দরজার নিকট জ্বলন্ত ঘুঁটে নিভিয়া আসিতেছে, দু একটা নিম পাতা ও অরহর দাল ইতঃস্তত ছড়ান, দেউড়ীতে কতকগুলি ভদ্রলোক খোলা গায়ে বিরসভাবে বসিয়া আছে; সদ্যঃ শোকচিহ্ন সর্ব্বত্র সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।

কম্পিতহৃদয়ে গোপেশ্বর ভাবিল—বুঝি বা স্বপ্ন সত্যই ফলিয়া যায়। আবার মনে হইল—হয়ত আর কাহারো মৃত্যু হইয়াছে, ননীগোপাল নিশ্চয়ই সুস্থ আছে।

গোপেশ্বরকে দেখিয়া পুরমহিলারা যখন ননীগোপালের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল, তখন হাত হইতে তার বাঁশের লাঠিটা পড়িয়া গেল, নিজেও ভূমিতলে বসিয়া পড়িল।

ঈষৎ পরে উঠিয়াই সে স্থান হইতে বেগে প্রস্থান করিল। উপস্থিত লোকজনের মধ্য হইতে দু এক জন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল, কিন্তু সে ততক্ষণ চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়াছে।

ছুটিয়া আসিযা গঙ্গাতীরে একটা নির্জ্জন স্থান দেখিয়া চুপ করিয়া বসিল, তার পর কিছুক্ষণ প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।

ক্রমে বাল্যকাল হইতে নিজ জীবনের সুখদুঃখের অতীত কাহিনী মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। বাল্যের উদ্দাম চাঞ্চল্য, ক্রীড়া-সঙ্গী, যৌবনের স্ফূর্ত্তি ও আবেগ, রাধারাণীর সহিত বিবাহ, সুখের সংসার, শিশু কালাচাঁদের সুন্দর নধর মুখখানি—আরো কত কি।

তার পর আকস্মিক বিপদ্ ও তাহা হইতে মুক্তি, সতী সাধ্বী স্ত্রীর সর্ব্বস্বত্যাগ ও অকাল বিদায়, পুত্রের জন্য দাসত্ব গ্রহণ, সেই পুত্রকে বিসর্জ্জন, ননীগোপালকে কোলে লইয়া পুত্রশোক বিস্মরণ, তার পর ইহাদের সাজান সংসার দেখিয়া, শেষ জীবনে বিপদ সম্ভাবনা বা শান্তির

আকাজ্ক্ষায় চিরবিদায়ের সঙ্কল্প প্রভৃতি যতই স্মরণপথে উঠিতে লাগিল, ততই অধৈর্য্য হইয়া পড়িল

ভাবিয়া দেখিল, তাহার যত আশায় একে একে ছাই পড়িয়াছে। যে দিকে হাত দিয়াছে সেই দিক্‌ই শুকাইয়া মজিয়া গিয়াছে, যে দিকে চাহিয়াছে সেই দিক জ্বলিয়া গিয়াছে, যত্ন করিয়া যাহাই গড়িতে গিয়াছে, অসমাপ্ত অবস্থায় তাহাই পড়িয়া গিয়াছে, শেষ জীবনে যে পরগাছা আশ্রয় করিয়া সুখশান্তি লাভের চেষ্টায় ছিল; তাহাও তার দুর্ভাগ্যক্রমে সমূলে উৎপাটিত হইল! এরূপ অবস্থায় যাঁর চিত্তবৈকল্য হয় না, তিনি হয় জীবন্মুক্ত, না হয় পাষাণ। সামান্য নিরক্ষর কৃষক গোপেশ্বর সর্দ্দার ত কোন ছার!

ভগবৎকৃপায় সদ্যঃশোকের সময় মানুষের স্বতঃই একটা বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই অমৃততুল্য মহাফলদায়ক সদ্যঃ বা শ্মশান-বৈরাগ্য যতই অস্থায়ী হউক না কেন, ইহা মানবচিত্তে উদাসভাব আনয়ন করিয়া প্রবল শোকাবেগকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া দেয়।

গোপেশ্বর ভাবিতে ভাবিতে উদাস হইয়া পড়িল; ভাবিল—কেন কাঁদি, কেন ভাবি, এই ত সংসার, ছায়াবাজীর খেলার মত এই আছে এই নাই, চিরকাল ধরিয়া এইরূপ চলিতেছে; অন্ধ মানুষ মায়ার বন্ধনে মোহের আবর্ত্তে পড়িয়া জড়াইয়া মরে, তাই এত দুঃখ। তার জীবনের ত সকল আশা ভরসা বহুকাল গিয়াছে তবে আর কেন?

কিছুরই আর আবশ্যক নাই, তবে এ বৃথা জীবন ধারণ কেন? না, এখনো একটা বাকী আছে। রাধারাণীর প্রজ্বলিত চিতার সম্মুখে শপথ করিয়াছিল—প্রতিহিংসা!

প্রতিহিংসার কথা ভাবিতে, শোণিত ও মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, আর নিশ্চেষ্টভাবে বসিতে না পারিয়া পায়চারী করিতে লাগিল।

যখন আকাশের দিকে চাহিল, তখন বুঝিল, অপরাহ্ণ; দ্রুতবেগে ছিপের নিকট আসিয়া দেখিল, সকলে বহুক্ষণ আহারাদি শেষ করিয়া তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"সর্দ্দার, সংবাদ কি?" গোপেশ্বর বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। আর কেহ তাহাকে আহারাদির কথা অনুরোধ করিতে সাহস পাইল না, পুনরায় ছিপ ছাড়িয়া দিল।

জ্যোৎস্না-পুলকিত শুভ্র যামিনী, সুন্দর চাঁদিনী রাত্রি, কিন্তু সকলেই বিমর্ষ, ম্রিয়মাণ ও উদ্যমহীন—তরীমধ্যে সে শোভা উপভোগ করিবার লোক ছিল না।

প্রায় মধ্যরাত্রে সহরের সন্নিকটস্থ হইলে, ছিপ ভিড়াইয়া গোপেশ্বর নামিয়া বলিল,—"দেখ্, বাবু ও মাঠাকুরুণকে বলিস্ যে, গোপেশ্বরের চাকরী আজ শেষ হইল—আর তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে না—আর বলিস্ যে, তাঁরাও যেন আর চাকরী না করেন, পেন্সন নিয়ে কাশী কিংবা বৃন্দাবনে বাস করেন। আমি যে ঘরে শুই, সেই ঘরের পোতার নীচে আমার মাথার শিয়রে কিছু টাকা হাঁড়ির ভিতরে লুকান আছে —বাবুকে ব'লে তোরা সেগুলা উঠিয়ে নিয়ে বখরা ক'রে নিস্, আর তোদের মজুরী কর্‌তে হবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অলৌকিক রহস্য।

গুহামুখে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ললিত ঘুমাইতেছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, সে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বলাইও প্রভুর পদসেবা করিতে করিতে তাহার পদ প্রান্তে পড়িয়া নিদ্রিত হইয়াছে। অন্য সময় হইলে, আমি ললিতের নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা করিতাম না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষা করিবার আমার অবসর নাই। আমি ললিতকে প্রবুদ্ধ করিতে, ঈষদুচ্চ কণ্ঠে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম। আমার ডাকে বলাইয়ের ঘুম ভাঙ্গিল। সে চকিতের মত উঠিয়া বসিল, এবং ললিতকে জাগাইতে আমাকে নিষেধ করিল। বলিল—"বাবু! এই কাঁচা ঘুমে প্রভুকে জাগাইয়া তুলিবেন না। তুলিলে বিষম অনর্থ হইবে।"

"তুলিলে বাবু কি রাগ করিবেন?"

"রাগ করিবেন কি! প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে।"

"এ তুমি কি পাগলের মত বলিতেছ?"

"পাগলের মত নয় বাবু, আমি ঠিক বলিতেছি।"

"প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে মানে কি?"

"সে আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব!"

এ'কি বিপদ! এরূপ কথা ত কখনও শুনি নাই! আর ভৃত্যের কথা যদিই সত্য হয়, তাহা হইলে এরূপ বিপদেও ত কখন পড়ি নাই। যদিই গৌরী গৃহত্যাগ করিতে চায়, তাহা হইলে ললিত ভিন্ন আর কে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারে? পারুক আর নাই পারুক, আমিই বা তাহাকে গৌরীর কথা না বলিয়া কেমন করিয়া নীরব থাকিব? আমি বলা'র কথা বাস্তবিকই বুঝিতে পারি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল কথাই একেবারে বিনা তর্কে ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করা আমার প্রকৃতি ছিল না। বলা'র কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল সে বাড়াবাড়ি করিতেছে। হয় ত কাঁচা ঘুম জোর করিয়া কেহ ভাঙ্গিয়া ছিল বলিয়া, ললিত কোনও একদিন কিছু অসুস্থ হইয়াছিল। ধনীর পুত্রের অসুস্থতা—দরিদ্রের হইলে যাহা একটু সামান্য শীতল জলের সাহায্যে দূর হইয়া যাইত, ললিতের বেলায় সেই অসুস্থতা বাড়ীর শুভাকাঙ্ক্ষী দাসদাসী প্রভৃতির সাহায্যে তিল হইতে তালে পরিণত হইয়াছিল। সেই অসুস্থতা দূর করিতে হয় ত কত ডাক্তারকে মুখে পর্ব্বতপ্রমাণ চিন্তার গাম্ভীর্য্য মাখিতে হইয়াছে।

ললিতের শয্যার পার্শ্বেই আমার শয্যা প্রস্তুত হইয়াছিল। যা ঘটিবার ঘটুক, তবু তাহাকে জাগাইতেই হইবে, ইহা স্থির করিয়া আমি উক্ত শয্যায় বিশ্রাম গ্রহণার্থে উপবেশন করিলাম—শয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেও শয়ন করিলাম না।

আমিও বসিয়াছি, এমন সময় ললিতের নিশ্বাস কিছু অস্বাভাবিক বেগে বহিতে লাগিল। ক্রমে নিশ্বাস-শব্দ এক অস্ফুট মৃদুস্বরে পরিণত হইল। আমি বুঝিলাম, সে একটা স্বপ্ন দেখিতেছে। বুঝিয়া বলাইকে বলিলাম—"কাহাকেও ঘুমঘোরে এরূপ ভাবে অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিতে

দেখিলে, তাহার ঘুম ভাঙ্গানই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এরূপ অবস্থা দেখিয়া তুমি চুপ থাকিতে পার, কিন্তু আমি কেমন করিয়া চুপ থাকিব?

বলাই আমার কথায় যেন কতকটা বিরক্ত হইল। ললিত কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত না হইলে হয়ত ভৃত্যজনোচিত ভাষায় সে আমাকে আপ্যায়িত করিতে ত্রুটী করিত না। তাহার উত্তরের ভাবে আমি অন্ততঃ এইটাই বুঝিয়া লইলাম।

সে বলিল "বাবু! আপনি ভদ্রলোক, তার উপর হুজুরের বন্ধু। আমি চাকর। আপনার সঙ্গে বার বার তর্ক করা কি আমার ভাল? হুজুর আপনার জন্ত এতক্ষণ জাগিয়া বসিয়াছিলেন। এতক্ষণ আপনি আসিলেন না কেন? বাবু কদাচ এত রাত্রি জাগিয়াছেন। এতক্ষণে তাঁহার অর্দ্ধেক ঘুম হইয়া যায়।"

ইত্যবসরে ললিতের নিশ্বাস আবার স্বাভাবিক ভাবে বহিতে লাগিল। ললিতকে জাগাইবার যে যৎসামান্ত কারণ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাও চলিয়া গেল। এখন এই ভৃত্যটার আদেশে কিছুক্ষণের জন্ত চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন আমার গতি নাই। কিন্তু কতক্ষণ আমাকে চুপ থাকিতে হইবে? ললিতের এ কাঁচা ঘুম কখন পাকিবে? বলাই যে ভাবেই আমার কথার উত্তর করুক, আমি তাহাকে আর একটী প্রশ্ন করিব। এই মনে করিয়া আমি তাহাকে বলিলাম—"ললিত বাবুর কি সারারাত্রির ভিতরে এক বারও ঘুম ভাঙ্গিবেনা?"

"কেন—আপনি তাঁহাকে কি কিছু বলিতে চান?"

"চাই বই কি! নতুবা তাহাকে কি মিছামিছি জাগাইতে ব্যাকুল হইয়াছি!"

"কি এমন কথা যে, বাবুর ঘুম না ভাঙ্গাইয়া বলিলে চলিবে না?"

"তুমি যেরূপ ভাবে কথার উত্তর দিতেছ, তাহাতে তোমাকে কথা বলিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।"

"আমি আপনাকে এমন কি বলিলাম?"

"যাই বল, তোমার কথা আমার ভাল লাগিতেছে না।"

আমার উত্তর শুনিয়া, অপ্রতিভ হইয়াই হউক, অথবা ক্রুদ্ধ হইয়াই হউক, বলা কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব রহিল। তাহার পর বলিল—"আপনার ব্যবহারও আমাদের কেমন কেমন ঠেকিতেছে। আপনি ওই পাগলীটার সঙ্গে এতক্ষণ একলা বসিয়া কি কথা কহিতে ছিলেন? বাবু পর্য্যন্ত আপনার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি জাগিয়া থাকিলে, আপনি দুইটা মিষ্ট কথা শুনিতে পাইতেন।"

কথাটা শুনিবামাত্র আমার মাথাটা ঘুরিয়া গেল,—একটা অস্বাভাবিক রক্ত প্রবাহ তীব্রবেগে হৃদয়দেশে প্রবাহিত হইল। হৃৎপিণ্ড চারিদিক হইতে আক্রান্ত ও শোণিত স্রোতে অবরুদ্ধ হইয়া ঘন ঘন স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

তাইত! এতক্ষণ আমি কি করিয়াছি! গভীর রাত্রিতে এক যুবতী সুন্দরীর সহিত নির্জ্জন গৃহে এই যে এতক্ষণ বসিয়া রহস্যালাপ করিলাম, এ কাজ ত আমি ভাল করিলাম না! গৌরীর আগ্রহ উপেক্ষা করিয়া আমার চলিয়া আসাই ত উচিত ছিল! শুধু তাই নয়, এই সময়ের ভিতরে উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, পরস্পরের ভাব-বিনিময়ে আমরা উভয়ের মধ্যে যেরূপ পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহা ত কোনও গৃহে নবাগত অতিথির চরিত্রের অনুকূল নয়।

এতক্ষণে আমার চৈতন্য ফিরিল। বুঝিলাম, ললিতমোহনের এত আগ্রহের আত্মীয়তা প্রদর্শনেও প্রথম আলাপের দিনে এত আত্মীয় হইয়া মূর্খের কার্য্য করিয়াছি। ইহারা আমার চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছে।

যে ঘরে বসিয়া গৌরীর সঙ্গে আমার কথোপকথন হইয়াছে, তাহা একটা গৃহাংশ মাত্র। একটা ঘরের মধ্যে পরদা দিয়া দুইটা ঘর করা হইয়াছে। গৌরীও আমার মধ্যে যে সমস্ত উত্তর প্রত্যুত্তর চলিয়াছিল, তাহা অবশ্য অনুচ্চস্বরেই হইয়াছিল। কথার উত্তর দিতে অথবা প্রশ্ন করিতে আমি অনেক সময় সাহস করিয়া জোরে কথা কহিতে পারি নাই। আমার বোধ হইল, সেই সকল অনুচ্চস্বরে কথিত বাক্য নানা কদর্থের রাশি উদরে পুরিয়া ললিতের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে।

এটাও বোধ হইল, বাড়ীর মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে কেহ না কেহ, অথবা অনেকেই আড়ি পাতিয়া আমাদের কথা শুনিয়াছে। নতুবা গৌরী যে সময় লুচির থালা দূরে প্রস্তরবৎ কঠিন মেজের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল, কেহ তখন সেই ভীষণ শব্দের কারণ নির্ণয় করিতে সেখানে আসিল না কেন? একটা কথা কহিয়াও নিজের অস্তিত্ব জানাইল না কেন? আমার তখন মনে হইয়াছিল, যেন ঘরগুলা জনশূন্য হইয়াছে। অথবা লোক থাকিলে মরিয়াছে। জীবিত থাকিলে কেহ না কেহ অন্ততঃ একটা বিস্ময়ের ভাবও প্রকাশ করিত।

এখন বুঝিলাম, তাহারা মরে নাই। মৃতের প্রাণ লইয়া, চোরের ভাব লইয়া তাহারা আড়ি পাতিয়া গৌরীর ও আমার রহস্যালাপ শুনিতে-ছিল, সন্দেহের চক্ষে গৌরীর ক্রিয়া কলাপ দেখিতেছিল।

মনে বড়ই নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল! তাইত! ইহাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার প্রথম দিবসেই আমি চরিত্রহীন প্রতিপন্ন হইলাম! একটা হীন ভৃত্যের কাছে আমাকে লাঞ্ছিত হইতে হইল। ললিতমোহন ঘুমাইয়াছে। সে জাগিয়া থাকিলে, আরও কি মিষ্ট বাক্য আমাকে শুনিতে হইত তাহার ঠিক কি? এখন না হয় সে ঘুমে অজ্ঞান হইয়া আছে। রাত্রিতেই হউক কি প্রভাতেই হউক, এক সময় ত

সে জাগিবেই। তখন আমার ভাগ্যে না জানি আরও কি লাঞ্ছনা আছে।

ভৃত্য বলা'র শেষকথায় আমি কোনও উত্তর দিলাম না। অবনত-মস্তকে শয্যার উপর শুধু বসিয়া রহিলাম। উক্তপ্রকারের অগণ্যচিন্তায় স্রোতের মধ্যে পড়িয়া আমার কথা করিবার সামর্থ্যই রহিল না।

হতভাগা ভৃত্যটা আমার নীরবতায় আমাকে অপরাধী স্থির করিয়া লইল। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া সে বলিল—"কি বাবু! মাথা হেঁট করিয়া বসিলে কেন ; মনে করিয়াছিলে, তোমার ফন্দীটী আমরা কেহই বুঝিতে পারিব না ?"

একটা হীন ভৃত্যের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করিয়া নিজের মর্য্যাদা নষ্ট করা আমি বুদ্ধিমানের কার্য্য মনে করিলাম না। কিন্তু কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিব ? এ ত দেখিতেছি, আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে উত্যক্ত করিবে ! এখনি সে মর্য্যাদার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ইহার পর আরও কত বেয়াদবী করিবে তার ঠিক কি ? আমাকে নীরব দেখিয়া দুষ্টটার সাহস অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া যাইতেছে। তৃতীয়বার প্রশ্ন করিলে উত্তর দিব কি না দিব ভাবিতেছি, এমন সময় ভিতর হইতে বলা'র উপর আহার করিবার আদেশ আসিল। আদেশ প্রাপ্তিমাত্র সে কক্ষত্যাগ করিল। যাইবার সময় কেবলমাত্র আমাকে সাবধান করিয়া গেল, আমি যেন তার প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ না করি।

যে ভিতর হইতে আদেশ করিল, আমি স্বরে বুঝিলাম, সে ললিতের পিসি। বলা' ভিতরে যাইতে না যাইতে পিসি বলা'কে কি যেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল। এত অনুচ্চস্বরে যে, সযত্নে শুনিবার চেষ্টা সত্ত্বেও আমি কথা শুনিতে পাইলাম না। তবে এই বুঝিলাম, সে রমণী আমার সম্বন্ধেই কথা কহিয়াছে। বলার উত্তরেই সেটা বুঝিতে

পারিলাম। অতি ধীরে কথা কহিলেও বলা'র কথা বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। বলা' বলিল—"চুপ! বামুন এখনও জাগিয়া আছে।" ইহাতে বুঝিলাম, আমার উপর শুধু ললিতের যে সন্দেহ হইয়াছে, তাহা নয়! তাহার পিসিরও সন্দেহ হইয়াছে। তখন ব্যাপারের গুরুত্ব আমি সম্যক্ উপলব্ধি করিলাম। বুঝিলাম ঘটনা-পরম্পরায়, এবং নিজের নির্বুদ্ধিতায় আমি নিজেকে এমন অবস্থায় পাতিত করিয়াছি যে, এখনি ইহাদের আশ্রয় ত্যাগ না করিলে আমার মঙ্গল নাই।

কিন্তু আমি যে বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছি! গৌরীর সঙ্গে কিয়ৎক্ষণের আলাপে বুঝিয়াছি, সে ইহাদের গৃহ পরিত্যাগের অবকাশ খুঁজিতেছিল। আজ অবকাশ মিলিয়াছে। সুতরাং সে শীঘ্রই ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। আজ সুবিধা পাইলে সে কালিকার অপেক্ষা করিবে না। এরূপ সময়ে যদি আমি এস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তাহা হইলে ইহারা নিশ্চয় বুঝিবে, আমরা নির্জ্জনে বসিয়া তাহারই গৃহত্যাগেরই পরামর্শ করিয়াছি।

সত্যই আমি বিষম ফাঁপরে পড়িয়াছি। বহুক্ষণ ধরিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিলাম না। চিন্তায় আমি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলাম। শেষে আমি স্থির করিলাম, লাঞ্ছনা অপমান যাহা ঘটিবে ঘটুক, আমি ললিতের জাগরণের অপেক্ষায় সেখানে বসিয়া থাকিব। কিন্তু ললিত যে রাত্রির মধ্যে উঠিবে, ইহা আমার বোধ হইল না। আমার বোধ হইল, সে কপট নিদ্রায় শয়ন করিয়া আছে। কাপুরুষ যুবক অন্তরের কথা আমাকে নিজে বলিতে সাহস না করিয়া, ভৃত্যের উপর বলিবার ভার দিয়া ছল করিয়া ঘুমাইয়াছে। পাছে বারংবার ডাকিয়া অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়া আমি তাহার কপটনিদ্রার ব্যাঘাত উৎপাদন করি, এই জন্য ভৃত্যটা উক্ত প্রকার উদ্ভটই কথায় আমাকে তাহার প্রবোধন কার্য্যে

নিরস্ত করিয়াছে। কাঁচা ঘুমে তুলিলে প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে, এরূপ কথা শুনিলে কোন্ ব্যক্তি, সামান্য বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কার লইয়াও, তাহাকে জাগাইতে সাহস করিবে?

এক দণ্ডেই আমার চিত্তের ভাব বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল—এই যুবক জমীদার পুত্রের উপর আমার ঘৃণার উদয় হইল। সঙ্গে সঙ্গে মর্ম্মান্তিক ক্রোধ। ভৃত্যকর্ত্তৃক অপমান আমি নীরবে সহ্য করিলাম। ইহারও উপর ললিত যদি আমার প্রতি অসদাচারণ করে, স্থির করিলাম, আমিও তখনি তাহার প্রতি তদ্বৎ আচরণ করিয়া তাহার কৃত অপমানের প্রতিশোধ লইব। চাকরটা ফের অপমান করিলে, তাহাকে কিছু উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিব।

বাল্যে আমার দেহে প্রভূত বল ছিল; কলেজে পড়ার অত্যন্ত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যের অনেকটা হানি হইলেও এখনও দেহে যা শক্তি আছে, তাহাতে বলা'র মত তিন চারিটা ব্যক্তিকে আমি মাটীতে পুতিয়া ফেলিতে পারি।

এবারে অপমানিত হইলে উক্তপ্রকারের উত্তরের ব্যবস্থা করিব সঙ্কল্প করিয়া আমি স্থিরভাবে শয্যার উপর বসিয়া রহিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি দরিদ্র। কিন্তু বংশমর্য্যাদায় আমি ললিত হইতে অনেক উচ্চ। আমি কুলীন, সে শ্রোত্রীয়। ইংরাজী শিক্ষার ফলে কুসংস্কার জ্ঞানে যদি আমি কৌলীন্যের গর্ব্ব পরিত্যাগ না করিতাম, তাহা হইলে স্বগৃহে অন্ন গ্রহণ করাইতে ললিতমোহনকে উপচার হস্তে লইয়া, গলবস্ত্র হইয়া, দীনভাবে আমাকে আবাহন করিতে হইত।

বহুদিন হইতে আচারভ্রষ্ট হইলেও আজিকার অপমানের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারবশে আমার সেই কৌলীন্যাভিমান পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগৌরবে এ মূর্খের কাছে আমার

মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা হইবে না। যে বৃদ্ধ কুলীন পিতার দীনভাব দেখিয়া আমি পূর্ব্বে মনে মনে লজ্জিত হইতাম, বুঝিলাম যদি মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁহা এই দীনতার একান্ত আশ্রয় বল্লালদত্ত বংশ-গৌরব হইতেই হইবে।

আমি দৃঢ়চিত্ততার সহিত ললিতের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়া ডাকিলাম —"ললিতমোহন!"

আমার কথা শুনিবামাত্র বলা' অপর গৃহ হইতে ছুটিয়া আসিল, এবং ঈষৎ তীব্রতার সহিত বলিল—"ওকি বাবু! তুমি কেমন ধারা লোক, বারংবার নিষেধ করিলেও তুমি কথা শুন না কেন?"

"বেশ তুই ডাকিয়া দে।"

"এইত একটু আগে বলিলাম, কাঁচাঘুম ভাঙ্গাইলে হুজুরের প্রাণ সংশয় হইবে।"

"মিথ্যা কথা। আমি এরূপ কথা কোথাও শুনি নাই।"

"তবে কি আমি তোমার কাছে মিথ্যা কহিতেছি?"

"সর্ব্বৈব মিথ্যা। তোর মনিব ঘুমায় নাই। ঘুমের ছল করিয়া পড়িয়া আছে। তোর মনিবকে ডাকিয়া তোল্। না তুলিলে আমি যেমন করিয়া পারি তাহাকে উঠাইব।"

আমার দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক কথা শুনিয়া বোধ হয় বলা' কিছু ভীত হইল। সে কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইল।

ইত্যবসরে আমি ললিতের অঙ্গে করস্পর্শ করিয়া আবার ডাকিলাম— "ললিতমোহন!"—এবারেও উত্তর পাইলাম না।

বলা' তখন ললিতের পিসিকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল— "পিসি মা শীঘ্র আইস। নহিলে এখনি বিপদ ঘটিবে। এ বামুন বড়ই উৎপাত করিতেছে।"

যেমন এই কথা শুনা, অমনি আমি ললিতকে পরিত্যাগ করিয়া এক লম্ফে তাহার কাছে উপস্থিত হইলাম। এবং সে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে না হইতে কেশাকর্ষণে তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিলাম। এবং পৃষ্ঠে বারত্রয় পদাঘাত করিয়া বলিলাম—"শূয়ার! আর এরূপ বেয়াদবী করিবি?" বলা' বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। এবং রক্ষার সাহায্যার্থে ললিত, ললিতের মা ও পিসি—সকলকেই একসঙ্গে ডাকিতে লাগিল।

প্রহারের ফল ফলিল। একদিক হইতে ললিতের পিসি ছুটিয়া আসিল। অন্যদিকে ললিত উঠিয়া বসিল। ললিতের মা আসিলেন না। আর আসিল না গৌরী। তাহাদের পরিবর্ত্তে জ্বরে আক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত ঝাঁটা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। ইহার আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বলা'কে পরিত্যাগ করিয়াছি। সে কিন্তু উঠিল না। ভূমিতে পড়িয়াই কাঁদিতে লাগিল।

পিসি বলিল—"একি বিষম ব্যাপার ললিত! এরূপ দস্যু স্বভাবের লোক কোথা হইতে আনিলি?"

ঝাঁটা বলা'র পৃষ্ঠাদি পরীক্ষা করিতে করিতে আমাকে গালি পাড়িতে আরম্ভ করিল। আমার স্বাস্থ্য ও শক্তিকে ভস্মীভূত করিবার জন্য অবিরাম অগ্নিদেবের আবাহন করিতে লাগিল।

ললিত দুইহস্তে চক্ষু মুছিয়া বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিল—"এ তুমি কি করিতেছ?"

আমি স্থিরভাবে উত্তর করিলাম—"তোমার চাকরকে সহবৎ শিখাইতেছি।"

"চাকর কি করিয়াছে?"

"কি করিয়াছে, তুমিই জিজ্ঞাসা কর।"

"হাঁরে বলা'! তুই কি করিয়াছিস্?"

বলা প্রভুর প্রশ্নে অজস্র মিথ্যা বলিয়া আমি যে একটা দানব প্রকৃতির লোক ইহা সকলকে বুঝাইয়া দিল।

ঝীটা আবার নূতন করিয়া গালির মন্ত্র আওড়াইতে লাগিল।

পিসি বলিল—"হতভাগা ছেলে! চেনা নেই, শোনা নেই, যাকে তাকে আত্মীয় মনে করিয়া ঘরে আনিস্! দেখ্ দেখি কি বিষম অনর্থ ঘটাইলি!'

ললিত ঈষৎ গম্ভীরস্বরে আমাকে বলিল—"আমার ঘরে আসিয়া বিনা দোষে আমার চাকরের অপমান আর আমার অপমান এক তা জান?"

আমিও তদনুরূপ রুক্ষস্বরে বলিলাম—"এতই যদি তোমার মান অপমান জ্ঞান, তাহা হইলে যাহা বলিবার নিজে না বলিয়া এই পাজী ভৃত্যটাকে দিয়া আমার অপমানের কাজ করাইলে কেন?

বলা' এই সময় আত্মদোষক্ষালনার্থ প্রভুকে আরও কতকগুলা কথা শুনাইল। শেষে বলিল—"হুজুর! আপনি যদি প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে আমি এখনি থানায় গিয়া নালিশ করিব।"

আমি এই কথা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হাসিতে হাসিতেই বলিলাম—"তাহা হইলে ক্ষণেক অপেক্ষা কর্। আমি তোর মনিব আর তার পিসির সম্মুখে লাথী মারিয়া তোর দাঁত ক'টা আগে ভাঙ্গিয়া দিই, তার পর থানায় যাইবি। নহিলে কি চিহ্ন লইয়া দারোগার কাছে নালিশ করিবি? মোকদ্দমায় ভাঙ্গা দাঁত দু'টা তোর মাতব্বর সাক্ষী হইবে।"

আমার হাস্যরসযুক্ত এই কয়টা তীব্র কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিছুক্ষণের জন্য কাহারও মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইলনা।

অবসর বুঝিয়া, আমি ললিতকে বলিলাম—"শুন ললিতমোহন

তোমাকে এইবারে যাহা বলিব, তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। কেননা বলিবার পরমুহূর্ত্তেই আমি তোমার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি। আমি না বুঝিয়া তোমার সহিত প্রথম সাক্ষাতেই তোমার আত্মীয়তায় আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তোমার চরিত্রের ভালরূপ পরিচয় না পাইয়াই তোমার এখানে আসিয়াছিলাম। নতুবা আমি এতক্ষণ হরিদ্বার ছাড়িয়া কতদূরে চলিয়া যাইতাম। আসিয়া ফল পাইয়াছি। তোমার মুখ দেখিয়া তোমাকে সরল বিশ্বাসে প্রতারিত হইয়াছি। তুমি ভৃত্যের দ্বারা আমার অযথা অপমান করিয়াছ।—”

ললিত কথায় বাধা দিয়া বলিল— “আমি তোমার কোনও অপমান করি নাই।”

“তোমার স্থূল বুদ্ধিতে তুমি বোধ করিতে না পার, কিন্তু আমি বুঝিয়াছি তোমারই সম্মতি ক্রমে এ বেয়াদব চাকর আমার অসম্মান করিয়াছে। সুতরাং এই পাপ গৃহ আমি এই মুহূর্ত্তেই পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।”

‘ বাবা ! আমার একটা অনুরোধ রাখিবে ?”

প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে ফিরিয়া দেখি, তিনি ললিতের জননী। সকলেই সে গৃহে সমবেত হইয়াছিল। কেবল তিনি এবং গৌরী আসে নাই। আমি প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। গৌরীর না আসায় আমার তত বিস্ময়ের কারণ ছিলনা, কেননা তাহার মনোভাব আমি বুঝিয়াছি। কিন্তু ললিতের মা না আসাতে আমি বড়ই বিস্মিত হইতেছিলাম। ঘরের একপার্শ্বে এতবড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, ঘরের অন্যপার্শ্বে তিনি কেমন করিয়া নীরবে বসিয়া ছিলেন, এটা আমি বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সাধ্বী জ্ঞানে তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু তিনি না আসাতে আমি

তাঁহার প্রতি ক্রমে শ্রদ্ধাহীন হইতেছিলাম। মনে হইতেছিল, ললিত-মোহনের গৃহে তাঁহার মাতার অস্তিত্বের কোনও মূল্য নাই। এখন তাঁহাকে দেখিয়া আমি কতকটা সন্তুষ্ট হইলাম। ভাবিলাম এতক্ষণে বক্তব্য শুনাইবার লোক পাইয়াছি।

আমি বলিলাম—' আপনার পুত্রের এ পাপ আশ্রয়ে থাকিতে অনুরোধ করিলে, রাখিব না। অন্য কিছু যদি বলিবার থাকে বলুন। রাখিবার যোগ্য বুঝিলে রাখিব।"

"প্রথম অনুরোধ, আজ রাত্রিতে এ গৃহ ত্যাগ করিতে পাইবে না।"

"আপনার পুত্রের আচরণে মর্ম্মাহত হইয়াছি।"

"আমিও হইয়াছি। এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে আমার ঘরে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ আজ অপমানিত হইয়াছে।" এই কথা বলিয়াই তিনি একবার ললিতের পিসির পানে চাহিলেন। ললিতের পিসি সে দর্শনের প্রকোপ সহ্য করিতে পারিল না। কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"তা আমার পানে চাহিতেছ কেন? আমি কি ব্রাহ্মণের অপমান করিতে তোমার পুত্র আর ভৃত্যকে শিখাইয়া দিয়াছি? ছেলের দিকে চাহিয়া যাহা বলিবার বল।"

এই বলিয়া পিসি দ্রুতপদবিক্ষেপে সেস্থান ত্যাগ করিল। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের নিমেষে বলা' ও সেই বৃদ্ধাদাসী সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইল।

ললিতের মাতা সে দিকে লক্ষ্যই করিলেন না। তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন—"তুমি আমার প্রতি করুণা করিয়া অন্ততঃ আজ রাত্রির মত এ গৃহে অবস্থিতি কর।"

"তাহাতে লাভ কি?"

"ইহাদের অত্যাচারে আমার জাতিধর্ম্ম সমস্তই নষ্ট হইতে বসিয়াছে।"

এ কথার কি সদুত্তর দিব, স্থির করিতে না পারিয়া আমি নীরব রহিলাম। আমি সম্মত হইয়াছি বুঝিয়া তিনি বলিলেন—"আমার দ্বিতীয় অনুরোধ—কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে আমি দুই একটী কথা জানিতে ইচ্ছা করি। তোমাকে অকপটে আমার কাছে প্রকাশ করিতে হইবে।"

"জিজ্ঞাসা করুন।"

"তোমার বংশ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। তোমার আচরণ ও তেজস্বিতা দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি কুলীন।"

"আমি কুলীন।" এই বলিয়া যথাসম্ভব আমার বংশ পরিচয় তাঁহাকে প্রদান করিলাম। আমি ফুলেমেলের বন্দ্যোপাধ্যায় গোপী-ঠাকুরের সন্তান। যুগপরিবর্ত্তনে আজকাল এ পরিচয় অনেকটা মূল্যহীন হইয়াছে। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা কহিতেছি, সে সময়ে ইহার যথেষ্ট মূল্য ছিল। সে সময়ের কিছু পূর্ব্বে ইহার মূল্যের অবধি ছিলনা। তখনও কুলীনের অসম্মান করিতে কোন শ্রোত্রিয়েরই সাহস ছিলনা। শ্রোত্রিয় যতই ধনী হউন, তাঁহার ধনগৌরব একজন অতি দরিদ্রের কৌলীন্যগর্ব্বের সম্মুখেও মস্তক অবনত করিত। কোন শ্রোত্রিয়ের গৃহে কুলীনের অসম্মান হইলে তাহাকে সমাজে লাঞ্ছিত হইতে হইত। ব্রাহ্মণে তাহার গৃহে অন্ন জল গ্রহণ করিত না।

বংশ-পরিচয় শুনিয়াই ললিতের জননী পুত্রকে বলিলেন—"হতভাগা! করিয়াছিস্ কি? এখনি ব্রাহ্মণের চরণ ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা কর্।"

ললিত এতক্ষণ নীরবে হেঁটমুণ্ডে বসিয়াছিল। বোধ হয়, আমার প্রতি অযথা দুর্ব্ব্যবহারের জন্য সে অনুতপ্ত হইয়াছিল। এখন মাতৃ-আদেশ সে অমান্য করিতে পারিল না। আমার পাদস্পর্শ করিতে সে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিল।

আমি তাহাকে পায়ে হাত দিতে দিলাম না। দিবার চেষ্টায় দুটী হাত ধরিয়া ফেলিলাম। বলিলাম—"ভাই! যদি মনের সন্দেহে আমাকে তোমার কিছু বলিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তা' হইলে চাকরকে দিয়া না বলাইয়া নিজে বলিলেনা কেন ?"

ললিতের মাতা বলিলেন—"হতভাগ্যকে ভ্রাতৃজ্ঞানে ক্ষমা কর। তারপর শুন—"আমার দ্বিতীয় অনুরোধ। তুমি গৌরীকে বিবাহ কর।"

"মা! আপনার এই অনুরোধ আমি রাখিতে পারিব না।"

"কেন? বয়স্থা দেখিয়া তুমি কি তাহার চরিত্রে সন্দেহ কর? তা হইলে, এই পবিত্র তীর্থে আমার জ্ঞান-বিশ্বাসে আমি বলিতেছি—

"তোমার জ্ঞান বিশ্বাসের মূল্য কি ?"

আকাশবাণীর মত কথা গৃহমধ্যে ধ্বনিত হইল। শব্দ শুনিয়া আমরা সকলেই কিছুক্ষণের জন্য জড়ের মত হইয়া গেলাম। সকলেই শব্দ লক্ষ্যে দ্বারের দিকে চাহিলাম।

সে দিনের মনোমুগ্ধকর সান্ধ্য-প্রকৃতিকে আমি একবার মুহূর্ত্তের জন্য নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। আর দেখি নাই। দেখিবার অবকাশ পাই নাই। যোগিনীর সন্ধানে ব্যাকুল—ঘাটে ঘাটে কেবল সোপানশ্রেণী দেখিয়াছি। জলের তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত চম্পক রাশির মত, সলিলে প্রতিফলিত সন্ধ্যার হাসি এক একবার নিরীক্ষণ করিয়াছি। দূরস্থিত শৈলে নবজাত মেঘমালা সঞ্চারে সঞ্চারে তাহাকে এক একবার ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। নিকটে নদীতটস্থ হর্ম্ম্যরাজি তাহাকে সম্যক আবদ্ধ করিয়াছিল। খেলা দেখিয়াছিলাম দূরে—তীব্র সঞ্চারিণী নীলধারার উপরে। অন্তর বুঝি আমার অজ্ঞাতসারে তাহাকে আবার দেখিবার জন্য অস্থির হইয়াছিল! নতুবা এ কি দেখিলাম—কেমন করিয়া

দেখিলাম! প্রকৃতির মূর্ত্তিধারণ! এ কেবল কল্পনাগ্রাহ্য দৃশ্য। অনেক সময় কল্পনাও তাহাকে ধরিতে পারে না। ধরিতে না পারিয়া আত্মহারা মানুষকে শুদ্ধ পাগল করিয়া তুলে। আমারও কি আজ তাই হইল! আমি কি পাগল হইলাম!

আমি দেখিলাম—আপাদবিলম্বি মুক্তকেশরাশি পৃষ্ঠে বিন্যস্ত করিয়া এক অপূর্ব্ব রূপবতী নারী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। দেখিয়া মনে হইল, শিখরান্তরালে লুক্কায়িত ঘনান্ধকারের ওড়না মাথায় দিয়া সায়ং সন্ধ্যা মূর্ত্তি ধরিয়া আগমন করিতেছেন। গৃহমধ্যে প্রকৃষ্ট প্রজ্বলিত দীপশিখা তাঁহার মুখের উপর আকুল আগ্রহে পড়িতে গিয়া ঘন কেশ-রাশিতে বিজড়িত হইতেছিল। কেশরাশি কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া দীপালোক গৈরিক বসনে বর্ণের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন কূলস্থা বনশ্রীকে ব্যাকুল করিতে গিয়া পর্য্যুদস্ত তরঙ্গ-মালা ক্ষোভে কাঞ্চন-সাগরে আছাড় খাইতেছে।

ধীরে ধীরে রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ মাত্রেই তাঁহাকে যেন চিনিতে পারিলাম।

"একি মা তুমি?"

"কে আমি? তুমি কি আমাকে ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছ?"

"না, আমার ভুল হইয়াছে—আমি আপনাকে দেখি নাই।"

ললিতের মা ললিতকে বলিলেন—"শীঘ্র মায়ের চরণে প্রণাম কর। মা! একটু অপেক্ষা করুন—আমি আসন লইয়া আসি।"

"প্রয়োজন নাই। আমি এখনি চলিয়া যাইব। আমি তোমাকে যা বলিতে আসিয়াছি, তা শুন।"

"আমি আসিয়া শুনিতেছি।" এই বলিয়া, বোধ হয় আসন আনিতে ললিতের মা গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। ললিতমোহনও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে

গৃহত্যাগ করিল মাতৃ-আদেশে দুই হাত তুলিয়া সে তাঁহাকে প্রণাম করিল মাত্র। কোনও কথা কহিল না। সে প্রণামে প্রাণ দেখিলাম না। কেন যে সে চলিয়া গেল, তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম না।

ঘরের মধ্যে রহিলাম কেবল আমি এবং যোগিনী। আর রহিল, উভয়কে বেষ্টন করিয়া হিমগিরি-চূড়াবিচ্যুত এক অননুমেয় নিস্তব্ধতা! নিস্তব্ধ—তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে আমার প্রাণের স্পন্দন পর্য্যন্ত যেন নিস্তব্ধ হইয়া গেল!

বহুক্ষণ স্থায়ী হইলে বোধ হয়, সেদিন আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত শেষ হইত। কর্ম্মভোগ আছে, তাই বুঝি আমার বিলয় হইল না।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া যোগিনী বলিলেন—"তুমি ভুল কর নাই। আমাকে দেখিয়াছ।"

"কোথায়? স্মরণে আসিতেছে না।"

"আবার স্মরণ কর।"

"আমি এই হরিদ্বারে দুইবার এক যোগিনীকে দেখিয়াছি।"

"এখন তৃতীয় বার ঘরে দেখিলে?"

"সে কি মা! তোমার এত রূপ?"

"আমার এরূপ কি তোমার ভাল লাগিতেছে?*

আমি উত্তর না দিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা লুটাইলাম।

যোগিনী বলিলেন—"উঠ! অতিরিক্ত ভক্তি দেবতার গ্রাহ্য নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

"ভৌতিক রহস্য।"

(পিইরোর ভারতীয় অভিজ্ঞতা।)

কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রিটিশ আরটিষ্টদিগের রঙ্গমঞ্চে গোঁড়া অধ্যাত্মবাদীদিগের একটি প্রকাণ্ড সভা হইয়াছিল. উপস্থিত সকলেই ভৌতিক-রহস্য বিজ্ঞাপনের কৌতূহলপ্রদ উপাখ্যান সকল শুনিবার অভিপ্রায়ে উক্ত নাট্যাগারে সমাগত হইয়াছিলেন, শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই বিলাতের "ভূত-শক্তিবাদী" সভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ আমেরিকা এবং অন্যান্য বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়া "পিইরো" ভৌতিকতত্ত্ব বিষয়ে যে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তিনি একটি সুন্দর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ইহা শুনিবার জন্যই এই জনসমাগম হইয়াছিল। পিইরোকে দেখিলে একজন খাঁটি ইংরাজ বলিয়াই সকলের ধারণা হয়। তাঁহার বয়স এখনও চল্লিশ অতিক্রম করে নাই; এবং তিনি এই দুজ্ঞেয় গভীর বিষয়টি এরূপ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, সকলেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পিইরো যখন স্কুলের ছাত্রমাত্র, যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন নাই, তখন কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একটি ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই গভীর তথ্যপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাসের প্রথম সূত্রপাত হয়।

একদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় পিইরোর চেহারা অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে পিইরো বলিলেন যে, পূর্ব্বদিনের রাত্রিতে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, ঐ দিন চারিটার সময় যখন তিনি পুরস্কার

লইবার জন্য যাইবেন সেই সময়ে যেন নিয়তিদেবী মোহর করা একটি লেখা তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন "এই পত্রটিই তোমার অদৃষ্ট 'নির্দ্ধারিত' করিবে।"

বালক পিইরোর নিকট এই কথা শুনিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন "বৎস পিইরো! স্বপ্ন মনের বিকার ভিন্ন কিছুই নয়। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম হেতুই এইরূপ বিকৃত স্বপ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তুমিও পরীক্ষার পূর্ব্বে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়াছ, তাহারই ফলে এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়াছ, স্নায়ু মণ্ডলীর দুর্ব্বলতা ভিন্ন ইহা কিছুই নয়।" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পরদিন পিইরো যখন তাহার পুরস্কার গ্রহণ করিয়া নিজ স্থানে বসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে নিয়তি দেবী একটি আগন্তুকের বেশে তথায় প্রবেশ করিয়া এক খানি পত্র বালক পিইরোর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন যে, "এই পত্রটি তোমার পিতার নিকট হইতে লইয়া আসিতেছি।" সেই পত্রে তাঁহার পিতা তাহাকে লিখিয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, সুতরাং পুত্রের পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল।

পিইরো তাহার পর অনন্যোপায় হইয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন এবং নিঃসহায় ও কপর্দ্দক-বিহীন অবস্থায় জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার সময়ে ডকের পার্শ্বেই একটি দয়ালু পুরোহিত ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সাক্ষাৎ হইবামাত্র ব্রাহ্মণ পিইরোর হস্তরেখা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইহার পরিণাম এই দাঁড়াইল যে, পিইরো সেই ব্রাহ্মণটির সহিত পর্ব্বত অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। কয়েক মাস ধরিয়া ক্রমাগত পথ পর্য্যটনের পর এই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রেত-শক্তি-বাদিগণের একটি মজ্‌লিসে লইয়া গিয়া

উপস্থিত হইলেন। সেখানে এই বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে সাত মাস সাত দিন সাত ঘণ্টাকাল উপবাস করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। উক্ত মজ্‌লিসের সভ্যদিগের দলভুক্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে বলা হইল যে একবার তাহাকে অজ্ঞান হইতে হইবে। সেই ব্রাহ্মণটি তাঁহাকে আরও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, হয়ত এই অজ্ঞানাবস্থা হইতে তাঁহার আর সংজ্ঞালাভ না হইতেও পারে। বলা বাহুল্য কেবল পরীক্ষার জন্যই পিইরোকে এই কথা বলা হইয়াছিল। পিইরোর হৃদয়ে একবার বাড়ীর ভাবনা আসিল। সেখানে তিনি সুদূর ইংলণ্ডে তাঁরার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের বিষয় একবার চিন্তা করিলেন। ব্রাহ্মণটি তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিলেন যে, ইংলণ্ডে তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা কে কি করিতেছেন ও কোথায় আছেন, অজ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই তাহা তিনি তাঁহাকে দেখাইবেন। এই উদ্দেশ্যে দুইজনে পর্ব্বতের একটু উচ্চতর স্থানে অধিরোহণ করিলেন। সেখানে মর্ম্মর প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি পাত্র দেখিতে পাইয়া ব্রাহ্মণ তাহাতে কৃষ্ণবর্ণের খানিকটা তরল পদার্থ ঢালিয়া দিয়া পিইরোকে তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন, পাত্রটির উপর দৃষ্টি-পাত করিবামাত্র বহুদূরবর্ত্তী ইংলণ্ডে তাঁহার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনেরা কোথায় কি কার্য্য করিতেছিলেন, অতীব বিস্ময়ের সহিত সে সকল তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন।

দীর্ঘ উপবাসহেতু অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়া সত্ত্বেও এই বিস্ময়কর রহস্যো-দ্ভেদের পর তিনি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন এই পর্ব্বত সম্মুখেই একটি অতি প্রাচীন দেবমন্দির ছিল। মজলিসের সভ্যগণ ও ব্রাহ্মণ তাহাকে উক্ত মন্দিরের মধ্যে লইয়া গেলেন। পিইরো মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উহার একটি গভীর গর্ত্তের মধ্যে মার্ব্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত শিবের একটি প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। এই

অন্ধকারময় প্রশস্ত গুহার মধ্যে প্রস্তর-মূর্ত্তির মস্তকদেশ আলোকিত হইতেছিল। অনেকেই হয়ত মনে করিতে পারেন, এই আলোক কোথা হইতে আসিল ; এই গুহা হইতে একটি ছিদ্র পর্ব্বতের অন্তর্দ্দেশ ভেদ করিয়া বরাবর পৃথিবীর বহিঃপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আলোকরশ্মি সেই ছিদ্র পথ দিয়া আসিয়া মার্ব্বেল প্রস্তরের উপর প্রতিফলিত হওয়ায় সমস্ত গুহাটি আলোকিত হইতেছিল। এই খানেই তাহার "ভাবের আবেশ হইল, ইন্দ্রিয়-শক্তি সকল ক্রমে ক্রমে অবশ হইতে লাগিল. সর্ব্বশেষে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত হইল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন তাঁহার পরমাত্মা তাঁহার শরীর হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অবস্থায় তাঁহাকে ৭ দিন থাকিতে হইয়াছিল। পরে যখন তাঁহার এই মোহাবেশ কাটিয়া গিয়া সংজ্ঞা লাভ হইল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হইবে, অনেক সময় তিনি মনে মনে করিতেন। বোধ হয় তিনি অন্ধ হইয়াই রহিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে অল্প অল্প করিয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং কয়েক দিনের মধ্যে তিনি পুর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, অন্ধকে কিরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা তিনি এই কয়দিনে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন জীবিত থাকিবেন। ততদিন তিনি অন্ধগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন।

ভারতবর্ষে আসিয়া পিইরো যে সকল আশ্চর্য্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এতদ্দেশীয় যোগিগণের দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করণই তাঁহাকে অধিকতর বিস্ময়-রসে আপ্লুত করিয়াছিল। তিনি এক স্থানে দেখিয়াছিলেন যে, একটি যোগীকে একমাস কাল মাটীর মধ্যে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার কবরের উপর পুষ্পবৃক্ষ উৎপন্ন

হইলে ক্রমে সেই বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। পরে যখন তাঁহাকে কবরের মধ্য হইতে উত্তোলন করা হইল, তখন পিইরো দেখিলেন যে উক্ত যোগীর জিহ্বা পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে এবং কিছুক্ষণ পরে যোগী স্বয়ং উপবেশন করিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি এদেশের ফকিরদিগকে সেই বিখ্যাত "দড়ি ও বালকের ভেল্কি" খেলিতে প্রায়ই দেখিতেন। সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, এই সকল কার্য্য কেবল হিপ্নোটিজম্ অর্থাৎ সম্মোহন বিদ্যার প্রভাবেই সাধিত হইয়া থাকে। দর্শকদিগের সংখ্যা যতই অধিক হউক না কেন, ঐ ফকিরেরা তাহাদিগকে এমনি ভাবে মুগ্ধ করিয়া ফেলে যে, তাহারা যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে, বালকটি দড়ি বাহিয়া উঠিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

ইহার পর তিনি আর একটি অতি কৌতূহলপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহার মর্ম্ম এই ;—তিনি কোন এক সময়ে একটি ইংরাজ-মহিলার হস্তরেখা পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, ৪৮ বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার স্বামী লাভ হইবে। পরে সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট হইতে তিনি এক পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে লেখা ছিল "যুবক ? আমার বয়ঃক্রম ৪৮ বৎসর এক মাস হইয়াছে ; কই এখনও আমার সেই প্রিয়তম আসিলেন না ? আমি তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য অনেকবার অনেক রকম মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিলাম, নানাপ্রকার বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া অনেকবার নাট্যাগারে গিয়াছিলাম ; কিন্তু এখনও তাঁহার ধরা পাইলাম না।" যাহাহউক, এই স্ত্রালোকটি পিইরোর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যখন নিউইয়র্ক সহর হইতে বোষ্টন নগরের দিকে আসিতেছিলেন, তখন পথে একটি রেল-গাড়ীতে তাঁহার সেই হারাণ নিধির সহিত সাক্ষাৎ হইল, পিইরোও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

পরে তিনি সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, ভারতবর্ষে তিনি এ সকলের অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্য ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছেন। সে সকল ঘটনা তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নিকট বর্ণনা করিবেন। *

শ্রীননাং সিংহ শেঠ।

অলৌকিক ভৌতিক কাণ্ড।

খুলনা জেলার অন্তর্গত চন্দনপুর সয়ড়ার মধ্যে আমাদিগের জমিদারি। সয়ড়া গ্রামে অছির বদ্দি (বৈগু) নামক একঘর মুসলমান গৃহস্থ বাস করে। তাহার বয়স অনুমান ৪০।৪৫ বৎসর হইবে, গত কয়েক বৎসর হইতে অছির হিষ্টীরিয়াগ্রস্ত হইয়া যারপরনাই কষ্ট পাইতেছে। প্রথম আক্রমণ সময়ে দিবসে দুই তিন বার আক্রান্ত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িত, ক্রমে পুরাতন হইয়া আক্রমণ-সংখ্যা অল্প হইয়াছে। আমি প্রথমে উহা পীড়া স্থির করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লইতে উপদেশ দিয়াছিলাম কিন্তু কোন চিকিৎসায় কিছুমাত্র ফল হয় নাই। সে সময় আমিও জানিতাম না যে, হিষ্টীরিয়া পীড়া নহে, ভূতাবেশ, গত ৩ বৎসর হইল প্রথমে জানিলাম যে, হিষ্টীরিয়া ভৌতিক কাণ্ড, এবং সেই সময় হইতে উহার সত্যতা কতদূর তাহা পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ক্রমে পরীক্ষায় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে হিষ্টীরিয়া অধিকাংশ স্থলে পীড়া নহে, এমন কি আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, শতকরা ৮০ জনের হিষ্টীরিয়া ভূতাবেশ. তাহার দুই একটি ঘটনা পূর্ব্বে "অলৌকিক রহস্যে" লিখি-

---

* হিতবাদী সমাচার হইতে গৃহীত।

য়াছি,—যদি কেহ সন্দেহ করেন তবে আমি তাঁহাকে বুঝাইতে প্রস্তুত আছি, যে কোন হিষ্টীরিয়া-আক্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিব ; হিষ্টীরিয়া পীড়া নহে, ভূতাবেশ। সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা অধিকাংশ স্ত্রীলোকই হিষ্ট্রীয়া-আক্রান্ত হইয়া থাকেন। তাহার কারণ আমার বোধ হয় আর কিছুই নহে, মানসিক বলের অভাব। আশা করি ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, স্ত্রীলোক অপেক্ষা মানসিক বল পুরুষের অনেক অধিক, আর ইহাও ধ্রুব সত্য যে, কোন কারণে স্বাভাবিক জ্ঞান অভিভূত না হইলে, কোন ভৌতিক যোনি মানুষকে আক্রমণ করিতে পারে না, অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, নানাপ্রকার ভৌতিক বিভীষিকা দেখিয়াও অনেকে কেবল সাহসের বলে তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, এবং অপর পক্ষে ভূতগ্রস্ত সমস্ত লোকের নিকট আরোগ্য হইবার পরে জানা গিয়াছে যে, প্রথমে কোন না কোন কারণে সে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল, অছিরের নিকটও জানা গিয়াছিল যে, সে প্রথমে ভয়ঙ্কর ভীত হইয়াছিল, এবং সেই ভয় পাইবার পর হইতেই সে এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমি তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম, তোমার ফিট হইলেই আমাকে সংবাদ দিও, অছিরও আমার উপদেশানুসারে তাহার বাটীস্থ সকলকে বলিয়াছিল যে তাহার ফিট হইলেই আমাকে সংবাদ দেয়, তাহার বাটী আমার বাটী হইতে ২০।২৫ রশির অধিক দূর নহে। প্রায় ২ বৎসর গত হইল এক দিবস রাত্রি অনুমান ৯টার সময় তাহার পুত্র অপর একটি লোকের সহিত অত্যন্ত ব্যস্তভাবে আমার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহার পিতার হিষ্ট্রীয়া আক্রান্ত হওয়ায় সংবাদ প্রদান করিল, সে সময় বর্ষা কাল, বিশেষ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল, আলোকের সাহায্য ব্যতীত বাহিরে কিছুই দেখা যাইতেছিল না, অধিকন্তু পল্লির পথ যার পর নাই

কৰ্দ্দমাসিক্ত, সে অবস্থায় তাহার বাটীতে যাওয়া কষ্টকর এবং বিপদজনক, তথাপি আমি ঔৎসুক্যের অনুরোধে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া ভৃত্য ও আলোর সাহায্যে, খালি পায়ে তাহার বাটী যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু ঐ সমস্ত বাধা বিঘ্নের জন্য একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল, তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, অছির বসিয়া আছে, তবে তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া বোধ হইল না। জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "আমার এইমাত্র চৈতন্য হইয়াছে, অন্যান্য দিন যত সময় অচেতন হইয়া থাকি আজ তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প সময়ের মধ্যে চৈতন্য হইয়াছে, আর আজ সম্পূর্ণ অজ্ঞান হই নাই, যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সে সময়েও যেন অল্প অল্প জ্ঞান ছিল, আমার স্ত্রীও বলিল অন্যান্য দিন যে প্রকার খেচুনি ইত্যাদি হয়, আজ ততদূর হয় নাই।" আমি তাহার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না, মনে মনে ভাবিলাম, হিষ্ট্রীয়া-হইবার অনেক পরে আমাকে সংবাদ দিয়াছ। অথবা আমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, সেই জন্য হিষ্ট্রীয়া আক্রমণের স্থায়িত্ব সময় অতীত হইয়া গিয়া তাহার চৈতন্য হইয়াছে, পরে এক দিন না দেখিলে কিছুই স্থির হইতেছে না, তাহাদিগকে আক্রমণের উপক্রম হইলেই আমাকে সংবাদ দিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছিলাম, তৎপরে দুই দিবস গত হইল, তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময়ে এক জন লোক আসিয়া অছিরের পুনরাক্রমণের সংবাদ দিল, সংবাদ পাইবামাত্র আমি তাহার সহিত অছিরের বাটী যাইয়া উপস্থিত হইলাম, যাইয়া দেখিলাম, অছির স্থির হইয়া বসিয়া আছে। আমি তাহাকে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "আমি যেমন বুঝিতে পারিলাম যে, ফিট হইবার উপক্রম হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ আমার স্ত্রীকে বলিলাম আমাকে একটি বিছানা পাড়িয়া দিয়া ও বাটীর ভাইকে এখনি বাবুকে সংবাদ দিতে বল, ভাইও আপনাকে

সংবাদ দিতে গেল, আমিও ক্রমে অচৈতন্য হইবার পর সুস্থ হইতে লাগিলাম।' আমি তাহার নিকট অবস্থা শুনিয়া প্রথমে আশ্চর্য্য হইলাম, শেষে স্থির করিলাম, উহার হিষ্ট্রীয়া হইবার সময় হয় নাই। হয়.ত অন্য কোন কারণে শরীর অসুস্থ হইয়াছিল, তাহাতেই হিষ্ট্রীয়া হইবে এই ভাবিয়া আমাকে সংবাদ দিতে বলিয়াছিল, সেইজন্য তাহার বাটীর লোক দিগকে বিশেষ করিয়া আবার বলিয়া আসিলাম, পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ বুঝিতে পারিলে আমাকে সংবাদ দিও। অনর্থক সংবাদ দিয়া কষ্ট দিও না, দুই চারি দিবস পরে আবার তাহার পুত্র আসিয়া বলিল, বাবার আজ সেইরকম হইয়াছে "আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঠিক ত, সে দিনের মত বৃথা ভোগাইবে না ত, সে বলিল, "বাবু আমি কি আপনার সহিত মিথ্যা বলিতে পারি। আপনি গেলেই দেখিতে পাইবেন, আমা কথা সত্য কি মিথ্যা, তখন আমি তাহার সহিত গেলাম, গিয়া দেখি অছির ঠিক পূর্ব্ববৎ বসিয়া আছে, আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলাম যে, চালাকির আর জায়গা পাও না, আমার সহিত চালাকি করিতে আসিয়াছ, ইহাতে তাহার পুত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, আমি আপনার সহিত মিথ্যা বলি নাই আমি যাইবার সময় দেখিয়া গিয়াছিলাম, অন্য অন্য দিন ফিট হইবার সময় প্রথমে যেরূপ হাত পা চিন চিন করে ও সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে, আজিও ঠিক সেই প্রকার হইতেছে। বাবার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আমার কথা সত্য কি না? তখন আমি অছিরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাকে বার বার অনর্থক সংবাদ দিতে বল কেন? "অছির বলিল—"আপনাকে কি আমি ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা সংবাদ দিয়া বলিয়াছি, সে দিন সামান্যরূপ বুঝিতে পারিয়াই সংবাদ দিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু আজ যে সময় সংবাদ দিতে পাঠাইয়া ছিলাম, তখন আমার হাত পা চিন চিন

করিয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে আর বসিয়া থাকার শক্তি নাই দেখিয়া সংবাদ দিতে, বলি, বলিয়াই বিছানায় পড়িয়া ছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যেমন আমার ছেলে আপনাকে সংবাদ দিতে গেল, তাহার একটু পরেই, আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পন ও হাত পা চিন চিন করা কমিতে আরম্ভ করিল, শরীরও ক্রমে সুস্থ হইতে আরম্ভ হইল, তাহা দেখিয়াই আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, খোকাকে (তাহার পুত্রকে সে খোকা বলে) ফিরাও, আমার অসুখ সারিয়াছে, আমার স্ত্রীও খোকাকে ফিরাইতে খানিক দূর গিয়াছিল, খোকা আরও দ্রুত গিয়াছিল, সেই জন্য তাহার দেখা পায় নাই, আমার ভাগ্য মন্দ, সেইজন্য আমি আপনাকে দেখাইতে পারিতেছি না, আপনাকে সংবাদ দিতে গেলেই তার ফিট হয় না, এরূপ যে কেন হয়, আমি তাহার বুঝিতে পারিতেছি না, দুই দিনই ঐ প্রকার হইল," তাহার নিকট ঐ প্রকার শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইল যে, উহারা আমাকে মিথ্যা সংবাদ দেয় নাই, তবে যে কেন ঐপ্রকার হইতেছে তাহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলাম, আমার অনুমান হইল, যে ভৌতিক যোনি কর্ত্তৃক অছির আক্রান্ত হয়, সে অত্যন্ত সয়তান, (Evil sprit) সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহার আক্রমণ কালে আমি উপস্থিত হইতে পারিলে, তাহাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিব, সেইজন্য আমাকে সংবাদ দিতে আসিলেই, সে আর আক্রমণ না করিয়া, নিরস্ত হইয়া চলিয়া যায়, অছির ও সুস্থ হইয়া উঠে। আমি জানি, এমন ভৌতিক যোনি আছে যে, তাহাকে আবদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন, সে যেমন বুঝিতে পারে যে, যে তাহাকে আবদ্ধ করিতে সক্ষম, সে ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, আবদ্ধাকারী সে স্থান হইতে চলিয়া গেলে পুনরায় আক্রমণ করে, এরূপ সয়তানটাকে বিতাড়িত করা অত্যন্ত কঠিন, হিষ্ট্রীয়া-রূপে আক্রমণকারী ভূতকে আমি পূর্ব্বে কখন ঐ ভাবে পলায়ন করিতে দেখি নাই, সেই

জন্য উপস্থিতক্ষেত্রে তাহাই ঠিক কিনা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে পুনরাগমনের সময় সংবাদ দিতে চলিয়া আসিলাম, পরে যে দিন আবার আক্রমণের সংবাদ পাইলাম, সেদিন না গিয়া ফল কি হয় দেখিবার জন্য, যাওয়া রহিত করিয়া, সংবাদদাতাকে বলিয়া দিলাম আজ আর আমি যাইতে পারিতেছি না তুমি যাইয়া অছিরকে বলিও, আজ যে প্রকার হয়, তাহা সে যেন নিজে আসিয়া আমাকে বলে, ইহা সকাল বেলার কথা, অছির বৈকালে আমার নিকট আসিয়া বলিল, আজ ভয়ানক ভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল, সে আক্রমণ এত তীব্র যে, সে ওরূপভাবে ইহার পূর্ব্বে আর কখন আক্রান্ত হয় নাই, তখন আমার সন্দেহ দৃঢ় হইল, সেই সন্দেহ দূর করিয়া বিশ্বাসে পরিণত করণোদ্দেশ্যে, তাহাকে পুনরাক্রমণের সংবাদ দিতে উপদেশ দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম,তাহার পর দিবস আবার আক্রমণের সংবাদ পাইলাম, কিন্তু গেলাম না, ভাবিলাম দেখি আজ আবার কি হয়, পরে জানিলাম, সে দিনও ভয়ানক আক্রান্ত হইয়াছিল, আর এক দিন আক্রমণের সংবাদ পাইবামাত্র তাহার বাটীতে গেলাম গিয়া দেখিলাম অছির সুস্থ, সামান্যভাবে আক্রান্ত হইয়াই সুস্থ হইয়াছে, তখন সন্দেহ দূর হইয়া, বিশ্বাসে পরিণত হইল, সেই দিন হইতে তাহাকে উপদেশ দিলাম যে, যেমন হিষ্টীরিয়া হইবার উপক্রম হইবে, আমাকে আর সংবাদ না দিয়া আমার বাটী যাইবে, সেই দিন হইতে সে যখন পীড়ার সূত্র বুঝিতে পারে, তৎক্ষণাৎ আমার বাটীতে চলিয়া আইসে, আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে সে যত আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী হয়, তত সুস্থ হইতে থাকে, আমার বাটীতে উপস্থিত হইবার সামান্য পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে, অনেক ভদ্রলোকে ঐ অবস্থা শুনিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়া তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত শুনিয়াছেন, আমাদের গ্রাম বাসী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভৌতিক কাণ্ডে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায় কয়েকদিন অছিরের নিকট কূট প্রশ্ন করিয়া সমস্ত

অবস্থা শুনিয়া অবাক হইয়া যার-পর-নাই চমৎকৃত হইয়া এই ঘটনাটী "অলৌকিক রহস্যে" প্রকাশ করিতে বার বার আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, আজ তাঁহারই অনুরোধে ইহা লিখিত হইল, দেড় বৎসরের অধিক কাল হইল, ঐ একই ভাবে অছিরের কাটিয়া যাইতেছে, যে কোন গতিকে আমার নিকট উপস্থিত হইতে সক্ষম হইলে, অথবা আমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিলেই অছির হিষ্ট্রীয়ায় আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়, সামান্য স্বল্প হইয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়, কিন্তু ইহার মধ্যে যত বার আমার নিকট উপস্থিত হইতে সক্ষম হয় নাই, অথবা আমার নিকট হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে আক্রান্ত হইয়াছে, তখন ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছে, এক্ষণে আমার প্রতীত হইয়াছে যে, অছিরের আক্রমণকারী ভূতযোনি অত্যন্ত সয়তান, সে যে সময় বুঝিতে পারে যে, তাহার আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, সে সময় আরও তীব্রভাবে আক্রমণ করে, এবং যে সময় আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে সে সময় কেবল উকি ঝুকি মারিয়াই পলায়ন করে, যাহারা ভূতাশ্রিত হিষ্ট্রীয়া রোগী, তাহারা স্বাভাবিক ভাবে আক্রান্ত না হইলেও, একটী কৃত্রিম উপায়ে আক্রান্ত করিয়া আক্রমণকারী যোনিকে আবদ্ধ করা যায়, আমার ইচ্ছা আছে, অছিরকে সেই কৃত্রিম উপায়ে হিষ্ট্রীয়া আক্রান্ত করিয়া, সেই ভৌতিক-যোনিকে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু আলস্য-পরবশ হইয়া এই দীর্ঘ কালের মধ্যেও সে চেষ্টা করিতে পারি তাহা হইলে যাহা ফল হইবে, তাহা আপনাকে জ্ঞাপন করিব যদি পাঠকগণের মধ্যে কেহ এরূপ হইবার কোন কারণ স্থির করিতে পারেন, তবে এই পত্রিকায় লিখিলে অনুগৃহীত হইব।

শ্রীপতিতপাবন রায়।

বিপত্নীক।

রমেন্দ্রবাবু যখন বিপত্নীক হইলেন, মাতা ও আত্মীয়বন্ধু সকলে পুনরায় দার পরিগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না; মাতার কাতর ক্রন্দন আত্মীয়-বন্ধুর অজস্র অনুরোধ ঠেলিয়া তিনি ব্রহ্মচর্য্যে জীবন কাটাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন। মাতা পুত্রের অনিচ্ছা দেখিয়া আর জেদ করিলেন না, সন্তানের দুঃখ জননী কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

শোকের প্রথম অবস্থা অতীত হইলে তাঁহার মামীমাতা একদিন বলিলেন, "হ্যাঁরে রমেণ; সত্যই কি বিবাহ কর্‌বি না; তোর মত ছেলেমানুষ কে কবে না বিয়ে করেছে।" রমেন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিলেন "মামীমা স্ত্রীলোকে অল্পবয়সে বিধবা হইলে কি আবার বিবাহ করে?" মামীমা বলিলেন "তোর এক কথা, হিন্দুর ঘরে মেয়ে বিধবা হইলে কি আবার বিয়ে হয়।" রমেন্দ্র বলিলেন, "আর পুরুষ বিধবা হইলে তার কি প্রকারে বিবাহ হইতে পারে?" সেই পর্য্যন্ত কেহ বিবাহের কথা বলিলেই তিনি বলিতেন, "প্রথমে আমাকে বুঝাইয়া দাও স্ত্রীলোক যখন বিধবা হয়, পুরুষ কেন হইবেনা? তখন হইতে আর কেহ বিবাহের কথা বলিতেন না।

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, ক্রমে বৎসরও চলিয়া গেল; রমেন্দ্রনাথ, এখন সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য লইয়াছেন, একবেলা আহার করেন, মাছ খান না, স্ত্রীলোকের ন্যায় নির্জ্জলা একাদশী করিতেন, জননী নীরবে সকল সহ্য করিতে লাগিলেন, বিধবা কন্যার ন্যায় পুত্রের জন্য দ্বাদশী প্রভাত হইতে না হইতেই অশ্রুপূর্ণ লোচনে জলখাবার লইয়া বসিয়া থাকিতেন।

তিনি এম, এ পাশ, কোন সুদূর পশ্চিমে রাজার মাষ্টার ছিলেন, ক্রমশঃ

কাজ কর্ম্মও ছাড়িয়া দিলেন। তিনি স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, স্বদেশী বলিয়া তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল। কোন পশ্চিমাঞ্চলে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এক ভগিনীর শ্বশুরালয়ও সেইস্থানে। ভ্রাতা ভগিনীর এক বাটীতেই বিবাহ হইয়াছিল, সুতরাং, পত্নী বিয়োগের পরও মধ্যে মধ্যে তিনি সেখানে যাইয়া থাকিতেন।

সময় কাহার অপেক্ষা করেনা; তাহার পর পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। রমেন্দ্রনাথ এখন বাড়ীতেই থাকেন অধিকাংশ সময়ই তিনি একটা ঘরে একলা থাকিতেন; কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিলে তিনি যে শোকে ম্রিয়মাণ তাহা বোধ হইত না। একদিন তাহাব শ্বশুরবাটী হইতে পত্র আসিল, যে তাঁহার শ্বশ্রূমাতা অত্যন্ত পীড়িত। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া মাতার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। পুত্রকে বিদায় দিয়া মাতা অশ্রুপূর্ণ লোচনে গৃহে আসিলেন; তিনি কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিলেন না, কি যেন এক অজানিত আশঙ্কায় মাতার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছিল। দুই দিন পরে পুত্রের পত্র পাইয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার মনের ব্যাকুলতা কিছুতেই গেল না; সপ্তাহ না যাইতেই তিনি পুত্রকে আসিবার জন্য বারংবার লিখিতে লাগিলেন।

জননীর পত্র পাইয়া রমেন্দ্র জিনিস পত্র গুছাইয়া, ভগিনীর নিকট বিদায় লইয়া শাশুড়ীর নিকট বিদায় চাহিলেন; তিনি আরও কিছুদিন থাকিবার জন্য অনেক করিয়া বলিতে লাগিলেন ও কন্যার জন্য কাঁদিতে লাগিলে। রমেন্দ্র শ্বশ্রূর কাতরক্রন্দনে কি ভাবিয়া আসা স্থগিত রখিলেন।

শনিবার অপরাহ্ণে এই ঘটনা হইল; রাত্রে রমেন্দ্রের ভয়ানক জ্বর হইল। পশ্চিমে সে সময় প্লেগের প্রাদুর্ভাব। সকলে ভীত হইয়া প্রাতে সাহেব ডাক্তার আনিলেন। ডাক্তার দেখিয়া 'প্লেগ' বলিয়া গেলেন।

পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের আর জানাইলেন না; বাহির হইতে রমেন্দ্রের মাকে ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন।

ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল; যাতনার যেন একটু উপশম হইল। রমেন্দ্রের এক জ্যেষ্ঠ শ্যালিকা মাথার কাছে বসিয়া বাতাস দিতেছেন। রোগীকে যেন একটু সুস্থ বোধ হইতেছে, কিন্তু তিনি যেন মধ্যে মধ্যে কাহার সহিত কথা কহিতেছেন ও হাসিতেছেন এইরূপ ভাব দেখাইতেছে। বেলা আন্দাজ ৪৷৷০৷৫টা, যিনি মাথার নিকট বসিয়াছিলেন, তিনি বেশ জাগ্রত, ঘরে আর কেহ নাই, এমন সময় দেখিলেন, ধীরে ধীরে কে রমেন্দ্রের পায়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি হেঁটমুখে বাতাস দিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া দেখেন, সরোজ—(রমেন্দ্রের মৃত স্ত্রী) পলকে যেন মোহাবিষ্ট হইলেন, সে যে মৃত একথা কিছুই না ভাবিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে সরোজ নাকি—রমেন্‌কে দেখতে এসেছ"—উত্তর হইল হাঁ "কেমন —দেখলে," "দেখছিত, যেদিন মাছ খাইয়াছে, সেই দিনই প্লেগের বিষ ঢুকেছে ;:(তাঁহারা অনেক অনুরোধ করিয়া এক দিন মাছ খাইয়েছিলেন) তবে রবি, সোম এ দুদিন কিছু হবে না" বলিয়া মুহূর্ত্তে চোখের পলক না লইতেই সে মূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল, তিনি তখন ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সে মোহ নিমেষে অন্তর্হিত হইল তখন তাহার বুঝিতে আর কিছুই বাকী রহিল না। রমেন্দ্রের ভগিনীকে ডাকিয়া সকল বলিলেন, রমণীরা সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাত্রি অতিবাহিত হইল; তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন রোগের পূর্ণাবস্থা কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জ্ঞান খুব। ভ্রাতাকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, কথা কহিবার শক্তি নাই শ্লেট পেন্‌সিল দাও,—কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা কই? শূন্যে লিখিয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে রাত্রিও কাটিয়া গেল, মঙ্গলবার দিন প্রাতে রোগীর কণ্ঠস্বর বাহির হইল; ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে লাগিলেন। ডাক্তারও একটু আশা দিল, বেলা আন্দাজ ২টা হঠাৎ রমেন্দ্র উচ্চৈস্বরে হাসিতে লাগিলেন।

মাতা কনিষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, "রমেন্ অত হাসিতেছে কেন?" ভ্রাতা হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "দেখ্ছ না সরোজ আসিয়াছে, আমাকে যে লইতে আসিয়াছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছনা, ওই সে দাঁড়িয়ে রয়েছে," বলিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, পত্নী-প্রেমিক রমেন্দ্র যাইয়া পত্নীর সহিত মিশিলেন।

মাতা ৩২ বৎসরের যুবাপুত্র হারাইয়া হাহাকার করিতে করিতে ভগ্নহৃদয়ে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তিনিও বৎসরেক পরে পুত্রের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী.........পাঠিকা—

গোপেশ্বরের চাকরী।*

—:০:—

আজ গোপেশ্বর ও তাহার সঙ্গিগণের মুক্তিতে অনেকেরই মহা আনন্দ—শুধু অনেকের কেন? চক্রান্তকারী শত্রুপক্ষীয় কয়েক জন ব্যতীত সকলেই এই নিরপরাধী ব্যক্তিগুলির মুক্তিলাভে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত

গোপেশ্বরের আনন্দ যে প্রবল প্রতাপ অর্থশালী জমিদারের কূট জাল

* ভ্রমবশতঃ মাঘের সংখ্যার "গোপেশ্বরের চাকরী" ফাল্গুন সংখ্যায় হইবে; সহৃদয় পাঠকবর্গ ইহা অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া লইবেন।　　অঃ রঃ সঃ

ভেদ করিয়া বীরের মত বাহির হইতে পারিয়াছে, ততোধিক আনন্দ তার দলস্থ লোকগুলির মুক্তিতে; আজ যেন দশভুজা দশ হস্তে তার জন্যে শান্তি, তৃপ্তি ও আনন্দের স্রোত বহাইয়া দিতেছেন, তার চক্ষে আজ যেন সারা বিশ্বের দৈন্য অবসাদ মুছিয়া গিয়া, বসন্তের সৌন্দর্য্য-সঙ্গীতের তান, প্রাণের ভাব-লহরী বিকসিত হইয়া উঠিতেছে। আরও উল্লাস যে তার স্ত্রী একা ও অসহায়া হইয়াও নিজের মান বাঁচাইয়াছে, স্বামীর জন্যে পতিপ্রাণা রমণীর এই ত্যাগ ও ক্লেশ স্বীকার দেখিয়া সে আনন্দের সঙ্গে গর্ব্বও অনুভব করিল।

রাধারাণীও তদ্রূপ আহ্লাদিত; তার যে শ্রম সার্থক হইয়াছে, সহায় সম্বলহীনা দরিদ্রা যে স্বামীর মুক্তির কারণ-স্বরূপ হইয়াছে, মা কালী যে তার মুখ রক্ষা করিয়াছেন ইহাতে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাভরে বড় বড় টানা টানা ভাসা ভাসা চক্ষু দুটী বারম্বার ছল ছল করিয়া উঠিতে লাগিল। বিধুমুখী, ক্ষীরোদ বাবু, যদু মোক্তার তাঁহার গৃহিণী, পুরোহিত দীননাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সকলেই এই সুখময় পরিণামে আনন্দিত। শিশু কালাচাঁদও নিশ্চিন্ত ছিল না, সে পিতাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কোলে উঠিয়া মহা কলরব জুড়িয়া দিল।

কিন্তু অন্তর্য্যামী পুরুষ তখনো বুঝি হাসিতেছিলেন, তখনো যে তাঁর মনে কি ছিল তাহা সাধারণ মানব-বুদ্ধির অগম্য। বিধাতা যে তাহার অদৃষ্টরূপ আকাশে তখনো কাল-বৈশাখের ঝটিকা ও অশনি-সম্পাতের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিরীহ গোপেশ্বর তখন তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝে নাই।

মানবের যখন দৈব প্রতিকূল হয়, তখন তার চারিদিকেই হানা পড়ে, অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়, দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে। তখন সুখের লাগিয়া যে ঘরই বাঁধ না কেন

তাহা আগুনে পুড়িয়া যায়, জলের জন্য মেঘের দিকে চাহিলে বজ্র আসিয়া মাথায় হানিয়া পড়ে।

• কুক্ষণে গোপেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কুক্ষণে সে বিবাহ করিয়াছিল, কুক্ষণে সে গৃহস্থালী লইয়া সুখী হইবার চেষ্টা করিয়াছিল কুক্ষণে রাধারাণী ভুমিষ্ঠ হইয়াছিল—কুক্ষণে শ্বশুর গৃহে পদার্পণ করিয়াছিল, কুক্ষণে সে তার উচ্ছ্বসিত রূপ-রাশি লইয়া যুবক জমিদারের কু-নজরে পড়িয়াছিল।

তখনো আনন্দের উল্লাস স্রোতে ভাঁটা পড়ে নাই, তখনো গোপেশ্বর দেশে ফিরিবার ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করে নাই, সেই সময়ে অর্থাৎ সেই রাত্রেই রাধারাণী দারুণ কলেরায় আক্রান্ত হইল। বঙ্গদেশে এ রোগ তখনো নূতন, নদীয়া যশোহর প্রভৃতি স্থানে মহামারী মহাবিক্রম দেখাইয়া সমগ্র বাঙ্গালা সমগ্র হিন্দুস্থানে বিস্তৃত হইতেছিল। তখনো ইহার চিকিৎসা ও ঔষধ স্থির হয় নাই, আক্রমণ হইলেই লোকে বুঝিত যে মৃত্যু অনিবার্য্য।

অভাগা গোপেশ্বর শিরে করাঘাত করিয়া বুঝিল যে তার সব আশা ও কল্পনায় ছাই পড়িল—রাধারাণীও বুঝিল তার সব শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই।

রাধারাণীর অনুরোধে তাহাকে অলক্ত ও সিন্দূর রঞ্জিত করা হইল, রক্তপ্রান্ত বস্ত্র-পরিহিত হইয়া প্রাণের জ্বালা বুকে চাপিয়া কালাচাঁদকে গোপেশ্বরের বুকে তুলিয়া দিয়া, স্বামীর পদধূলি শিরে লইয়া চিরদিনের মত হাসিমুখে চক্ষু মুদিল।

বজ্রাহত গোপেশ্বর চিত্রার্পিতের মত সিক্ত নয়নে, কম্পিত বক্ষে অন্তিম যাত্রার এই ক্লেশকর অভিনয় দেখিতেছিল। গোপেশ্বর কাব্য ও দর্শন পাঠ করে নাই, শোক উৎসবের উচ্ছ্বাস ছিল না, পুরুষোচিত লজ্জার

জন্যও অন্তরের আবেগ আকুলতা উচ্চৈঃস্বরে ফুটে নাই, কিন্তু তার এই মুহূর্ত্তের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, জীবনসঙ্গিনী পরিত্যক্ত নবীন যৌবনের এই অসহায় অবস্থার ভীষণতা ও শূন্যতা বুঝি বা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কেবল একমাত্র ভুক্তভোগীই বুঝিতে পারিবেন। চিতা ধূ ধূ করিয়া তেজো গর্ব্বে জ্বলিয়া উঠিল, গোপেশ্বর মনে করিল যে ওই চিতায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তার শূন্য অবসন্ন ও ভগ্ন হৃদয়ের সকল জ্বালা মিটাইয়া দেয়—আবার পাছুটান শিশু কালাচাঁদ মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—তাহাকেই বা সান্ত্বনা দেয় কে ?

আজ গোপেশ্বরের সঙ্গ শূন্য, গৃহ শূন্য, হৃদয় শূন্য—অবশ্য সান্ত্বনা দিবার লোকের অভাব হয় নাই কিন্তু মন তা বুঝিল না।

এখন সে করে কি ? অনেকে উপদেশ দিলেন যে সে দেশে ফিরিয়া গিয়া আবার গৃহস্থ হউক ঘর সংসার দেখুক ? তার মন কিন্তু এ প্রস্তাব চাহিল না—সে ত বড় সুখে বড় আশায় আনন্দের ঘর সংসার পাতিয়াছিল, তবে ভগবান্ এসব অকালে ঘুচাইলেন কেন ? তার অদৃষ্টে সুখ নাই শান্তি নাই তাহা সে বুঝিয়া লইয়া ভাবিল আবার সংসার পাতিলে না জানি এই-রূপ বা ইহা অপেক্ষাও অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে।

আবার ভাবিল তার ত সব গিয়াছে, শিশু পুত্র ও বাঁচিবে কিনা সন্দেহ সুতরাং কিসের ভাবনা কিসের ভয়, সে আজ জমিদারের উপর প্রতিহিংসা চালাইয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়কে শান্ত করিবে। কিন্তু তার কোন সঙ্কল্পই স্থির হইল না—কালাচাঁদের কাতর মুখখানি মুহূর্ত্তে তার সমস্ত কল্পনা, অবসাদ ও সঙ্কল্প উল্টাইয়া দিতেছিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল যে তার অদৃষ্টে সুখের আশা বিড়ম্বনামাত্র,—এখন কালাচাঁদ যদি বাঁচিয়া থাকিয়া মানুষ হয় ত যথেষ্ট। ভগবানের কাছে আর তার কোন প্রার্থনা নাই। এজন্য ঠিক করিল যে

সে এখন তার দেশে যাইবে না—কেবল ভদ্রাসনটী রাখিয়া দিয়া অন্যান্য জমিগুলি বিক্রয় বা বিলি করিয়া দিয়া সহরে থাকিয়া কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া পুত্রকে সুশিক্ষিত করিবে—সে যদি আজ নিজে শিক্ষিত হইত তাহা হইলে হয় ত জমিদার তাকে এত সহজে বিপন্ন করিতে পারিত না।

সঙ্কল্পের কথা একদিন ক্ষীরোদ বাবুকে জানাইয়া বলিল বাবু আপনি যদি আমাকে চাকর রাখেন ত তাহলে আর কিছু চাই না, যতদিন আমার সামর্থ থাকিবে ততদিন আপনার বিনা বেতনের চাকর থাকিব, আমাকে কেবল দুই মুঠা খাইতে দিবেন তাহা হইলেই যথেষ্ট—এক প্রার্থনা যে ছেলেটা আপনার আশ্রয়ে থেকে যেন মানুষ হতে পারে—অবশ্য অপর স্থানেও থাকিতে পারি কিন্তু আপনারা বিপদের সময় যেরূপভাবে সাহায্য করেছেন তাতে অপর স্থানে থাকলে নেমকহারামী হবে; আমাকে যদি রাখেন ত জানবেন যে আমার কাঁধে মাথা থাক্‌তে আপনার কোন বিপদ ঘটবে না।

ক্ষীরোদবাবু সহজে কোন উত্তর দিতে পারিলেন না কেননা এক মাতৃহীন শিশুর ভার গ্রহণ করা নিতান্ত সহজ কার্য্য নয়।

বিধুমুখী কিন্তু এ প্রস্তাব উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিল—একে ত কিছুদিন অবস্থানে রাধারাণী ও কালাচাঁদের প্রতি তার একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল—তার উপর মাতৃহীন শিশু বলিয়া তার মাতৃহৃদয়ের স্নেহ বালকের উপর কিছু বেশীরূপেই পড়িয়াছিল।

ক্ষীরোদবাবু বন্ধুবান্ধবগণের সহিত পরামর্শ করিলেন তাঁহারা সকলেই বলিলেন যে বিপদের সময় যখন তুমি সাহায্য করেছিলে তখন উপস্থিত আশ্রয় দেওয়া উচিত—বাস্তবিকই উহার কিসের অভাব নিজের দেশে ও সমাজে অবস্থা ও ক্ষমতাপন্ন কেবল শিশুটীর জন্যই কাতর—সুতরাং

তোমার উপর যে একটা গুরুভার পড়ছে তাও নয়—তাছাড়া ওরা বীরের জাত যা মুখে তাই কাজে—যদি তুমি আশ্রয় দাও তা হলে জান দিয়ে তোমার মান রাখবে ?

ক্ষীরোদ বাবু সম্মতি প্রদান করিলে গোপেশ্বর আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা সহকারে আজীবন দাসত্বের জন্য প্রস্তুত হইল। দেশের জমিগুলি বিক্রয় করিয়া দিল, ইচ্ছা যে যদি কখন ছেলেটা মানুষ হয় বা ভগবান দিন দেন তখন জমি উদ্ধার করা বিশেষ দুরূহ হইবে না।

তখনো তার আশঙ্কা যে ভগবান তার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই. প্রায়ই অজানিত বিপদের জন্য আকুল হইয়া কালাচাঁদকে অধিকতর আগ্রহের সহিত বুকে জড়াইয়া ধরিত।

আবার বজ্র হাঁকিল ; কালাচাঁদ দারুণ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইল—গোপেশ্বর আবার প্রমাদ গণিল বুঝিল ভগবান বুঝি তার শেষ অবলম্বন আশার কুঁড়িটীও ছিঁড়িয়া দেন।

গোপেশ্বরকে আবার মৃত শিশু পুত্রকে কোড়ে করিয়া শ্মশানে যাইতে হইল।

সে এখন উন্মাদ—প্রাণ ভরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া লইল সুখের শেষ স্মৃতিটীকে বিদায় দিবার সময় চক্ষুজলে হৃদয়ের বহুদিন সঞ্চিত গুপ্তব্যথা, কত নিদারুণ দাগা মুছিয়া লইল।

হতাশে গুমরিয়া শপথ করিল যে যদি সে যথার্থ সর্দ্দারের বংশে জন্মিয়া থাকে যদি তার লাঠি ধরা সার্থক হয় ত হরকান্তের মুণ্ড কপোতাক্ষের জলে ভাসাইবে—তার পর না হয় নিজেও ফাঁসি যাইবে। জেলের সুখত সে দেখিয়াছে—তার কিসের আশা কিসের ভাবনা, তার অতীত গিয়াছে, বর্ত্তমান শুন্য, ভবিষ্যৎ নাই, তবে কেন প্রতিহিংসা তুলিবে না। আবার মনে হইল না এখনো বিলম্ব আছে, সে, উপকারকের নিকট দাসত্বে বদ্ধ, এখনো কৃতজ্ঞতাঋণ পরিশোধ হয় নাই।

প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া ক্ষীরোদবাবু অনেক বুঝাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন - বলিলেন গোপেশ্বর তুমি তাহাকে শাস্তি দিবার কে? সে তার পাপের ফল একদিন না একদিন ভোগ করিবেই—মধ্য হইতে তুমি কেন আবার একটা নরহত্যা পাপে লিপ্ত হও।

গো। বাবু আমি না দিলে উহাকে কে সাজা দিবে?

সে যে বড়লোক, ভগবান বড়লোকের কাছে ঘেঁসে না, ভগবানের সাজা গরীবের জন্য! আমার এত সাজা কি জন্য বাবু? আমি কি এমন পাপ করেছি।

ক্ষী। তুমিই হয়ত গত জন্মে ওই হরকান্ত বাবুর মত ছিলে বহু-লোককে গৃহ শূন্য করিয়াছিলে, বহুসতীকে কুলত্যাগিনী করাইয়াছিলে তাই আজ তোমার এত দুর্দ্দশা, এত ক্লেশ? আমরা বুঝিতে পারি না তাই ভগবানকে দোষ দিই।

গোপেশ্বর এইরূপ কথা মধ্যে মধ্যে শুনিত বুঝিতে চেষ্টা করিত ও শান্ত মূর্ত্তি হইত—কিন্তু আবার মন বিদ্রোহী হইয়া প্রতিহিংসার জন্য ব্যাকুল হইত।

সুবিধা বুঝিয়া বুদ্ধিমতী বিধুমুখী ধীরে ধীরে ননীগোপালকে গোপেশ্বরের কোলে তুলিয়া দিলেন; নীরবে বিধুমুখী গোপেশ্বরের ব্যথার ব্যথী হইয়াছিলেন—যেদিন অসহায়া রাধারাণী শিশুপুত্র বক্ষে লইয়া তাঁহার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে দিন সাগ্রহে উৎসাহে ও আশায় তাহা-দের আশ্রয় দিয়াছিলেন পরে রাধারাণীর গুণে তাহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহার সে আশাও সফল হইয়াছিল, কিন্তু ভগবান একি করিলেন? অঙ্কুর গজাতে না গজাতে সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল।

কালাচাঁদের প্রতিবিম্ব স্বরূপ ননীগোপালকে লইয়া গোপেশ্বরের শূন্য

বক্ষ অনেকটা পূরণ হইল—বিধুমুখী তাহা লক্ষ্য করিলেন ও ধীরে ধীরে ননীর সকল ভার গোপেশ্বরের হাতে তুলিয়া দিলেন। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন তৃণখণ্ডকেও ধরিবার :চেষ্টা করে, গোপেশ্বরও সেরূপ এই অবোধ শিশুটাকে উপলক্ষ্য করিয়া উত্তপ্ত হৃদয়ের বিষময় জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টা করিল।

গোপেশ্বর দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছে বটে কিন্তু ক্ষীরোদ বাবু চাকরের অপেক্ষা কনিষ্ঠ সহোদরের তুল্য ব্যবহারে ও স্নেহ মমতায় তাহাকে যথোচিত প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিতেন, আহারের সময় নিজের নিকটে লইয়া আহার করিতেন, বিধুমুখী নিকটে বসিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিত—নির্ব্বাক মৌনা উদাস-হৃদয় গোপেশ্বর কখন কিছু খাইত কখন অন্যমনস্কভাবে বসিয়া বসিয়া উঠিয়া পড়িত—আমোদ আহ্লাদ কথাবর্ত্তা ও অবলম্বন যা কিছু ননী-গোপালই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ও ধ্রুবতারা, কখন কোলে তুলিয়া, মাথায়, করিয়া বেড়াইয়া আসিত আবার নির্জ্জনে দুই একটা তপ্ত অশ্রু-বিন্দু লোক লোচনের অজ্ঞাতে বস্ত্রপ্রান্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিত।

একদিন সুবিধা বুঝিয়া ক্ষীরোদ ও বিধুমুখী উভয়েই গোপেশ্বরকে ধরিয়া বলিল "তুমি আর কত দিন এরূপ কষ্ট করিয়া পাগলের মত ঘুরিবে, তোমার যখন সবই আছে তখন আমরা বলি কি যে তুমি আবার ঘর সংসার করো, এ বিষয়ে আর অমত করিও না।

গো। না মাঠাকুরুণ তোমরা আর ও কথা বলো না—আরো কষ্ট যাতনা বাড়বে? আমার অদৃষ্টে সুখ নেই এটা বেশ বুঝেছি, তা না হলে আর সব থাকিতে আমার এ দুরবস্থা কেন?

বলিতে বলিতে রুদ্ধ হৃদাবেগের উচ্ছ্বাসে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষী। তা নয় গোপেশ্বর, পৃথিবীতে যেমন পাপ পুণ্য, আলো অন্ধকার

আছে, আকাশে যেমন স্বর্গ নরক আছে; মানুষের ও তেমনি সুখ দুঃখ, সুদিন দুর্দ্দিন আছে সুসময় বা দুঃসময় মানুষের চিরদিন্ এক রকম থাকে না; একদিন না একদিন পরিবর্ত্তন হবেই হবে।

গো। না বাবু সে আশা আর করি না, এখন যে কটা দিন বেঁচে থাকি, এর চেয়ে যেন আর হাড়ীর হাল না হয়—ও সব লোভ আর দেখাবেন না তবে এটা জানবেন যে যার হতে আমার আজ এ দুর্দ্দশা, যদি আমার লাঠি ধরা সার্থক হয়, তা হ'লে এর শোধ নিবই নিব। তার জীবনে আর সুখ শান্তির কোন আশাই নাই, এই অবসাদময় দুশ্চিন্তাও তাহার দগ্ধ হৃদয়কে অনেক সময় স্থৈর্য্য প্রদান করিত, আবার প্রতিহিংসার জন্য ও সময়ে সময়ে গুমরিয়া উঠিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভগ্নশাখা মুমূর্ষু বৃক্ষকাণ্ড যেমন আপনার বহু আয়াস প্রাপ্ত রসটুকু দিয়া পরগাছার পরিপোষণ করে, গোপেশ্বরও তদ্রূপ হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ মমতা ও দেহের যাহা কিছু সামর্থ্য দিয়া ননীগোপালকে মানুষ করিয়া তুলিতে লাগিল। দুর্ব্বল জীব অনেক সময় আসলের পরিবর্ত্তে নকল লইয়াই পরিতুষ্ট থাকে, গোপেশ্বরও সেরূপ নিজ পুত্রের অভাব এই পালিত পুত্রের ক্ষমতায় যথা সম্ভব ভুলিতে লাগিল।

কিন্তু তবু কি যেন এক অজ্ঞাত আশঙ্কা নৈশ আবছায়ার মত তাহাকে মধ্যে মধ্যে অভিভূত করিত বহু চেষ্টা করিয়া বাহিরে বা মনোমধ্যে সে ইহার মুল খুঁজিয়া পাইত না—কেমন একটা দুর্ভাবনায়, নদী-তীরস্থ একচক্ষু হরিণের ন্যায় অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় বুকের ভিতর রহিয়া

রহিয়া গুরু গুরু করিয়া উঠিত। ছিন্ন হৃদয় ও দগ্ধ অদৃষ্ট গোপেশ্বর বুঝিতে পারিত না—ইহার উপরেও অপরন্বা কিম্ ভবিষ্যতি।

চাকুরীর খাতিরে ক্ষীরোদ বাবুকে ক্রমে ক্রমে বহু জেলা মহকুমা, থানা চৌকি প্রভৃতিতে বদলি হইতে হইল, তখন এত জেলা স্কুল ও কলেজ প্রভৃতি হয় নাই সুতরাং ননীগোপালের লেখা পড়ার অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রস্তাব হইল যে তাহাকে কলিকাতার মেসে বা বাসা করিয়া রাখা হউক কিন্তু তাহাতেও বহু গোলযোগ, কলিকাতা তখন যমালয় তুল্য অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল এবং নবীন বয়সোচিত নানারূপ কুসংসর্গও জুটিবার সম্ভাবনা।

ননীগোপালের কোনরূপ অসুবিধা হয়, এটা গোপেশ্বরের অসহ্য তাই সে সাগ্রহে বলিল যে তার যখন কোন কাজ নাই কেবল বসিয়া বসিয়া খাওয়ান হইতেছে তখন সে কলিকাতায় ননীর সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। বাড়ীর চাকর কেবল বসিয়া বসিয়া অন্নধ্বংস করিবে কেন? বিধুমুখী শুনিয়া জিভ কাটিয়া বলিলেন, "সে" কি? তুমি আমাদের চাকর হইবে কেন? তুমি আমাদের বাড়ীর লোক।

গো। না মা, অনেক দিন ত আমি তোমাদের চাকর হইয়া আছি তবে তোমরা আমাকে এখনো কোন কাজ দাও নাই।

বি। সে চাকরী তুমি ত তোমার ছেলের জন্য লইয়াছিলে—ভগবান যখন তোমার সে আশাও নির্ম্মূল করেছেন তখন আর কিসের চাকরী তোমার।

গোপেশ্বর নীরবে থাকিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল—কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না—বহুদিনের কত পুরাতন সুখ দুঃখ মিশ্রিত স্মৃতি গুলি মনের উপর কোলাহল পূর্ব্বক ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল।

বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে কলিকাতার বাসা লইয়া ননী গোপেশ্বরের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবে ও ছুটীর সময় পিতা মাতার নিকট আসিবে। ...

ননীর বন্ধুবর্গ এই অদ্ভুত চরিত্র চাকরের কার্য্য কলাপে বিস্মিত হইয়া তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিত ননীগোপাল কেবল হাসিয়া বলিত আমিও ঠিক জানি না এই লোকটা আমার চাকর কিম্বা গার্জ্জেন।

ছুটির সময় যখন ননীকে লইয়া গোপেশ্বর ফিরিত তখন ননীর সুন্দর স্বাস্থ্য বিনয় নম্রতা, ব্যবহার ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া পিতা বিরলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন ও নীরবে গোপেশ্বরের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন।

ইহার পর প্রায় বিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—ক্ষীরোদ বাবু বাহান্ন জেলার জল খাইয়া সদর ওয়ালার পদে উন্নীত হইয়া পুনরায় যশোহরে আসিয়াছেন - বয়োধিক্যে প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্তি ব্যতীত বিশেষ কিছু নূতনত্ব ঘটে নাই ; কেবল দেশে ম্যালেরিয়ার জন্য ক্ষীরোদ চুঁচড়ায় একটা নূতন বাটী প্রস্তুত করাইয়া পরিবারস্থ সকলকে সেইখানেই রাখিয়াছে। স্ফূর্ত্তি আনন্দ ও অবলম্বনের অভাবে গোপেশ্বরের মহাবলবান দেহেও জরা অকালে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে মস্তকে খানিকটা টাক পড়িয়াছে, কেশরাজির অনেকগুলি শ্বেত শুভ্রতা ধারণ করিয়া, গাত্র চর্ম্ম কুঞ্চিত ও দেহ যষ্টি ঈষৎ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়া বার্দ্ধক্যের সূচনা বেশ পরিষ্কার রূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সেই অজ্ঞাত আশঙ্কা ও দুর্ভাবনা তখনও তাহাকে ত্যাগ করে নাই, তাই সে অনেক ভাবিয়া স্থির করিল তাহার নিজের আর কি বিপদ হইতে পারে, যাহাদের আশ্রয়ে এতদিন আছে তাদের না কোন বিপদ হয় ? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল—যে শীঘ্রই ইহাদের নিকট

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তীর্থ যাত্রা করিবে তার পর তার অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন তাহাতে দুঃখ করিবার কেহই বা কিছুই থাকিবে না। ননী সেবার এম এ পরীক্ষা দিয়া চুঁচুড়ার বাটীতে আছে। যশোরে তখনও পরীক্ষার ফল বাহির হয় নাই, গোপেশ্বর ক্ষীরোদকে বলিল, বাবু আমার আর মন টিকিছে না আপনারা শীঘ্রই ননীর বিবাহের আয়োজন করুন। ননীর বিবাহ দেখিয়া আমি তীর্থ যাত্রা করিব।

ক্ষীরোদ বাবু পরীক্ষার ফল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপেশ্বরের আগ্রহাতিশয্যে শীঘ্রই বিবাহ স্থির করিবার জন্য উদ্যোগ করিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

যমদূত দর্শন।

—:০:—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু চুঁচুড়া ক্যাকশিয়ালের অধিবাসী। তিনি কলিকাতা কন্‌ট্রোলার জেনেরল অফিসে কাজ করেন। প্রত্যহ বাড়ী হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করেন। তাহাতে তাঁহাকে চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বরতলার খেয়া পার হইয়া কাঁকিনাড়া ষ্টেসন দিয়া কলিকাতায় যাতায়াত করিতে হয়। তবে ঝড়বৃষ্ট্যাদি দুর্য্যোগ ঘটিলে, প্রবলতরঙ্গময়ী ভাগীরথী পার হওয়া বড়ই বিপজ্জনক বলিয়া হুগলীঘাট দিয়া গতায়াত করাই একমাত্র গতি হইয়া পড়ে।

এই যে কয়দিন উপর্য্যুপরি বৃষ্টিপাতে দামোদর নদ ভাসিয়া গিয়া কূলবর্ত্তী বিস্তৃত ভূখণ্ডকে শ্মশানে পরিণত করিল, কত সাশ্রয়কে অনাশ্রয় করিয়া, কত ধনীকে নির্ধন করিয়া, কতশত জীবজন্তু ও মানবের প্রাণ অকালে হরণ করিয়া একটা ভারতব্যাপী হাহাকারের সূচনা করিয়া দিল, তাহারই একদিন সন্ধ্যাকালে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইতেছিল। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত সেই বৃষ্টিতে আরও যেন ভয়ঙ্করী করিয়া তুলিতেছিল। ক্ষণে ক্ষণে ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে চঞ্চল দামিনীবিকাশ, ক্ষণে ক্ষণে কর্ণবধির-কারী বজ্রনিনাদ যেন এক বিশ্বব্যাপী মহাপ্রলয়ের সূচনা করিতেছিল। তখন ৫টা ৫০ মিনিটের ট্রেণখানি শিয়ালদহ হইতে ছাড়িয়া শন্ শন্ বেগে বণ্ডেল অভিমুখে গমন করিতেছিল।

সেই ট্রেণে বহু যাত্রীর মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সুরেন্দ্র বাবু, এবং আরও কয়েকজন চুঁচুড়ার অধিবাসী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অঘোর-নাথ দে অন্যতম, তিনি সুরেন্দ্র বাবুর খুব নিকট পল্লীবাসী।

দারুণ দুর্য্যোগ দেখিয়া তাঁহারা আর কাঁকিনাড়ায় নামিলেন না। একেবারেই নৈহাটী গিয়া নামিলেম। কিছু পরেই হুগলীর খেয়া ট্রেণ* ছাড়িল। সেই ট্রেণে তাঁহারা হুগলীঘাটে গিয়া নামিলেন। তখন রাত্রি ৮ ঘটিকা হইবে। সুতরাং অন্ধকার ঘনতর হইয়াছিল।

তাঁহাদের দলপুষ্টি থাকিলেও এই ভীষণ অন্ধকারময় রাত্রিতে আলোকের অভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া লণ্ঠন সংগ্রহের জন্য সমুৎসুক হইলেন। সন্নিকটেই পূর্ব্বোক্ত অঘোর বাবুর আত্মীয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত জহুরীলাল দের বাটী। তাঁহারা তাঁহার বাটীতেই গমন করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

---

* যে ট্রেণটী হুগলীনদী পার করিবার জন্য হুগলী সেতুর উপর দিয়া নৈহাটী হইতে ব্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত যাতায়াত করে।

তাঁহারা জহুরী বাবুর গৃহে গমন করিবামাত্র জহুরী বাবু এতগুলি ভদ্রলোককে এই দারুণ দুর্য্যোগের সময় উপস্থিত দেখিয়া পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং এই অসময়ে কেবল লণ্ঠন দিয়া বিদায় দেওয়া ভদ্রনীতি বিরুদ্ধ মনে করিয়া বৃষ্টির প্রশমন পর্য্যন্ত তাঁহার বাটীতে অপেক্ষা করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ভদ্রজনের ভদ্রব্যবহারে তাঁহারাও পরম আপ্যায়িত হইয়া সে অনুরোধ রক্ষা করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। কিন্তু জহুরী বাবু তাঁহাদিগকে শুধু মৌখিক সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট করিলেন না, তাঁহাদের জন্য একটা মহাভোজেরও ব্যবস্থা করিয়া সেই বাদলের সম্মান বিলক্ষণ রক্ষা করিলেন।

পরে বৃষ্টি প্রশমিত হইলে একটা লণ্ঠন দিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তখন বৃষ্টিপাত ছিল না বটে, আকাশ পূর্ব্ববৎ ঘনঘটাচ্ছন্ন ছিল, এবং ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিয়া—অন্ধকারপীড়িত পথিক-দিগকে যেন তীব্র পরিহাস করিতেছিল। তাঁহারাও নানা গল্প-গুজব করিয়া চুঁচুড়া অভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন।

পথে গমন করিতে করিতে যেমন যেমন বাড়ী আসিতে লাগিল, অমনি এক একজন করিয়া দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিলেন। শেষে দাঁড়াইলেন দুই জন, সুরেন্দ্র বাবু ও অঘোর বাবু। অঘোর বাবুর বাড়ী আগেই ছিল। তিনি নিজবাটীর সম্মুখে আসিবামাত্র সুরেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, "আমি এখন আসি, তুমি, ভাই, এই লণ্ঠনটী লইয়া যাও, কাল প্রাতঃকালে আমাকে পাঠাইয়া দিও। আমি চাকর দিয়া উহা জহুরী বাবুর বাটীতে পাঠাইয়া দিব।"

সুরেন্দ্র বাবু লণ্ঠন লইলেন না। বলিলেন,—"আমার বাড়ী ত এই বাগানটা পার হইলেই পাওয়া যাইবে। এটুকু আমি অমনিই যাই। আপনি লণ্ঠন রাখিয়া দিন।"

এই কথা বলিয়া তিনি গৃহের দিকে যাইতে লাগিলেন। এক মনে যাইতেছেন।—সঙ্কীর্ণ পথ তাহার উভয়পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ উদ্যান। বৃক্ষের অন্তরালে সেই পথ নীরন্ধ্র অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভা তাহার পথ গমনে একটু সাহায্য করিতেছিল মাত্র। তিনি এক মনে যাইতেছেন।

একবার বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল। দেখিলেন অদূরে এক কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যমূর্ত্তি। সেই জনমানবসমাগমশূন্য ভীষণ কান্তারে একটা মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে একটু সাহস হইল। কিন্তু সে সাহস বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। কারণ সে মনুষ্যমূর্ত্তি দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে আসিতে আসিতে যখন তাঁহার নিকটে আসিয়া পৌছিল, তখন দেখিলেন যে মূর্ত্তিকে তিনি আশ্বাসজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা এক মহাভীতিজনক বিকটমূর্ত্তি! প্রকাণ্ড আকার, চক্ষু দুটি যেন জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে! ললাট হইতে যেন এক অগ্নিশিখা উদ্গত হইতেছে। ঠিক সেই সময়েই একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, কপালে যেন রক্তবর্ণ সিন্দূরের গাঢ় প্রলেপ, মুখ অতি বিকৃত। আর সমস্ত শরীর যেন ভল্লুকের মত কৃষ্ণবর্ণ আবরণে আবৃত! সেই বিকট-মূর্ত্তি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় অস্পষ্টভাবে কি যেন একটা শব্দ করিল। তিনি যেন "যম" "যম" এইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন।

অন্যলোক হইলে হয়ত তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইত। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ বলবান্, ও সাহসী। এই জন্য মনে অত্যন্ত ভীত হইলেও ক্ষণকালের জন্য সাহস অবলম্বন করিয়া অতি দ্রুতবেগে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু বাড়ীর দ্বারের নিকট গিয়া আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। একবার 'মা' বলিয়া ডাকিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন সংজ্ঞা হইল, দেখিলেন সমস্ত পরিবার বিমর্ষচিত্তে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। তাঁহার সংজ্ঞা হইবামাত্র সকলের বদনে হর্ষরেখা দেখা দিল। তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় অচিরেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন।

যখন সুস্থ হইলেন, তখন সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি তখন যথাযথ সমস্ত ঘটনাই বলিলেন।

তাঁহার মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলে বিস্ময়বিহ্বল হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ওঃ—ঐ সময়ে যে পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর অমুক হঠাৎ ফিঁকবেদনায় কাতর হইয়া মরিয়া গিয়াছে। তবে বা যমদূত তাহাকে লইতে আসিয়াছিল!

বাস্তবিক যতদূতই আসিয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবু যমদূতকেই দেখিয়াছিলেন। তবে যে তাহার মুখে "যম" "যম" শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহা কি ঐ যমদূত মৃতব্যক্তির প্রাণ লইয়া যমের নিকট যাইতে যাইতে যম নাম কীর্ত্তন করিতেছিল, না সুরেন্দ্রবাবু প্রবল আতঙ্ক বশতঃই ঐরূপ শব্দ একটা কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচ্য।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

৪০ বৎসরের চিকিৎসাভিজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব
কালাজ্বর—তদন্তকারী—
এবং মূত্র, মূত্রনালী ও জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় রোগ
সমূহের বিশেষাভিজ্ঞ
রায় সাহেব ডাঃ কে, সি, দাসের
স্বাস্থ্য-সহায়।
স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে
স্ত্রীপুরুষের দৈনিক আবশ্যকীয় পুস্তক —বিনামূল্যে বিতরিত
হইতেছে। স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কিংবা পত্র দ্বারা
গ্রহণ করুন।
স্বাস্থ্য সহায় ঔষধালয়।
৩০।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।